শ্রীসুধীরচন্দ্র ভট্টাচার্য

শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩-১-১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ... কলিকাতা-৬

চার টাকা

তৃতীয় মুদ্রণ
আষাঢ়—১৩৬৪

বসিয়াই রহিল। পিছনের টেবিলে মহিলাগণ নানা কেতাব পাঠে ব্যস্ত—অন্যদিন কৌতূহলী সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাহাদিগকে সংগোপনে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, কিন্তু আজ তাহারাও তাহাকে কোনরূপেই আকর্ষণ করিতে পারিল না।

একটি শীর্ণা, তন্বী, সুন্দরী, তরুণী, কুমারী রোজই টেবিলের এক কোণে বসিয়া, তাহার আয়ত চক্ষু মেলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরের মাঝে কি যেন খুঁজিয়া মরে। কদাচিৎ চোখ মেলিয়া চায়, পাখার বাতাস কপালের উপর কুঞ্চিত চূর্ণকুন্তলগুচ্ছ আন্দোলিত করে, কাণের দুলে আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া বি মিক্ করে। সে আসে যায়, উঁচু-হিল্ জুতার শব্দে আরও অনেকের সঙ্গে মলের চোখেও স্বপ্নাবেশ বুলাইয়া দিয়া যায়। অমল জানে না কেন ই এই মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগে—তাহার চেহারায় যেন এক তা আছে, চলিবার বলিবার ভঙ্গির মধ্যে একটা উদার আভি ছে—অথচ বেমানান চঞ্চলতা বা নিজেকে প্রাধান্য দিবার ব্যগ্র দৈন্য নাই। অমল সংগোপনে, পড়িবার ফাঁকে ফাঁকে অন্য তাহাকেই ভাল করিয়া দেখে।

নামটা লোক াছে—অত্যন্ত আধুনিক নাম—ডেজি। বিলাতী ফুলের মারফতে আমাদের কাছে সুন্দর বলিয়াই মনে হয়

অমল অক উঠি দাঁড়াইল। কোন কিছুই আজ তাহার ভ র্জন ি ড়ি দিয়া অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে সে গিয়াছে, সিঁড়ির মাঝে একটি মাত্র আলো। অশোভন—আশে-পাশে কেহ নাই দেখিয়া কলেজের লোকসমক্ষে সে সিগারেটই খা

আনমনে নাটাই ভাবিতেছিল—কুমারী

চার টাকা

তৃতীয় মুদ্রণ
আষাঢ়—১৩৬৪

৬

বসিয়াই রা
অন্যদিন কে
চাহিয়া দে
করিতে পারি
একটি শী
কোণে বসিয়া, তা
যেন খুঁজিয়া
উপর কু
প্রতিবি
আর

দেহ ও দেহাতীত

এক

অমল গরীবেরই ছেলে। আত্মীয়, স্বজন, বন্ধু-বান্ধবের সহানুভূতি এবং বিধবা মা'য়ের স্বর্ণালঙ্কারের অবশিষ্ট অংশের উপর নির্ভর করিয়াই সে বি-এ পাশ করিয়াছিল কিন্তু বিদ্যার্জ্জনের আকাঙ্ক্ষা তাহার তবুও মিটিল না। যেমন করিয়াই হউক সে এম্-এ পড়িবে স্থির করিল। যাহারা সাহায্য করিয়াছিল তাহারা এখন সাহায্য করিবে না, সে তাহা জানিত তবুও সে এম্-এ ক্লাসে ভর্ত্তি হইয়া গেল। ভাগ্য তাহার প্রসন্ন, একটা টিউসানীও জুটিয়া গেল। বাড়ীর সামান্য জমি-জমা হইতে একমাত্র বিধবা মাতার একবেলার হবিষ্যান্ন জুটিয়া যাইবে—সে নিশ্চিন্ত মনেই পড়া আরম্ভ করিল।

সে গ্রামের ছেলে, সম্ভবতঃ সেই জন্যই তাহার কৌতূহলটা বেশী হইয়া থাকিবে—যাহারা স্বাধীনভাবে ট্রামে বাসে চলা ফেরা করে, এক বোঝা বই লইয়া কলেজে যাতায়াত করে তাহারা কিরূপ, তাহাদের জীবনযাত্রা প্রণালী কিরূপ, তাহাদের মন কত উদার তাহা জানিবার জন্য একটা অদম্য কৌতূহল তাহার ছিল, সংগে সংগে নিজের দারিদ্র্য ও অক্ষমতার জন্য ভয়ও ছিল; কাজেই এম্-এ ক্লাসের সহপাঠিনীগণের

সহিত আলাপ করিয়া উঠিতে পারে নাই। যাঁহারা সে ভাগ করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে সে শ্রদ্ধার চোখেই দেখিত—যাঁহ সৌভাগ্য দান করিয়াছেন তাঁহাদিগকে সে সমীহ করিত।

সকালে একটা ক্ষুদ্র ঘটনা সারাটাদিন কলেজে তাহাকে দিয়াছে, মনটা বার বার বিমর্ষ হইয়া তাহাকে সকলের ক বিচ্ছিন্ন করিয়াই রাখিয়াছিল। এই ঘটনাটিকে অবলম্বন ক দারিদ্র্য ও অক্ষমতা আজ যেন হাতে হাতে ধরা পড়িয়া গিয়া কশাঘাতের লাঞ্ছনায় তাহাকে নিষ্পিষ্ট করিয়া দিতেছে। সামান্যই—

সকালে পড়াইতে গেলে জনৈকা কুমারী মহিলা দরজা খুলিয়া দিয়াছিলেন এবং নিজে তাহাকে আহ্বান না করিয়া দ্বিতলে উঠিতে উঠিতে অত্যন্ত অশ্রদ্ধা ও উপেক্ষার সঙ্গে উচ্চকণ্ঠে ছাত্রের উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন—খোকা পড়তে যা, মাষ্টার এয়েছে।

মাষ্টার কথাটির পরে "মহাশয়" ও এয়েছের পরে সামান্য অপরিসর একটি 'ন' যোগ করিলে এমন কোন ক্ষতি বা শ্রম তাহার হইত না, তথাপি এই দুইটির অভাব তাহাকে সারাটা দিন অশেষ লাঞ্ছনায় বিমর্ষ করিয়া দিয়াছে। একবার সে ভাবিয়াছে সম্মানই জগতে শ্রেষ্ঠ, অর্থের জন্য মনুষ্যত্ব বিক্রয় করা অপৌরুষ, অতএব ও টিউসানী সে ছাড়িয়া দিবে। আবার ভাবিয়াছে—ওইটুকুই তাহার অবলম্বন, আজ সে ছাড়িয়া দিলে তাহার আশা আকাঙ্ক্ষা, বিদ্যার্জ্জনের উচ্চাকাঙ্ক্ষা সবই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে। একদিকে সম্মান, অন্যদিকে বিফলতা এই দুইএর সংঘর্ষ তাহাকে সর্ব্বকর্ম্মে আজ বিমনা করিয়া তুলিয়াছে।

ছুটির পরে একটু চা খাইয়া সে লাইব্রেরীতে কয়েকখানা বই লইয়া বসিয়াছিল কিন্তু কোন শাস্ত্র কোন লেখকই আজ তাহার ভাল লাগিল না। কিছুক্ষণ অকারণ পাতা উল্টাইয়া ক্ষণিক সময় কাটাইয়া সে

বসিয়াই রহিল। পিছনের টেবিলে মহিলাগণ নানা কেতাব পাঠে ব্যস্ত—অন্যদিন কৌতূহলী সশ্রদ্ধ দৃষ্টিতে সে তাহাদিগকে সংগোপনে চাহিয়া চাহিয়া দেখে, কিন্তু আজ তাহারাও তাহাকে কোনরূপেই আকর্ষণ করিতে পারিল না।

একটি শীর্ণা, তন্বী, সুন্দরী, তরুণী, কুমারী রোজই টেবিলের এক কোণে বসিয়া, তাহার আয়ত চক্ষু মেলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষরের মাঝে কি যেন খুঁজিয়া মরে। কদাচিৎ চোখ মেলিয়া চায়, পাখার বাতাস কপালের উপর কুঞ্চিত চূর্ণকুন্তলগুচ্ছ আন্দোলিত করে, কাণের দুলে আলো প্রতিবিম্বিত হইয়া ঝিক মিক্ করে। সে আসে যায়, উঁচু-হিল্ জুতার শব্দে আরও অনেকের সঙ্গে অমলের চোখেও স্বপ্নাবেশ বুলাইয়া দিয়া যায়। অমল জানে না কেন, তবুও এই মেয়েটিকে তাহার ভাল লাগে—তাহার চেহারায় যেন একটা মাদকতা আছে, চলিবার বলিবার ভঙ্গির মধ্যে একটা উদার আভিজাত্য আছে—অথচ বেমানান চঞ্চলতা বা নিজেকে প্রাধান্য দিবার ব্যগ্র সচেষ্টতার দৈন্য নাই। অমল সংগোপনে, পড়িবার ফাঁকে ফাঁকে অন্য সকলের সঙ্গে তাহাকেই ভাল করিয়া দেখে।

নামটা লোকমুখে সে শুনিয়াছে—অত্যন্ত আধুনিক নাম—ডেজি। বিলাতী ফুলের নাম—কবির কাব্যের মারফতে আমাদের কাছে সুন্দর বলিয়াই মনে হয়।

অমল অকস্মাৎ বই বন্ধ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কোন কিছুই আজ তাহার ভাল লাগিল না। নির্জ্জন সিঁড়ি দিয়া অত্যন্ত ধীর পদক্ষেপে সে নামিতেছিল—সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছে, সিঁড়ির মাঝে একটি মাত্র আলো। কলেজে বিড়ি খাওয়া অশোভন—আশে-পাশে কেহ নাই দেখিয়া সে বিড়িই ধরাইয়া ফেলিল। কলেজের লোকসমক্ষে সে সিগারেটই খাইয়া থাকে।

আনমনে সে পুনরায় সকালের ঘটনাটাই ভাবিতেছিল—কুমারী

মহিলাটি কি ইচ্ছাকৃতভাবেই তাহাকে অপমান করিয়াছে, না 'মাণ্টার'কে তাহারা ঠাকুর চাকরের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়া এইরূপেই সম্বোধন করিয়া থাকে—নিতান্তই অভ্যাস-প্রসূত!

বিড়ি নিঃসৃত একরাশ ধোঁয়া বাতাসে বিলীন হইবার সঙ্গে সঙ্গে বাতাসে স্বচ্ছতা ফিরিয়া আসিল—অমল আশ্চর্য্য হইয়া দেখে—ডেজি তাহারই পাশে পাশে অত্যন্ত নিঃশব্দে নামিতেছে—

বিড়িটার জন্য লজ্জিত হইয়াছিল কিন্তু ফেলিয়া দিয়া লাভ নাই—ডেজি নিশ্চয়ই দেখিয়াছে। সে লজ্জিত হইয়া সরিয়া যাইতেছিল। অকস্মাৎ ডেজি তাহাকেই সম্বোধন করিয়া বলিল—আপনার নাম অমল বন্দ্যোপাধ্যায়?

—হঁ্যা।

—আপনি ইংলিশে ফাণ্টক্লাস পেয়েছিলেন?

—হঁ্যা। আপনি জান্‌লেন কেমন করে?

ডেজি এ প্রশ্নের জবাব না দিয়াই বলিল—'সংহতি'তে আপনার কবিতাটা আমার খুব ভাল লেগেছে। আপনি কি আগেও লিখ্‌তেন?

অমল হাসিয়া বলিল—লিখতাম, তবে তা ছাপা হয়নি—

ডেজি মৃদু হাসিয়া বলিল—ছাপাতে চেণ্টা ক'রেছিলেন কি!

—বিশেষ না।

—আপনি ত খুব পড়েন লাইব্রেরীতে—না?

অমল মাথা চুলকাইয়া বলিল—বই সামনে ক'রে বসে থাকাই পড়া নয়, কাজেই ব'ল্‌তে হয় লাইব্রেরীতে অনেকক্ষণ থাকি—এই পর্য্যন্ত—

ডেজি হাসিয়া বলিল—আপনার বিনয় যথেণ্ট সন্দেহ নেই, কিন্তু পড়াটা ত পাপ কার্য্য নয় যে তাকে অস্বীকার ক'রতে হবে—

অমল সংক্ষেপে বলিল—বলা বাহুল্য মাত্র—

অমলের হাতের মধ্যে জ্বলন্ত বিড়িটা নিভিয়া গিয়াছিল, সে সেটাকে ফেলিয়া দিল। ডেজি মৃদু হাসিয়া বলিল—আপনি বিড়ি খান ?

—অস্বীকার করলে আপনি বিশ্বাস করবেন না নিশ্চয়ই !

—কেন খান ?

—অভ্যাস—আপনার প্রশ্ন কি ? সিগারেট না খেয়ে বিড়ি খাই কেন ?

—হ্যাঁ।

অমল মিথ্যা কথা বলিল—খাই আমি চুরুট, কিন্তু এখানে চুরুট সেবনের সময় নেই—আর চুরুট বিনা সিগারেট বিড়ি উভয়েই সমান।

—তবে সিগারেট খেলেই ত পারেন, গন্ধটা তবুও সহ্য হয়।

অমল তাচ্ছিল্যের সহিত অভিনয় করিবার ভঙ্গিতে বলিল—That's meant for ladies.

ডেজি সিঁড়ির মাঝে অকস্মাৎ থামিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—তার মানে ?

—মানে, অত্যন্ত নরম, নেশা হয় না।

আবার দুই জনেই শ্লথ মন্থর পদক্ষেপে সোপান অতিক্রম করিতেছিল। অমল সহসা বলিল—মিস্ ডেজি—

ডেজি বলিল—আমার নাম ডেজি তা জান্‌লেন কি ক'রে ?

—লোক-পরম্পরায় অবগত হ'য়েছি—

—আপনারা আমাদের সম্বন্ধে এতও খোঁজ ক'রতে পারেন ! আমার ডাক-নাম ওই কিন্তু আসল নাম অপর্ণা রায়—কিন্তু ডাক-নামটা সংগ্রহ ক'রলেন কি ক'রে !

অমল ডেজির এই ব্যঙ্গে আহত হইয়াছিল, সে জবাব দিল - আমার নাম আপনি ঠিক যেমন ক'রে জান্‌লেন তেমনি ক'রেই জেনেছি।

ডেজি একটু হাসিয়া মুখের দিকে চাহিল—এরূপ উত্তর সে প্রত্যাশা করে নাই। অমল প্রশ্ন করিল—আপনি অপর্ণা রায় ?

—হ্যাঁ, কেন বলুন ত ?

—গেজেটে আমার নামটির ঠিক পরেই ওই নামটি ছাপা হ'য়েছিল কাজেই কৌতূহল হওয়া স্বাভাবিক, আর আজকে আপনার সঙ্গে এমনি অকস্মাৎ আলাপ হওয়াটাকে তাই একটা lucky coincidence ব'লে মনে হচ্ছে।

ডেজি একটু হাসিয়া বলিল—Lucky ?

ডেজি প্রগল্‌ভের মত ক্ষণিক হাসিয়া, ছোট্ট সুবাসিত রুমালে কপাল মুছিয়া বলিল—গেজেটে নামটা ঐ জায়গাটায় ছাপা হওয়াটাও তা হ'লে Lucky !

—আপনার যদি আপত্তি না থাকে।

কথা বলিতে বলিতে দুইজনে একেবারে রাস্তায় আসিয়া পড়িয়াছিল। অমল তাই প্রশ্ন করিল—আপনি ত ট্রামেই যাবেন ?

—হ্যাঁ।

—চলুন। তুলে দিয়ে আসি—আজকার এই সামান্য পরিচয়ের পরে এটাকে কর্ত্তব্য বলে মনে ক'রছি।

—ধন্যবাদ।

ডেজিকে ট্রামে তুলিয়া দিয়া অমল হাঁটিয়াই মেসে ফিরিতেছিল। সকালের বেদনাদায়ক ঘটনাটা অকস্মাৎ যেন উবিয়া গিয়াছে। ডেজির প্রসঙ্গ তাহার অন্তরকে সুখ-স্বপ্নের সৌরভে সুবাসিত করিয়া দিয়াছে। অমল আনমনেই পথ চলিতেছিল—

এখনই ছাত্র পড়াইতে যাইতে হইবে।

মেসের সংকীর্ণ বিছানায় শুইয়া শুইয়া সে তাহাই ভাবিতেছিল—পড়াইতে যাইবে কিনা! সকালের পুঞ্জীভূত অভিমান নৈরাশ্য ও অপমান যেন ডেজির অঞ্চল সঞ্চালনে অন্তর্হিত হইয়াছে। ডেজির কথা কয়েকটি বার বার তাহার অন্তর অনবদ্য সুখাবেশে সুবাসিত

করিয়া দিতেছে। মনে মনে সে প্রশ্ন করে—ডেজি এমন করিয়া সংগোপনে অতি অকস্মাৎ তাহার সঙ্গে আলাপ করিল কেন? এতদিন ত কোন কৌতূহল প্রকাশ করে নাই—তাহার মনে কি কোন দুর্ব্বলতা দেখা দিয়াছে? প্রেমের দেবতা অন্ধ—হয়ত তাহাই।

সে বসিয়া বসিয়া তাসের ঘর নির্ম্মাণ করে—টালিগঞ্জের ছোট্ট একটি গৃহ, তাহার মাঝে গৃহবধূ ডেজি—প্রয়োজন হইলে দুইজনেই উপার্জ্জন করিতে পারিবে। এই ক্ষুদ্র গৃহের কর্ত্রী হইবেন তাহার অনশনক্লিষ্টা, দীর্ঘবৈধব্যের কৃচ্ছ্রসাধনে শীর্ণা মাতা। কোন অশুভ মুহূর্ত্তে তিনি অমলকে লইয়া বিধবা হইলেন, তাহার পর দুঃখে, দৈন্যে, অনশনে বহুদিন চলিয়া গিয়াছে। তাঁহার নিজের গৃহ একদিন অকস্মাৎ ভূমিকম্প বিধ্বস্ত হইয়াছিল, পুত্রের গৃহের মাঝে সে গৃহকে হয়ত ফিরিয়া পাইবেন—ডেজি হয়ত ধনী কন্যা, হয়ত এ কেবল বিলাস মাত্র, হয়ত সামান্য কৌতূহল মাত্র···কিন্তু অমল তাহা বিশ্বাস করিতে চাহে না—

সকালের সমস্ত দুঃখকে ভুলিয়া অমল হৃষ্টচিত্তেই ছাত্র পড়াইতে রওনা হইল।

দৈনন্দিন অভ্যাস মত কড়া নাড়িতেই একজন মহিলা দরজা খুলিয়া দিলেন। কালকার সেই উদ্ধত, অহঙ্কারী কুমারী মেয়েটি। অমল অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিতেই তিনি বলিলেন—আসুন, খোকা মামাবাড়ী গেছে, একটু দেরী হবে, বসুন—

অমলের কথা বলিবার প্রবৃত্তি ছিল না। সে নিঃশব্দে পড়ার ঘরে ছারপোকাসঙ্কুল বেতের চেয়ারের উপর খবরের কাগজ পাতিয়া বসিয়া পড়িল। মহিলাটি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া অত্যন্ত ভদ্রতার সঙ্গে বলিলেন—একটু চা খাবেন কি?

অমল সংক্ষেপে বলিল—না থাক্।

—আপনি ত ভারী লাজুক—চা না খেলে সময় কাটাবেন কেমন ক'রে?

অমল ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিল কালকের সেই মহিলাটিই, আজ তাহার মুখে চোখে একটা সকৌতুক প্রচ্ছন্ন হাসি রহিয়াছে। এ ব্যবহার যদি কেবলমাত্র অভিনয়ই না হয় তবে কাল দুইটি কথার জন্য ওই বাচনিক মিতব্যয়িতা না দেখাইলেও ক্ষতি ছিল না। অমল বলিল—প্রয়োজন নেই, তাই, নইলে এক আধ কাপ চা খেলে গুরুভোজনের কোন সম্ভাবনা নেই।

মহিলাটি হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন—আপনি ত বেশ কথা বলেন। আপনি ত এম্-এ পড়ছেন?

—হ্যাঁ। কৌতূহল প্রকাশ করা অন্যায়, তাহ'লেও জিজ্ঞাসা করি, আপনি কি খোকার দিদি?

—হ্যাঁ, খোকার দিদি। পরিচয়টা বিশেষ ক'রেই দি, নাম আমার রমলা। কি পড়ছি সেটাও জান্‌তে চান নিশ্চয়ই? ···বি-এ পড়ি বেথুনে। আর কিছু জিজ্ঞাসা করবেন কি?

অমল মেয়েটির প্রগল্‌ভতায় আশ্চর্য্য হইয়াছিল, সে বলিল—এর পরে আর প্রশ্ন করা চলে না—তবে আপনি বলে গেলে শুন্‌তে পারি—সেটা সম্ভবতঃ দোষের হবে না।

—আমার কমবিনেশন্ ইকন্‌মিক্স, হিষ্ট্রি, অনার্স প্রথমটায়, আমাদের সাত জনের অনার্স আছে, ক্লাসে একশ' ছাব্বিশজন মেয়ে। ডলি দত্ত দেখ্‌তে সবচেয়ে সুন্দরী···রমলা নিজেই অত্যন্ত অশোভন ভাবে হি হি করিয়া হাসিয়া বলিল—আচ্ছা বসুন, চা নিয়ে আসি।

রমলা চলিয়া গেল—অত্যন্ত অহেতুকভাবে আঁচলটাকে দোলাইয়া নাচাইয়া কাঁধে ফেলিয়া এবং চলন ছন্দে অশোভন গতি ও ভঙ্গি দিয়া। অমল হাসিয়া ফেলিল। কাল ওর ব্যবহারে সে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল, আজ

ওর প্রগল্‌ভতা পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছে। অমল আপনমনে বসিয়া বসিয়া ভাবিতেছিল—ও হয়ত কোন পুরুষকে তাহার ঐশ্বর্য্য, রূপ ও বিদ্যাদ্বারা সম্মোহিত করিতে পারে নাই, তাই অভাগ্য মাষ্টারটিকে পাইতে চায় তাহার ভগ্ন-হৃদয় একান্ত উপাসক করিয়া। জীবনে আজই সে প্রথম দুইটি মহিলার সহিত পরিচিত হইয়াছে সত্য, কিন্তু অমল একথা মনে মনে বিশ্বাস করিত যে, আধুনিক মেয়েদের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবের বিষয় হইতেছে এই যে, তাহার জন্য শতাধিক বুভুক্ষু নর উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমের কবিতা লিখিতেছে। অমল নিজেই হাসিয়া ফেলিল—মিস্ রমলা যে পাত্রটিকে সেই গৌরবময় আসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহিতেছেন সে সে পদের সম্পূর্ণ অযোগ্য।

মিস্ রমলা চাকরের মারফতে এককাপ চা ও একটি স্যাণ্ডউইচ আনিয়া বলিলেন—নিন্, এটুকুর সদ্ব্যবহার ক'রতে ক'রতে হয়ত খোকা এসে পড়বে—

অমল হাসিয়াই বলিল—আপনার আদেশ পালনের জন্য আমি আপ্রাণ চেষ্টা করবই।

মিস্ রমলা অকস্মাৎ অভিনেত্রীর মত কপট অভিমানে ওষ্ঠ উল্টাইয়া বলিলেন—এটাকে আদেশ মনে ক'রলেন, অনুরোধ কি ভদ্রতাও মনে ক'রতে পারেন ত?

অমল স্যাণ্ডউইচে একবার কামড় বসাইয়া বলিল—আপনি ভুললেও আমার পক্ষে এটা ভুল করা সম্ভব নয়—আমি ত আপনাদের চাকরই—

মিস্ রমলা কথাটা শুনিয়া হয়ত আনন্দিতই হইয়াছিল,—এ কি বলছেন মাষ্টারম'শায়, মানুষ মানুষই, টাকা দিয়ে কি তার বিচার হয়—

মাষ্টারম'শায় সম্বোধনটা অমলের পিঠের উপর যেন কশাঘাতের মত আসিয়া পড়িল। সে বলিল - মোটরগাড়ী চিরদিনই পথচারীর গায়ে কাদাজল ছিটিয়ে দিয়ে যায়, এর অন্যথা হওয়া সম্ভব নয়, কাজেই দূরে

থাকাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ। আর মাস্টারম’শায়টা আমার পৈতৃক নাম নয়—বাপ-মা আমার একটা নাম দিয়েছিলেন—সেটা হচ্ছে অমল।

অমলের কথা কয়েকটির মধ্যে যে তীব্র ভৎ’সনা ছিল তাহা না বুঝিয়াই মিস্ রমলা বিজ্ঞের মত ক্ষণিক বোকার হাসি হাসিয়া বলিলেন—আপনার নাম অমল, নামটি ত বেশ!

—আজ্ঞে বাপ-মায় যদি ঘন্টাকর্ণ, কি ঘটোৎকচ ধরণের একটা নামও দিতেন তবে তাও আমার কাছে ভালই হ’ত।

খুব উচ্চাঙ্গের একটা রসিকতা হইয়াছে মনে করিয়া রমলা ক্ষণিক মুখে আঁচল দিয়া হাসিয়া লইলেন—আর বলিলেন—চা’টা ঠাণ্ডা হ’য়ে গেল যে!

অমল এতগুলি কঠোর কথা বলিয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিতেছিল, তাই বলিল—আপনার অতিথি সেবার দিকে যা নজর দেখছি, তাতে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি এবং আমি সেই অতিথি বলে গর্ব্বও বোধ করছি।

রমলা কি যেন ক্ষণিক ভাবিয়া বলিল—আপনি কবিতা টবিতা লেখেন না?

—আজ্ঞে ভুলক্রমেও না। আর যত অপবাদই লোকে দিক, এ অপবাদ কখনই কেউ দেবে না।

—কলেজের পত্রিকায়ও নয়?

—না।

—আপনার অনার্স ছিল কিসে?

অমলের অনার্স ছিল ইংরাজি সাহিত্যে এবং সে ফার্ষ্ট ক্লাসও পাইয়াছিল কিন্তু ইচ্ছা করিয়াই মিথ্যা বলিল—অনার্স অঙ্কে, পেয়েছি একটা কোনমতে সেকেণ্ড ক্লাস।

রমলা রসিকতা করিল—ও বাবা অংক! আপনি দেখছি একেবারেই কাপালিক—

অমল কহিল—কাপালিক, তবে কপালকুণ্ডলাও নেই এবং নবকুমারেরও অভাব—

রমলা বিস্ফারিত আঁখিভঙ্গিতে কৃত্রিম মাদকতার প্রলেপ দিয়া ব্রীড়াভঙ্গিসহ বলিল—কে বলে, আপনি কবি নয়! কাপালিক প্রসঙ্গে যখন কপালকুণ্ডলার কথা মনে হয়—

—ওটা কাপালিকের কবিত্ব! সংসর্গে তা হ'তে পারে—

—জীবনে আমি কবিতা লিখিনি আপনার ভয় নেই—তবে কলেজের কাগজে, সকলে ধরলে তাই একটা কোনমতে লিখেছিলাম।

অমল আগ্রহের সহিত বলিল—কিন্তু, আপনাদের কলেজের কাগজ কোথায় পাই?

রমলা বলিল—আপনার ত ভারী কৌতূহল—আচ্ছা দেব একদিন প'ড়তে—

অমল মনে মনে হাসিতেছিল সন্দেহ নাই। রমলার স্বল্পবুদ্ধিপ্রসূত কথার মাঝে মাঝে তাহার নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করিবার নগ্ন-প্রয়াস বেশ সুস্পষ্টভাবেই সে বুঝিতেছিল তাই বলিল—আমার মত কাপালিকের কবিতা বোঝা অবশ্য একটা অনৈসর্গিক ব্যাপার—তবুও আপনার লেখা ব'লেই তা পড়তে খুব কৌতূহল হ'চ্ছে। লেখক লেখিকাকে সামনে দেখার সৌভাগ্য ক'জনের হয়!

রমলা এই প্রশংসাবাদে আরও অনেকের মতই খুশী হইয়াছিল। সে লাস্যময়ী সুদক্ষ অভিনেত্রীর মত আঁখিভঙ্গি করিয়া বলিল—আপনার বিনয় প্রশংসনীয়। তবে আপনার কৌতূহল কবিতার প্রতিই—না কবির প্রতি—

রমলার কথার মধ্যে যে ইঙ্গিত ছিল তাহা অমল ভাল করিয়াই বুঝিল।

ঈষৎ হাসিয়া রমলার পাউডার অবলুপ্ত সুঠাম সুন্দর মুখখানাকে ভাল করিয়া দেখিয়া বলিল—প্রথমটাকে ভদ্রতার রীতি অনুসারে স্বীকার করা চলে, দ্বিতীয়টা বলা চলে না—যদিও দ্বিতীয়টাই অনেক সময় প্রবলতর হ'য়ে দেখা যায়—

খোকা আসিয়া পড়িল। রমলা অধ্যয়ন অধ্যাপনার সুযোগ দিয়া প্রস্থান করিল। খোকাকে বৃহৎ একটা অঙ্ক কষিতে দিয়া অমল কি যেন এলোমেলো ভাবিতেছিল···রমলা এমনি করিয়া স্বেচ্ছায় প্রগল্‌ভতার সহিত এ অকারণ হৃদ্যতা করিয়া গেল কেন? সে কি তাহার মাঝে একটি অনুগত পারিষদকেই চায়—না আরও কিছু—ডেজিও ত ঠিক এমনি করিয়াই আলাপ করিয়া গিয়াছে—কেন?

অমল ছাত্র পড়াইয়া ফিরিবার পথে নিজে নিজেই বেশ আমোদ উপভোগ করিতেছিল, কতকটা আত্মপ্রসাদে, কতকটা সাফল্যে। আজ যে সে সেই উদ্ধত রমলাকে যথেষ্ট ব্যঙ্গ করিয়া তাহার 'ন' এর অ-ব্যবহারকে শতগুণে ফিরাইয়া দিতে পারিয়াছে এই জন্য মনে মনে গর্ব্বই অনুভব করিতেছিল। সে যে কাপালিক সাজিয়া কোনরূপ কবিতা লিখিতে পারে না প্রভৃতি নানা অসত্য কথা বলিয়া আসিয়াছে সে জন্যও বেশ একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছিল—মিথ্যা কথা বলিয়া যে অনেক সময়ে এমন আনন্দ পাওয়া যায় সে তাহা পূর্ব্বে প্রত্যক্ষ করে নাই। রমলার পদাশ্রিত হইয়া ব্যর্থ প্রেমিকের ভূমিকা অভিনয় করিতে সে প্রলুব্ধই হইয়া উঠিয়াছিল।

বাসায় ফিরিয়া ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাস পড়িবার কথা ছিল, কিন্তু সে কোন ক্রমেই তাহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিল না। রমলার কথা মনে করিয়া সে হাসিল এবং ডেজির কথায় মনে মনে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল। সে ভুলিয়াই যায় যে সে একান্তই দরিদ্র—ডেজির এই আলাপ, হয়ত কেবল কৌতূহলই অথবা রমলার বাসনারই

একটা ভব্য প্রকাশ। অমল মনে মনে নানা সম্ভব অসম্ভব কথা ভাবিতে ভাবিতে যেন অকারণেই প্রফুল্ল হইয়া উঠিয়াছে। ডেজির সঙ্গে কালও হয়ত দেখা হইবে, হয়ত পরিচয় আর একটু ঘনিষ্ঠতা লাভ করিবে—

অমল ভাবে দারিদ্র্য ও এই কৃচ্ছ সাধনের একটা পুরস্কার হয়ত' আছে। যৌবনের মন লইয়া আরও অনেকে যেমন মনে মনে মানসী মূর্ত্তি'র সৃষ্টি করিয়া বাহ্য জগতে তাহাই খুঁজিয়া বেড়ায় অমলও যে তেমনি কিছু করে নাই, একথা বলিলে কেহ বিশ্বাস করিবে না। আজ অকস্মাৎ ডেজির মাঝে সে তাহার মানসীকে আবিষ্কার করিয়া ফেলিয়াছে—যাহা কেবলমাত্র কল্পনারই, যাহা পাওয়ার অতীত তাহাকে ছোট করিয়া, ডেজির শত অক্ষমতাকে মার্জ্জনা করিয়া, তাহার দেহ সৌষ্ঠবের ত্রুটিকে উপেক্ষা করিয়া অমল তাহাকেই মনের মাঝে একান্ত দুর্লভ করিয়া অতি সংগোপনে আপনার করিয়া রাখিয়া দিল—

অমল জানিত, এমনি করিয়া সকল মানুষই আকাশের রঙিন্ মেঘলোক ছাড়িয়া মর্ত্ত্যের বস্তুর মাঝে নামিয়া আসে - মানুষের মনের এই অবরোহণ তাহাকে সর্ব্বসাধারণের মতে স্বাভাবিক করিয়া তুলে।

দুই

কলেজ বারটায়।

উড়িয়া ঠাকুরের বিস্বাদ রান্না মহাতৃপ্তির সঙ্গে খাইয়াই অমল উপরে উঠিয়া আসিল। মাত্র দশটা বাজিয়াছে। এত সকালে কেমন করিয়া কলেজে যাওয়া যায়! যাহা হউক মনে মনে একটা অজুহাত ঠিক করিয়া ফেলিল—লাইব্রেরীতে পড়া যাইবে।

লাইব্রেরীর প্রশস্ত কক্ষে বসিয়া বারবার রাস্তার দিকে চাহিয়া সে অপর্ণার প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু অপর্ণা আসে নাই। হয় ত একেবারে ক্লাসেই যাইবে, হয়ত আজ সে নাও আসিতে পারে, তাকাইয়া তাকাইয়া তাহার মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল। প্রতীক্ষাচঞ্চল অন্তর লইয়া পড়া সম্ভব নয়, সে পাতা উল্টাইতেছিল মাত্র।

অপেক্ষা করিয়া করিয়া ক্লান্ত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। বারটার আর বিলম্ব নাই—একটি একটি করিয়া সোপান অতিক্রম করিতে করিতে সে নানা কথা ভাবিতেছিল, হয়ত সিঁড়িতে দেখা হইবে, হয়ত সে প্রশ্ন করিবে, হয়ত করিবে না ; তাহাকেই যাহা হয় বলিতে হইবে—

অমল হঠাৎ চাহিয়া দেখে অপর্ণা তিনতলার বারান্দা দিয়া যাইতেছে, কিন্তু দূরত্বটা কথা বলিবার মত নয়। বেশ তাহার আজ উল্লেখযোগ্য—অতি মিহি এবং জরিদার শাড়ী, ঘন নীলরংএর গভীর পটভূমির সামনে তাহার গৌরবর্ণ মুখখানি সুন্দরতর দেখাইতেছে -

অপর্ণা ফিরিয়া চাহিল কিন্তু কথা বলিবার কোনরূপ আগ্রহ প্রকাশ না করিয়াই সে তাহাদের কমন-রুমে চলিয়া গেল। অমল দুঃখিত হইয়াছিল, গত কালের অকুণ্ঠ ও আগ্রহপূর্ণ আলোচনার পর আজকার এ উপেক্ষা খুব স্বাভাবিক নয়। শঙ্কা ও দ্বিধার মাঝে অমল ভাবিল—তাহার সম্বন্ধে সামান্য কৌতূহল হয়ত, পরিতৃপ্ত হইয়া গিয়াছে। তাহার ব্যক্তিগত অবস্থার সহিত অপর্ণার অনেক তফাৎ এখানে তাহার পক্ষে বন্ধুত্বের লোভ করা নির্বুদ্ধিতা মাত্র।

অমল ক্লাসে বসিয়াছিল—অধ্যাপকের বক্তৃতাও শুনিতেছিল। অদূরে অপর্ণা বসিয়া আছে তাহা স্পষ্ট না দেখিলেও দৃষ্টি-পথের প্রান্তভূমির মাঝে তাহার মুখখানি মাঝে মাঝে দেখা যায়।

চারটা পর্য্যন্ত পর পর ক্লাস করিয়া অমল ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল এবং বার বার সে নিজেকে বুঝাইয়াছিল—অপর্ণার ওই ক্ষুদ্র কথা

কয়েকটিকে এত মূল্য দিবার, এত বড় করিয়া ভাবিবার কোন কারণই নাই, তবুও অপর্ণার পরিচয় ও কথা কয়েকটিকে সে কিছুতেই মন হইতে নির্ব্বাসিত করিতে পারে নাই। মানুষের মনের যে এত বড় দুর্ব্বলতা আছে অমল তাহা পূর্ব্বে ভাবে নাই—

চা খাইয়া সে ভাল ছেলের মত পড়া আরম্ভ করিবে মনস্থ করিল। মনকে সে কিছুতেই আর বিমনা হইতে দিবে না।

অতএব চা পানান্তে সে হন্ হন্ করিয়াই লাইব্রেরীতে যাইতেছিল। কে যেন তাহাকে ডাকিল—অমলবাবু।

ফিরিয়া চাহিয়া দেখে—অপর্ণা !

—ও—নমস্কার—কি ব'লছেন ?

অপর্ণা রুমালে মুখ আড়াল করিয়া একটু ব্যঙ্গ করিল,—কি ভাবতে ভাবতে যাচ্ছেন যে জ্যান্ত মানুষ, এমন কি মেয়েমানুষগুলোও চোখে পড়ে না ?

—ও আপনাকে লক্ষ্য করিনি, ক্ষমা করবেন। লাইব্রেরীতে যাচ্ছি।

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া বলিল—বলা বাহুল্য মাত্র !

—আপনি যাবেন না ?

—যাবো চলুন।

চলিতে চলিতে কথা হইতেছিল, অমল বলিল—আপনাকে আজ যেন একটু কেমন দেখাচ্ছে ?

—কেমন অর্থাৎ ভাল না মন্দ ?

—সম্ভবতঃ ভালই।

—ও চোখও খারাপ হ'য়েছে, ভালমন্দ বুঝতে পারেন না !

—না ঠিক তা নয়, স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু মনে ঠাহর ক'রতে পাচ্ছি না।

—আটপৌরে মিলের কাপড় পরলে ভাল হতো।

—সে বেশে দেখ্‌লে বিবেচনা ক'রতে পারি।

—বেশ। আপনার বিদ্রূপ বুঝ্‌লাম।

—বিদ্রূপ?

—হ্যাঁ, এ কাপড়খানা যে আপনার চক্ষুশূল সেটা বুঝ্‌তে পেরেছি কিন্তু কি ক'রবো; আমার চোখে ত ভালই লাগ্‌লো—তাই। যাকগে—

অমল হাসিয়া কহিল—যাক্‌গে ব'ল্‌লেই ত যায় না। আমি বল্‌তে চাই যে এখানা আপনাকে বেশ মানিয়েছে কিন্তু ভাষা আমাকে প্রতারিত ক'রেছে—

—আপনিও করেছেন। যাক্‌, আমাদের একটা ক্লাব আছে, নাম হ'চ্ছে নিও কালচারাল সোসাইটি। আপনাকে মেম্বার হ'তে হবে। মাসিক চাঁদা দু' টাকা। কেমন? নামটা তুলে নেব ত?

অমল বলিল—সেখানে আধ্যাত্মিক তত্ত্বকথা আলোচনা হয় না ত!

—তার মানে?

—আমার বড্ড ভয় করে ও শুনলে! আর ক্লাসিক গান হয় না ত?

—ভয় নেই।

—ভরসাটা কি পরিষ্কার করে বলুন। সাদা কাগজে নাম সই করাটা হঠকারিতা নয় কি? অমলের ভয় প্রশমিত হয় নাই—প্রকৃত ভয়টা তাহার ছিল চাঁদার ব্যাপারে। মাসিক দুই টাকা চাঁদা দিলে বৈকালের চা ও টোষ্ট খাওয়া বন্ধ করিতে হইবে—সেটা খুব সহজসাধ্য ও স্বাস্থ্যকর নয়।

—আমি ওই ক্লাবের সেক্রেটারী, তা জেনেই কি আপনার মেম্বার হওয়া সম্ভব নয়?

—খুব সম্ভব ছিল কাল, কিন্তু আজ নেই ; কারণ আজ মনে হ'চ্ছে আপনি ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ, হঠযোগ প্রভৃতি ব্যাপারে জড়িত।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল। হঠাৎ ফিরিয়া চাহিয়া চোখের দৃষ্টিটা অমলের মুখের উপর হানিয়া বলিল—বাইরে দেখে মনে হয় আপনি নেহাৎ বেচারী কিন্তু আপনার পেটে এত !

—পেটে নয় মুখে। স্পষ্ট করে বুঝিয়ে বলুন, যা হয় করি। একটা অপ্রিয় স্বীকারোক্তি করি—আমি একটু দেরীতে বুঝি এটা মনে রাখবেন।

—তবে শুনুন, এ ক্লাবে সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান, অর্থনীতি, রাজনীতি প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হয়, সকলে সারগর্ভ প্রবন্ধাদি পড়েন। যার বাড়ীতে সভা হয় তিনি কিছু জলযোগের বন্দোবস্ত রাখেন—

—বটে ! তবে—তবে ত সভ্য হ'তেই হবে।

—জলযোগের জন্য ?

—হ্যাঁ, নইলে দর্শন, বিজ্ঞান, সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞান-সঞ্চয়ের মত মহৎ অভিপ্রায় আমার নেই। আমি পড়ি ডিটেকটিভ বই, দেখি অভিযানের ফিল্ম, আর থিয়েটারের নাচ গান—কারণ আমার মতে থিয়েটার সিনেমায় যারা হিতোপদেশ শুনতে চায় তাদের মত ভণ্ড পাষণ্ড আর নেই।

—থিয়েটার সিনেমার ওপর আপনার রাগ কেন ?

—রাগ নয়, অনুরাগ আছে—তাই বিশ্রামের সময় বিজ্ঞাপনগুলি আমি ভাল ক'রে দেখি, ছবির থেকে সেগুলো আমার আরও ভাল লাগে—

অপর্ণা বলিল—বেশ, ভগবৎ কৃপায় আপনি বিজ্ঞাপনই দেখুন। কাল থেকে আপনি তাহ'লে সভ্য।

অমল বলিল—আপনি যে এই সৌভাগ্যলাভের অবলম্বন একথা কোন দিনও ভুলবো না। মিস্ ডেজি—

—ডেজি, ডেজি আবার কি? মনে রাখবেন আমাদের ক্লাবের মেম্বার ইচ্ছা ক'রলেই হওয়া যায় না। কোন মেম্বার কাউকে উপযুক্ত মনে ক'রলে তবে তার মারফৎ তাকে সভ্য করা হয়। তেমনি ইচ্ছে ক'রলেই ডেজি নাম ধরে ডাকা যায় না।

উত্তরের অবসর না দিয়াই অপর্ণা লাইব্রেরীতে ঢুকিয়া গেল—এমন ভাবে চলিয়া গেল যেন অমলকে সে কোন দিনও চিনে না।

অপর্ণার ছন্দময় কথাগুলিতে অমলের মনের মেঘ কাটিয়া গিয়াছিল—মনে মনে সে গর্ব্বে এবং অনাগত সৌভাগ্যের আশায় পুলকিত হইয়াছিল। অপর্ণার সহিত পরিচয় ও এই সামান্য ঘনিষ্ঠতা তাহার জীবনে মহা মূল্যবান সামগ্রী—জন্মাবধি অসাধ্য কৃচ্ছ সাধন অনটন ও অসচ্ছলতার মধ্যে তাহার মন মুমূর্ষু মৃতপ্রায় হইয়াছিল, আজ তাহা যেন শতদলের সৌন্দর্য্য ও সৌরভ লইয়া আস্তে আস্তে পাপড়ি মেলিতেছে।

রাস্তায় দেবদারু গাছে নতুন পাতা গজাইয়াছে, স্বল্প কিশোর পত্রের সমাবেশে বৃক্ষের শ্যামলতা যৌবনের সাধনা আরম্ভ করিয়াছে। অমল ভাবিল—রমলার সহিত হয়ত সাক্ষাৎ হইবে, সে হয়ত তাহাকে তাহার একনিষ্ঠ ভগ্ন-হৃদয় উপাসক রূপে চাহিবে। মন্দ কি, সে তাহারই অভিনয় করিবে—এ অভিনয়ে যদি সে আনন্দিত হয় ক্ষতি কি?

ছাত্র তারস্বরে এ, বি, সি, ত্রিভুজের বাহু ও কোণের পরিমাণ ও সমতা সম্বন্ধে বর্ণনা পাঠ করিতেছে। অমল ঘরে প্রবেশ করিয়া বলিল—তোমার অঙ্ক হ'য়েছে—

ছাত্র ভীত চিত্তে অর্দ্ধভুক্ত ত্রিভুজকে ত্যাগ করিয়া বীজগণিত আরম্ভ করিল। অমল আশ্চর্য্য হইল নিজেরই দুর্ব্বলতা দেখিয়া—যাহার সহিত

সে মাত্র অভিনয় করিতেই চাহিয়াছে, তাহার আগমন পথের দিকেই সে বারবার চাহিতেছে।

রমলা আসিল এবং বিনা ভূমিকায়ই প্রশ্ন করিল—কতক্ষণ এসেছেন মাস্টারম'শায় ?

—অল্পক্ষণ, মিনিট দশেক হবে। আপনি ভুলে গেছেন, বাপ মার দেওয়া নামটা হ'চ্ছে অমল। মাস্টারিটা আমার বৃত্তি।

—ও হাঁ হাঁ, অমলবাবু, চা খাবেন ?

—প্রয়োজন নেই, তবে খেতে পারি। হাঁ, আপনি সেই বইটা পেয়েছেন ?

—কলেজের পত্রিকা—হাঁ, আচ্ছা দেব'খন, আপনি ভুলে যান নি তাহ'লে ? রমলার চোখে একটু আনন্দের অভিব্যক্তি ধরা-পড়ার-মত-ভাবেই প্রকাশিত হইয়া পড়িল।

অমল হাসিয়া বলিল—আপনার স্মৃতিশক্তির অভাবের জন্যে কেবলমাত্র সমবেদনাই জানানো যায়।

—তার মানে ?

—আপনি আমার নামটাই ভুলে গেলেন, আর আমি কতদূর মনে ক'রে আছি ভাবুন ত।

রমলা হো হো করিয়া ক্ষণিক হাসিয়া বলিল—ভুলি নি, অভ্যাসবশতঃ মুখে আসে।

—আমিও ত মিস্ মিত্র না বলে খোকার দিদি বলতে পারি।

—তা'তে ত অসম্মান হয় না কিছু, ইচ্ছে হ'লে ব'লবেন। আচ্ছা বসুন, আমি আসি।

অমল বীজগণিতের সূত্র বিশ্লেষণ করিয়া বুঝাইতেছিল কিন্তু মনের মধ্যে এ ও বি পরস্পর মিশিয়া যেন গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছে।

চাকরের মারফতে চা আসিতে না আসিতে রমলা আবার আসিয়া উপস্থিত হইল—সঙ্গে তাহার ম্যাগাজিন।

অমল চা খাইতে খাইতে অত্যন্ত আগ্রহেই পৃষ্ঠা উল্টাইতেছিল। কবিতাটি মনোযোগ সহকারে পড়িয়া সে হাসিতেছিল—কবিতার ত্রুটি বা অক্ষমতাই তাহার কারণ নয়। কবিতাটি তাহার সুপরিচিত এবং বি-এ পড়িবার সময় যে কবিতাটি কলেজ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল তাহাই আজ বেমানান একটি নাম লইয়া পুনরায় প্রকাশিত হইয়াছে। অমলের হাসি আত্মগোপন করিতে পারে নাই তাই রমলা বলিল—হাসছেন যে!

অমল আর একটু হাসিয়া বলিল—চমৎকার, চমৎকার হয়েছে!

—ঠাট্টা করবেন না।

—ঠাট্টা! বলেন কি, আপনার মধ্যে যে প্রতিভা রয়েছে তাকে উপেক্ষা ক'রবেন না, বা অকারণ বিনয়ে ও আত্ম-নির্ভরতার অভাবে তার অনাদর ক'রবেন না। অবশ্য আমি কাপালিক, তবুও ব'লতে পারি যে কাপালিকের অন্তরকে এ কবিতা দোল দিয়েছে—

রমলা এই উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় খুসী হইয়াছিল সন্দেহ নাই। সে বলিল—কবিদের মধ্যে কিপ্‌লিংকে আমার বড্ড ভাল লাগে, তার যথেষ্ট প্রভাব আমার মাঝে রয়েছে; তাই এ সব কবিতা ঠিক সাধারণ পাঠকের জন্যে নয় তারা বোঝে না। আপনার মধ্যে অন্ততঃ পাঠক হিসাবে যথেষ্ট অসাধারণত্ব রয়েছে—আপনার মত সমালোচক আমার যথেষ্ট উপকার ক'রবে।

—হ্যাঁ সাধ্যমত উপকার ক'রতে সর্ব্বদাই প্রস্তুত কিন্তু যে কিপ্‌লিংএর প্রভাব আপনার মাঝে রয়েছে তার অভাব ঘটলে আপনি যে নিরুপায় হ'য়ে পড়বেন—মানে প্রভাবটা কাটিয়ে উঠ্‌লে কবিতা যদি এমন সুন্দর আর না থাকে?

—প্রথম প্রথম তরুণ লেখক লেখিকার মধ্যে কারও না কারও প্রভাব দেখা যাবেই, অতএব ও ব্যঙ্গ আপনি না ক'রলেও পারতেন।

অমল গম্ভীর হইয়া বলিল—আমাকে একেবারেই ভুল বুঝেছেন মিস্ মিত্র, ব্যঙ্গ নয় ওটা স্তুতি—বড় ভাবকে আয়ত্ত ক'রতে হ'লে জগতের ভাবরাজ্যের সঙ্গে পরিচয় অত্যাবশ্যক।

রমলা বলিল—ঠিক তাই।

—আপনার মারফতে সেই ভাবরাজ্যের অস্পষ্ট আলোক লাভ ক'রেছি বলে আমি আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাক্‌বো।

রমলা স্মিতহাস্যে বলিল—থাক্, আপনার বিনয় বৈষ্ণব-বিনয়ের মত শোনাচ্ছে! আচ্ছা উঠি, খোকা রাগ ক'রছে—কাল আলোচনা হবে, কেমন?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া মাদকতাপূর্ণ একটা চাহনি হানিয়া বলিল—আপনার হাসি সর্ব্বদাই দ্ব্যর্থক—ভেবে পাই না, ওটা ব্যঙ্গ না কি?

— বিধাতা আমাকে যথেষ্ট কার্পণ্য ক'রেছেন সেটা আজ বুঝেছি।

তিন

কয়েকদিন পরের কথা—

অমল লাইব্রেরীতে পড়িতেছিল—কেবল বই খুলিয়া বসিয়া থাকাই নয়, সত্যই পড়িতেছিল। অপর্ণার জন্য মন তার এখন আর প্রতীক্ষাচঞ্চল হয় না। সে জানে অপর্ণা সকলের সম্মুখে তাহাকে না চিনিবার ভান করিলেও অন্তরীক্ষে সে তাহাকেই ঘনিষ্ঠভাবে চায় এবং সভ্যতার ও আভিজাত্যের মুখোস ত্যাগ করিয়া অসঙ্কোচেই কথাবার্ত্তা

বলে। নিজেকে লুকাইবার এবং নিজেকে বিচ্ছিন্ন ও আগ্রহহীন করিয়া রাখিবার সচেষ্ট যত্ন এখন আর নাই।

সেদিন শুক্রবার। সন্ধ্যা হইতে দেরী নাই—লাইব্রেরী কক্ষের উন্মুক্ত জানালা দিয়া অদূরের মেঘ দেখা যায়। অপর্ণা চলিয়া যাইতেছিল, যাইবার সময়ে অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে যেন ডাকিয়াই গেল।

অমলও বাহির হইয়া আসিল। লিফ্‌টের গোড়ায় দাঁড়াইয়া অপর্ণা বোধ হয় তাহারই অপেক্ষা করিতেছে। অমল বলিল—নমস্কার, আজ এত তাড়াতাড়ি উঠ্‌লেন যে।

—আপনি পড়ুন, যতক্ষণ ইচ্ছা। আমার আর ধৈর্য্য নেই। কিন্তু আপনি যে পিছু পিছু উঠে এলেন।

—আপনি ডাক্‌লেন বলে!

—আমি ডেকেছি?

—ডাকেন নি, তাহ'লে?

—আপনি বুঝলেন কি ক'রে?

আপনি যে ভাবে চেয়ে এলেন তাতেই মনে হ'ল আমাকে ডাক্‌ছেন, অবশ্য সেটা ভুলও হ'তে পারে। অসম্ভব নয়—

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া প্রশান্ত দৃষ্টিতে অমলের মুখখানা দেখিয়া লইয়া বলিল—না ভুল করেন নি—নীরব ভাষাও তাহ'লে মানুষে বুঝতে পারে, কেমন? বুঝলাম আপনি নীরব-ভাষাবিদ্‌।

—আপনিও ত নীরব-বচনবিদ্‌ তাহ'লে।

অপর্ণা বিনা ভূমিকাতেই বলিল—কাল, অর্থাৎ শনিবার সন্ধ্যায় আমাদের বাড়ীতেই ক্লাবের মিটিং হবে, আপনাকে সেই দিনই উপস্থিত চাই। অতএব আজ টাকা দু'টো দিন ত, আপনার নাম তুলে রাখবো, ওই মিটিংএই আপনাকে সকলের সঙ্গে পরিচয় ক'রে দেব, কেমন?

—ধন্যবাদ। অমল দ্বিধা করিতেছি... কি? এতে ... আমার দুইটি টাকা ও সামান্য কয়েক আনা পয়সা আছে— হইবে, কে জানে। অমল যন্ত্রচালিতের মত টাকা দুইটি তু... বাড়... হাতে দিয়া বলিল—পুনরায় ধন্যবাদ জানাই যে জীবনে আপনাদের স... পরিচয়ের মহার্ঘ সুযোগ আপনি দিয়েছেন, নইলে জীবনের একটা দিক খালি থেকে যেত?

—কেন? অকস্মাৎ পূর্ণ হয়ে উঠ্‌ল কিসে?

—আপনাদের মত মহিলাদের বন্ধুত্বে?

—কেবলমাত্র এই!

—আর কি?

—আরও কত সম্ভাবনা থাক্‌তে পারে, সে কল্পনাও কি ক'রতে পারেন না ছাই।

অপর্ণা চলিয়া যাইতেছিল, অমল ডাকিয়া বলিল—একটা বড় ভুল ক'রেছেন, আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা ত জানাননি, পৌঁছব কি ক'রে?

অপর্ণা ব্রীড়াভঙ্গিসহকারে একটু বিলোল কটাক্ষে চাহিয়া বলিল—ডেজি নামটা আবিষ্কার ক'রলেন, আর ঠিকানাটা সংগ্রহ ক'রতে পারেন নি? আপনার ভবিষ্যৎ খুব উজ্জ্বল নয়—

—আপনি আলোক দান ক'রলে উজ্জ্বল হ'তে পারে, বিনালোকে উজ্জ্বল হওয়াই ত অসম্ভব ভাগ্য।

অপর্ণা বলিল—বিধাতা আর যেদিকেই আপনাকে বঞ্চিত করুন, অন্ততঃ ভাষায় বঞ্চিত করেন নি। আচ্ছা নমস্কার—আসি। কাল যাওয়া চাই—ঠিক সাতটায়। ভয় নেই আধ্যাত্মিকতত্ত্ব আলোচনা হবে না—

অপর্ণা চলনছন্দে অঞ্চল আন্দোলিত করিয়া অনবদ্য সুন্দর একটা

বলে। নিজেকে লুকাইবার্ও দেহকে গতি দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। করিয়া রাখিবার সূক্ষ্ম পাড়, পাদক্ষেপ চঞ্চল নিবিড়, নিতম্বের নীচে ঘন-সেমিজের ভাঁজ একসঙ্গে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে—অমল মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিতে অপসৃয়মান দেহটির সৌন্দর্য্যকে সুরাপাত্রের মত নিঃশেষে পান করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল—আজ কয়েকদিন সে ত রঙীন শাড়ী পরিয়া আসে না, আটপৌরে মিলের শাড়ী পরিয়া আসে—কেন? কয়েকদিন আগের একটা কথা মনে পড়িয়া সে ব্যথিত হইল। হয়ত তাহার ব্যঙ্গেই সে আহত হইয়াছে।

অমল অত্যন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া একটু উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল—মিস্ রায়।

অপর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আবার কি হ'ল? ঠিকানা ভুলে গেলেন বুঝি?

—না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে ক'রবেন না? বলুন, মনে ক'রবেন না।

অপর্ণা বলিল—কি কথা? আচ্ছা, ক'রবো না বলুন—

—আজ কয়েকদিন আপনি সাধারণ শাড়ী পরে আসেন কেন? রঙীন শাড়ী পরেন না কেন?

—রঙীন শাড়ী আমাকে মানায় না তাই। অপর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহা যে একান্তই কষ্ট-প্রকাশিত তাহা বুঝিতে অমলের দেরী হইল না। অপর্ণা একটু ব্যথিত ভাবেই মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

—যে বলেছে, সে হয় মিথ্যা কথা ব'লেছে না হয় ঠাট্টা করেছে।

অপর্ণা প্রশান্ত আঁখি মেলিয়া বলিল—আপনিই ত বলেছেন।

—না, আপনি ভুল বুঝেছেন। সে নীল শাড়ীর পটভূমিতে আজও আগ্রহে আপনাকে দেখতে চাই।

আমার

সিয়া বলিল—না পরলে ক্ষতি কি? এতে বি

কুচ্ছিৎ

—না ...নুরোধ, আপনাকে সামনের হপ্তায় সেই শাড়ী খানা পরতেই

অপর্ণা বা... আপনার অনুরোধের এত মূল্য আপনি দেন কেন

উত্তরের সময় ন... নিজের ব্যবহার, অতি নগ্ন প্রশ্ন ও অন... করিয়া দেখিল যেন একটু অশোভন অ... কিন্তু মনে মনে সে এই অসংযমে... না, বরং মনে মনে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারি... হইল।

শনিবার বৈকালে হিসাব করিয়া অমল দেখিল, পাঁচ আনার পয়সা আছে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে যাওয়া ও ফার্ষ্ট ক্লাসে ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু মাসের শেষের কয়েক দিন বিড়ির কি উপায় করিবে তাহা বুঝিয়া পাইল না। ধার করাটা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কিন্তু আজকার প্রলোভন তাহার অদম্য হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই সে কাপড় জামা পরিয়া ফেলিল। বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অমল যখন সভাস্থলে উপস্থিত হইল তখন একজন মহিলা উদ্বোধন সংগীত গাহিতেছেন। মহিলাটির মুখখানা পরিচিত, পোষ্ট-গ্রাজুয়েটেরই ছাত্রী। সভাকক্ষের বাহিরে বারান্দায় অপর্ণার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। অপর্ণা অমলের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ এমনি দেরী ক'রতে আছে? সকলে অপেক্ষা ক'রছে, একটু সকালে বেরুতে পারেন নি।

অমল হাসিয়া বলিল—ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হয়নি ত? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই—শেষোক্ত অজুহাতটি একেবারেই মিথ্যা।

বলে। নিজেকে লুকাইবারও দেহকে গতি দিয়া চলিয়া যাইতেছিল। করিয়া রাখিবার সরু পাড়, পাদক্ষেপ চঞ্চল নিবিড়, নিতম্বের নীচে ঘন-সেদিড়ার ভাঁজ একসঙ্গে স্পন্দিত হইয়া উঠিতেছে—অমল মুগ্ধ বিস্মিত দৃষ্টিকে অপসৃয়মান দেহটির সৌন্দর্য্যকে সুরাপাত্রের মত নিঃশেষে পান করিতেছিল। অকস্মাৎ তাহার মনে পড়িল—আজ কয়েকদিন সে ত রঙীন শাড়ী পরিয়া আসে না, আটপৌরে মিলের শাড়ী পরিয়া আসে—কেন? কয়েকদিন আগের একটা কথা মনে পড়িয়া সে ব্যথিত হইল। হয়ত তাহার ব্যঙ্গেই সে আহত হইয়াছে।

অমল অত্যন্ত দ্রুতপদে অগ্রসর হইয়া একটু উচ্চকণ্ঠেই ডাকিল—মিস্ রায়।

অপর্ণা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আবার কি হ'ল? ঠিকানা ভুলে গেলেন বুঝি?

—না। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, কিছু মনে ক'রবেন না? বলুন, মনে ক'রবেন না।

অপর্ণা বলিল—কি কথা? আচ্ছা, ক'রবো না বলুন—

—আজ কয়েকদিন আপনি সাধারণ শাড়ী পরে আসেন কেন? রঙীন শাড়ী পরেন না কেন?

—রঙীন শাড়ী আমাকে মানায় না তাই। অপর্ণা হাসিবার চেষ্টা করিল কিন্তু তাহা যে একান্তই কষ্ট-প্রকাশিত তাহা বুঝিতে অমলের দেরী হইল না। অপর্ণা একটু ব্যথিত ভাবেই মাটির দিকে চাহিয়া রহিল।

—যে বলেছে, সে হয় মিথ্যা কথা ব'লেছে না হয় ঠাট্টা করেছে।

অপর্ণা প্রশান্ত আঁখি মেলিয়া বলিল—আপনিই ত বলেছেন।

—না, আপনি ভুল বুঝেছেন। সে নীল শাড়ীর পটভূমিতে আজও আগ্রহে আপনাকে দেখতে চাই।

—অপর্ণা হাসিয়া বলিল—না পরলে ক্ষতি কি? এতে বি… কুচ্ছিৎ দেখায়?

—না, তবে আমার অনুরোধ, আপনাকে সামনের হপ্তায় সেই শাড়ী খানা পরতেই হবে।

অপর্ণা বলিল—তাই হবে, কিন্তু আপনার অনুরোধের এত মূল্য আপনি দেন কেন?

উত্তরের সময় না দিয়াই অপর্ণা চলিয়া গেল। অমল নিজের ব্যবহার, অতি নগ্ন প্রশ্ন ও অনুরোধের কথা মনে মনে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিল যেন একটু অশোভন আগ্রহ ও ব্যাকুলতা প্রকাশিত হইয়াছে কিন্তু মনে মনে সে এই অসংযমের জন্য অনুশোচনা করিল না, বরং মনে মনে নিজেকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছে বলিয়া খুসীই হইল।

শনিবার বৈকালে হিসাব করিয়া অমল দেখিল, পাঁচ আনার পয়সা আছে। সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে যাওয়া ও ফার্ষ্ট ক্লাসে ফিরিয়া আসা যায়, কিন্তু মাসের শেষের কয়েক দিন বিড়ির কি উপায় করিবে তাহা বুঝিয়া পাইল না। ধার করাটা তাহার স্বভাব-বিরুদ্ধ কিন্তু আজকার প্রলোভন তাহার অদম্য হইয়া উঠিয়াছে, ভবিষ্যৎ চিন্তা না করিয়াই সে কাপড় জামা পরিয়া ফেলিল। বাড়ী খুঁজিয়া বাহির করিতে একটু বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। অমল যখন সভাস্থলে উপস্থিত হইল তখন একজন মহিলা উদ্বোধন সংগীত গাহিতেছেন। মহিলাটির মুখখানা পরিচিত, পোষ্ট-গ্রাজুয়েটেরই ছাত্রী। সভাকক্ষের বাহিরে বারান্দায় অপর্ণার সহিত তাহার দেখা হইয়া গেল। অপর্ণা অমলের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিল—ছিঃ ছিঃ এমনি দেরী ক'রতে আছে? সকলে অপেক্ষা ক'রছে, একটু সকালে বেরুতে পারেন নি।

অমল হাসিয়া বলিল—ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ হয়নি ত? ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই—শেষোক্ত অজুহাতটি একেবারেই মিথ্যা।

বলে। ...শ্বোধন সঙ্গীত থামিয়া গেল। অপর্ণা অমলকে লইয়া সভাগৃহে ...শ করিয়া সভাস্থ সভ্যগণকে সম্বোধন করিয়া বলিল—ইনি আমাদের নতুন সভ্য, অমল বন্দ্যোপাধ্যায়, আমাদের সহপাঠী, গেজেটে আমার ওপরে যে নামটি ছিল সেটা ওঁর। ইনি সংহতির 'প্রেম' কবিতার কবি, আর—

অমলের দিকে ফিরিয়া বলিল—এঁদের সকলকে পরিচয় করিয়ে দি—ইনি ইলা সেন, ইনি ডলি মিত্র। অমল চাহিয়া রহিল মাত্র এবং ধারাবাহিক ভাবে নমস্কার করিয়া যাইতে লাগিল। অপর্ণা কতকগুলি একালের কতকগুলি সেকালের নাম মুখস্থ নামতার মত বলিয়া গেল। পরিশেষে সকলকে বিস্মৃত করিয়া হঠাৎ বলিল—নতুন সভ্যকে প্রথমদিনে কিছু ব'লতে হয়, এই আমাদের ক্লাবের আইন। অতএব অমলবাবু যা হয় বলুন—

অমল মাথা চুলকাইয়া, ক্ষণিক বিভ্রান্তের মত সমবেত পুরুষ ও মহিলাগণের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আগে জান্‌লে আমি কখনই এ ক্লাবের সভ্য হ'তে রাজি হতাম না—

সকলে বিস্মিত হইয়া ফিরিয়া চাহিল।

—যাঁরা নিরপরাধ ভদ্রলোককে ডেকে এনে, সভাস্থলে দাঁড় করিয়ে দিয়ে বক্তৃতা দিতে অনুরোধ ক'রবার মত হত্যাকাণ্ডে লিপ্ত থাকতে পারেন তাঁরা জগতে অমানুষিক নিষ্ঠুর ও গর্হিত কাজও ক'রতে পারেন এই আমার বিশ্বাস। বর্ত্তমানে অবাধ্য পা' দুটো যে রকম ভাবে বিকম্পিত হ'চ্ছে তাতে অদূর ভবিষ্যতে হৃৎপিণ্ডে এ কম্পন সংক্রামিত হ'তে পারে বলে আমি শঙ্কিত হচ্ছি এবং এর বেশী কিছু ব'লতে হ'লে হত্যাকাণ্ডের সম্ভাবনা এত বেড়ে যাবে যে শেষে সেটা অনিবার্য্যই হ'য়ে উঠ্‌বে।

কাহারও দিকে লক্ষ্য না করিয়া এবং কোনও রূপ ভদ্রতার

অপেক্ষা না করিয়া অমল ঝুপ্ করিয়া বসিয়া পড়িল। সভাগৃহে
বন্দোবস্ত ভারতীয় রীতি অনুসারে—পুরু একটা গালিচা পাতা,
পর ইতস্ততঃ বালিশ বিক্ষিপ্ত, মাঝখানে পান ও সিগারেটের
রহিয়াছে।

অমল যেখানে বসিয়া পড়িয়াছে, তাহার পাশেই যে মেয়েটি বসিয়া ছিল সে হাসিতে হাসিতে প্রায় অমলের গায়ের উপর আসিয়া পড়িল। সভাস্থ সকলেই তখন হাসিতে হাসিতে প্রায় বিবশ। অকস্মাৎ এই মহিলাটি, অর্থাৎ ডলি মিত্র অমলকে বলিল—পান খান ত? এই নিন—পানের পাত্র সে আগাইয়া দিল—

অমল পুনরায় বলিল—এ শুষ্ককণ্ঠ কি পানের রসে ভিজবে, এখন প্রয়োজন ষ্টিমুলেণ্ট—

সভায় অকারণেই পুনরায় হাসির রোল পড়িয়া গেল।

সেক্রেটারী অপর্ণা তাহার খাতা দেখিয়া পড়িয়া গেল—আজকার কার্য্যসূচী, ডলি মিত্রের কবিতা, প্রশান্ত মজুমদারের 'কাব্যে ইয়েট্‌স্', অমলা বসুর 'টমাস হার্ডি কল্পিত গ্রাম' ইত্যাদি। খাতা নামাইয়া বলিল—এখন সভাপতি নির্ব্বাচন ক'রে সভার কাজ আরম্ভ হ'তে পারে।

ডলি মিত্র প্রস্তাব করিল অমলেরই নাম, কয়েকজন সমস্বরে সমর্থন করিলেন। অপর্ণা স্মিতহাস্যে সগর্ব্বে অমলকে সম্বর্দ্ধনা করিয়া বলিল—আসুন, সভার কাজ পরিচালনা করুন।

অমল আগাইয়া বসিয়া বলিল—নার্ভ্‌ষ্ট্রেণে যদি আমি মারা যাই তাহ'লে আমি কিন্তু দায়ী হ'ব না।

সভায় পুনরায় একটা হাসির রোল উঠিল। হাসি থামিয়া আসিলে অমল বলিল—কবিতা আবৃত্তি ডলি মিত্র।

ডলি মিত্র স্বরচিত কবিতা আবৃত্তি করিয়া গেলেন। সভা চলিতে লাগিল।

বলে। [illegible]লের পাশেই অপর্ণা বসিয়া ছিল। অমল হঠাৎ চাহিয়া দেখে [illegible] তাহারই মুখের দিকে চাহিয়া আছে। চোখাচোখি হইতেই [illegible] হাসিয়া সে মাথা নীচু করিল। অমল বুঝিল না কেন, কিন্তু অপর্ণার এই চাহনি ও হাসির মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন একটা সগর্ব্ব সহানুভূতি ও কৃতকার্য্যতার আত্মতৃপ্তি ছিল তাহা সে বুঝিয়াছিল—সকলে একবাক্যে তাহাকে সভাপতি নির্ব্বাচন করায় অপর্ণার আনন্দ হইয়া থাকিবে, যেহেতু সে তাহারই বন্ধু। অমল নিম্ন কণ্ঠে ডাকিল কিন্তু অপর্ণা শুনিল না— অপর্ণার শুভ্র আঙুল কয়টি ক্লাবের খাতার উপর বিক্ষিপ্ত কয়েকটি চাঁপার কলির মত পড়িয়া আছে। অমলের ইচ্ছা করিতেছিল ওই কয়েকটিকে সে নিজের হাতের মধ্যে সংগোপনে টানিয়া লয়। কি যেন ভাবিয়া অকস্মাৎ সে তাহারই একটিকে আকর্ষণ করিয়া বলিল—খাতাখানা আপনি নিলে আমি সভার কার্য্য পরিচালনা করি কেমন ক'রে—জানেন আমি সভাপতি!

অপর্ণা হাসিয়া খাতাখানি তাহার সামনে খুলিয়া ধরিল—আঙুলটিকে মৃদু আকর্ষণে মুক্ত করিয়া লইল।

সভান্তে জলযোগ ও জলযোগান্তে সকলে প্রস্থান করিবার উদ্দেশ্যে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। অপর্ণা তাহাদিগকে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সদর দরজা পর্য্যন্ত যাইতেছিল, অমলও দলের পিছনে পিছনে চলিতেছিল। একে একে সকলে প্রস্থান করিতেছিলেন; পরিশেষে অমল বলিল—আসি তাহ'লে মিস্ রায়।

অপর্ণা বলিল—না, আসুন, আপনাকে এখন যেতে হবে না।

অমল বলিল—কেন? আরও কিছু খাওয়াবেন না কি?

—আপনি ত আচ্ছা পেটুক, আসুন—

অমল পুনরায় আসিয়া অপর্ণার পড়িবার ঘরে একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িল। অপর্ণার ভাই বোন পিতা মাতা সকলের সঙ্গেই পরিচয় হইল।

অপর্ণার মা বলিলেন—মাঝে মাঝে এস বাবা, শুনি তোমরা একসঙ্গে পড়াশুনো কর।

অপর্ণার পিতা ইঞ্জিনিয়ার, তিনি পরিহাস করিলেন—অমল যত শুনলাম তুমি কবি, মানুষ কবিতা লেখে কেমন ক'রে ব'লতে পারো? গরমিল শব্দ ছাড়া ত আমি খুঁজে পাই নে—

অমল বলিল—কবি আমি কোন দিনই নয়, মিস্ রায় অত্যন্ত বাড়িয়ে বলেন—

তিনি পুনরায় পরিহাস করিলেন—কমিয়ে বলার চেয়ে বাড়িয়ে বলাই ত ভাল, তোমার লাভ। হ্যাঁ আজকাল শুনছি এক রকম কবিতা উঠেছে হাল ফ্যাসানের তাকে গাব্য বলে—অর্থাৎ গদ্য কবিতা, তা কিছু কিছু দেখাতে পারো, একবার চেষ্টা ক'রে দেখতাম—

অমল জবাব দিল না। অপর্ণার পিতা খুব জব্দ করিয়াছেন এমনি ভাবে হো হো করিয়া হাসিয়া প্রস্থান করিলেন। আরও কিছু আলাপ আলোচনার পর অপর্ণা ব্যতীত সকলেই প্রস্থান করিলেন। অপর্ণা মুখ টিপিয়া বলিল—আপনাকে congratulate করি, আপনার বক্তৃতা চমৎকার হ'য়েছে।

অমল প্রশ্ন করিল—পরিহাস।

—মোটেই নয়, আপনার বক্তৃতা কতখানি উপভোগ্য হ'য়েছে তা' ত বুঝলেনই, প্রথম দিনেই সভাপতি—

—কিন্তু, অমনি ক'রে মানুষকে বেকুব ক'রবার এত লোভ কেন আপনার?

—সে কি!

—অমনি ক'রে হঠাৎ বক্তৃতা দিতে বলা যে কত বড় নিষ্ঠুর কাজ—

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—ও তাই! যা হোক্, মায়ের নিমন্ত্রণ রক্ষা ক'রতে কবে আস্‌ছেন?

বলে। যেদিন ব'ল্‌বেন। একটা কথা আপনাকে জিজ্ঞাসা ক'রবো, যদি ক্ষি উত্তর দেন তবে জিজ্ঞাসা করি—

—আমি মিথ্যাবাদী এ অপবাদ আপনি প্রথম দিলেন—

—মিথ্যা ভাষণ ও সত্য গোপন করা ত এক নয়। যা জিজ্ঞাসা ক'রব তার উত্তর মানুষ সাধারণতঃ সরল ভাবে দেয় না—

—কিন্তু আমি বল্‌ছি, সারল্যের অভাব আমার মধ্যে নেই—

অমল একটু থামিয়া অপর্ণাকে ভাল করিয়া দেখিয়া লইয়া বলিল—এত ছেলে থাক্‌তে আপনি আমার সঙ্গেই বা আলাপ ক'রলেন কেন এবং আমাকেই বা ক্লাবের সভ্য হওয়ার সম্মান দিলেন কেন ?

—এই কথা! এর আবার একটা গোপন কি আছে ? আপনিই বা এত মেয়ে থাক্‌তে আমার শাড়ীপরা নিয়ে অভিযোগ করেন কেন ?

—সেটা আলাপের পূর্ব্বে নয় পরে—খানিকটা পরিচয় তথা ঘনিষ্ঠতার পরে।

অপর্ণা একটু চিন্তা করিয়া বলিল– আপনি যেমন ক'রে জান্‌লেন আমার নাম ডেজি, তেমনি ক'রে আমিও জানলাম আপনার নাম অমল। চেহারাটা দেখে ভাবলুম, অত্যন্ত গোবেচারা, ভাবলুম নেহাৎ গোবেচারী লোক নিয়ে তামাসা করা উপভোগ্য হবে—তাই আলাপ ক'রলাম কিন্তু শেষে দেখি একেবারে কালসর্প, মুখে ক্ষুরধার—

—কালসর্প ?

—হ্যাঁ শুনুন, আর একটা কথা ভেবেছিলাম সেটা হ'চ্ছে এই যে, আপনার কোন বিষয়েই কোন আগ্রহ নেই দেখে সমবেদনা বোধ ক'রেছিলাম—আমাদের সঙ্গে আলাপ ক'রবার কোন কৌতূহল আপনার নেই কেন, এইটে জানবার কৌতূহলও হ'য়েছিল—

—এখন কৌতূহল নিবৃত্ত হ'য়েছে আশা করি।

— না, আপনি বল্‌লে নিবৃত্ত হ'তে পারে।

—যদি সত্যি কথা ব'লতে হয় তবে স্বীকার করতেই হবে। ভয়টা ঠিক বাঘের ভয়ের মত নয়, অন্য জাতীয়। আমার যা ধারণা অনেক আধুনিক মেয়েই মনে করেন যে তাদের প্রেমে পড়বার জন্যে সব লোকই আকুল ও উদ্বিগ্ন হ'য়ে রয়েছে, তাদের সংগে আলাপ ক'রতে গেলে তারা যা ভাববে তা আপনিও বুঝতে পারেন, কাজেই সেধে গিয়ে এ অসম্মানকে ডেকে আনি কেন?

—আমাকেও কি ওই জাতীয় ভাবেন?

—কোন কারণ নেই, পরন্তু এও ভাবি না যে যেহেতু আপনি আমার সংগে আগে আলাপ ক'রেছেন সেই হেতুই আপনি আমার প্রেমে পড়েছেন।

অপর্ণা হাসিয়া একটু ব্রীড়া ভংগি সহকারে বলিল—তাও হ'তে পারে ত?

—কোন কারণ নেই, আপনারা I. C. S. স্বামীর স্বপ্ন দেখেন, মনে মনে আমাদের মত নিরীহ পথচারীকে মোটর চাপা দেন, আপনাদের এ দৈন্য কল্পনাতীত।

—কেন? আপনারাও ত I. C. S. হ'তে পারেন, তা ছাড়া ঘনিষ্ঠতায় স্বপ্নটা ত ক'মে আসতে পারে—

—পারে একথা অস্বীকার করি না, তবে সাধারণতঃ স্বপ্নটা কমে না। বিশেষতঃ আমার মত একটি বর্ব্বরের প্রেমে আপনি পড়তে পারেন, আপনার মাঝে এ দৈন্য আমি কল্পনা ক'রতে বাধা পাই।

অপর্ণা বলিল—আপনার বিনয় কিন্তু আত্মপ্রবঞ্চনায় পর্য্যবসিত হ'তে চলেছে।

—কেন আপনার কি সে রকম মনে হয়?

অপর্ণা অশোভন ভাবে হি হি করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—রোগের লক্ষণ সে রকম প্রকাশ পায় নি—যাক্ আর একটু চা খাবেন কি?

বলে।

এতখানি অভদ্রতা আশা করিনি, কিছু খাওয়াবেন বলেই ত কি
য়ে নিয়ে এলেন; এখন এ জিজ্ঞাসা করাটা সম্মানিত অতিথির
ত অবজ্ঞা প্রদর্শন।

—বাবা, এতখানি সম্মান-জ্ঞান আপনার আছে? একটু বিনয় কি ভাল দেখাতো না—চা ও চুরুট দু'টোকে কমাতে হবে।

—আপনার অনুরোধ।

—হ্যাঁ আমার অনুরোধ।

—আপনার অনুরোধের এত মূল্য আপনি কেন দেন?

অপর্ণা পর্দ্দার আড়ালে যাইয়া সম্ভবতঃ চায়ের আদেশ দিয়া ফিরিয়া আসিল। একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—আপনি ত ভারি প্রতিহিংসা-পরায়ণ—ওই কথাটা আমি বলেছিলাম বলে তা ফিরিয়ে না দিয়ে আর পারলেন না। তবে আর আপনার প্রেমে পড়া হ'ল না—

—আহা-হা, কেন?

—এই রকম প্রতিশোধ যদি নিতে থাকেন তবে ভয় ক'রবে না?

অমল হাসিয়া বলিল—এত ভয় যার সে আর প্রেমে পড়বে কেমন ক'রে? কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া সে চুপ করিল।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল। অহেতুক ভাবে চোখ দু'টিকে বিস্ফারিত করিয়া, দক্ষ অভিনেত্রীর মত ন্যাকামীর সুরে বলিল—আপনি অভিনেতাও তাহ'লে—

চা আসিল। অপর্ণার ছোটবোন চা দিয়া গেল। চা'র বাটিতে একটা চুমুক দিয়া অমল বলিল—চা তুমি তৈরী করেছ? করুণা?

—হ্যাঁ।

—বেশ চা হ'য়েছে। ভবিষ্যতেও তুমিই চা দিও, তোমার দিদি যা চা তৈরী করেন?

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল- আমার তৈরী চা আবার কবে খেলেন?

অমল সংক্ষেপে বলিল—খেয়েছি। হ্যাঁ করুণা, তোমার দিদি আমার নিন্দে করেন না?

করুণা জবাব দিল—হ্যাঁ।

—কি বলেন?

—আপনি নাকি মানুষকে বড় কটু কথা বলেন।

অপর্ণা বলিল—কবে বলেছি?

—ওই সেদিন তুমি বল্‌লে, উনি বড্ডো উচিত কথা বলেন।

—কটুকথা মানে উচিত কথা?

অমল বলিল—হ্যাঁ, অভিধানে পাবেন না, তবে মনের অভিধানে ওটার ওই মানে হয়।

অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—আপনি যখন আমার নিন্দে করেন তখন আর কি? চলেই যাই—

অপর্ণা বলিল—রাগ ক'রে—

—হ্যাঁ। আসি নমস্কার। করুণা, নমস্কার।

করুণা ফিরিয়া নমস্কার করিল, অমল হাসিতে হাসিতে সিঁড়ি বহিয়া নামিয়া আসিল।

—

অমলের দারিদ্র্য-অভিশপ্ত জীবনযুদ্ধেরত সুদীর্ঘ বাইশটি বৎসরের মধ্যে এমনি মহার্ঘ স্মরণীয় দিন একটিও যায় নাই। যাহা জানিবার জন্য, দেখিবার জন্য একটা প্রবল আগ্রহ ছিল আজ তাহাই সে পাইয়াছে—এমনি করিয়া তাহার জীবন যে কল্পনাময়ী, স্বপ্নাচ্ছন্ন নারী মূর্ত্তি ধরিয়া সাক্ষাতে আসিয়া দাঁড়াইবে—এমনি করিয়া মাদকতা দিয়া মোহ দিয়া তাহার জীবনকে রোমাঞ্চিত করিয়া দিবে তাহা সে ভাবিতে পারে নাই। ট্রামে উঠিবার পর হইতে নিদ্রিত হইবার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত একটা অপ্রাপ্ত, অনির্দ্দিষ্ট অস্বচ্ছ সুখাশার মেদুর পদ্মগন্ধে তাহার অন্তর সুবাসিত হইয়া

রহিল। মনে মনে নানাভাবে অপর্ণাকে সাজাইয়া সে দেখিল—মনে হয়, জীবনের মাঝে এই নারীর পরিচয় অতি আকস্মিক কিন্তু সে যেন মনের অপরিহার্য্য সঙ্গী হইয়া উঠিয়াছে। উন্মুখ যৌবনের প্রথম দিনে সে যে মানসীমূর্ত্তিকে কল্পনা দিয়া, বাসনা দিয়া, মনের সংগোপনে স্থাপিত করিয়াছিল সে যেন আজ মর্ত্ত্যে আসিয়া ধরা দিয়াছে—কিন্তু সে জানে না তাহার অজ্ঞাতে মনের অগোচরে সে অপর্ণার কত ত্রুটি, কত অক্ষমতাকে এই পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতার মাঝে ক্ষমা করিয়া লইয়াছে। নিজের মনকে সে যুক্তি দ্বারা, সহানুভূতি দ্বারা, বাসনার দ্বারা প্রতারিত করিয়াছে, তাহা না হইলে অপর্ণাকে সে এমনি করিয়া আপনার করিয়া ফেলিতে পারিত না, তাহা না হইলে জগতে কোন বাস্তব প্রাণীকেই ভালবাসা সম্ভব হইত না।

এতদিন সমস্ত সপ্তাহ ধরিয়া রবিবারের অপেক্ষা করাই তার স্বভাব ছিল, কিন্তু অমল আজ সবিস্ময়ে দেখিল যে সে সোমবারের প্রতীক্ষা করিতে আরম্ভ করিয়াছে। মনে মনে সে ভাবিল, ক্ষতি কি। এমনি করিয়া যদি স্বপ্নাবেশে জীবনের গুরুভার দিনগুলি চলিয়া যায় তবে সেই ত পরম লাভ।

সোমবারে কলেজে যাইবার সময় সে মণিব্যাগটিকে খুলিয়া দেখিল তাহা একেবারেই শূন্যোদর। সেটাকে বিছানার নীচে গুঁজিয়া রাখিয়া হিসাব করিল, মাস শেষ হইতে তিন দিন বাকী, কলেজে চা না খাইয়াই কাটাইয়া দেওয়া যাইবে, আর বিড়ির বন্দোবস্ত যেমন করিয়াই হোক হইয়া যাইবে—দোকানটা ত পরিচিত, অবশ্যই বাকী দিবে—

কলেজের সদর দরজায় সামনাসামনি রাস্তা পার হইবার সময়ে সে দেখিল—অপর্ণা ট্রাম হইতে নামিতেছে—চিনিতে বিলম্ব হইল না, সেই নীল শাড়ীখানিই সে পরিয়া আসিয়াছে। অমল গেটের নিকটে

দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছিল, অপর্ণা নিকটবর্ত্তী হইতেই বলিল-ধন্যবাদ।

অপর্ণা না থামিয়া চলিতে চলিতে বলিল—কারণ ?

—আমার অনুরোধ রক্ষা করেছেন—মানে মূল্য দিয়েছেন দেখে।

—ও—শাড়ীর কথা। খুব ভাল দেখাচ্ছে—না ?

—দেখাচ্ছে কিনা জানিনা, আমি দেখছি।

—চোখ খারাপ হয়নি ত!

—ভগবানের কৃপায় এমনি খারাপই চিরদিন থাক্।

অপর্ণা লিফ্‌টে উঠিয়া চলিয়া গেল। অমল মৃদু-পাদক্ষেপে সিঁড়ি অতিক্রম করিয়া চলিল।

চার

সন্ধ্যায় লাইব্রেরী হইতে ফিরিবার পথে অপর্ণা হঠাৎ প্রশ্ন করিল—আজ আপনি চা খেয়েছেন ?

—না। আপনি জান্‌লেন কি ক'রে ?

—বেশ, একবারও লাইব্রেরী থেকে বেরুলেন না।

অমল ঠাট্টা করিল—আপনি তাহ'লে লাইব্রেরীতে যান পড়তে নয়।

—না, আপনার দিকে হাঁ করে চেয়ে থাক্‌তে। কিন্তু চা খেলেন না কেন ?

—মণিব্যাগ ভুলে রেখে এসেছি—তাই। এক্ষুনি গিয়ে খেলেই ।

অপর্ণা কি যেন ভাবিয়া বলিল—চলুন, ইউনিভারসিটি রেস্টুরেন্টে —আপত্তি আছে ?

রহিল।

জীন

—আপনি মেয়েমানুষ হ'য়ে যদি যেতে পারেন, দশজনের কটাক্ষ ও সমালোচনাকে উপেক্ষা ক'রে, তবে আমি অকৃত্রিম পুরুষমানুষ অবশ্যই পারবো।

অপর্ণা ব্যঙ্গ করিল—পৌরুষের অভাব আছে একথা বলা যায় না। চলুন—

চলিতে চলিতে হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া অপর্ণা বলিল—হ্যাঁ, ভাল কথা এমনি ভুল হওয়া রোগে ধ'রেছে কতদিনে—

অমল আঘাত করিবার প্রলোভন ত্যাগ করিতে পারিল না। অপর্ণাকে আঘাত করিয়া সে যেন তৃপ্তি পায়, আঘাতে আঘাতে অপর্ণার খোলোস যেন খুলিয়া পড়িয়া তাহাকে আরও আপনার, আরও সুন্দর করিয়া তুলে। অমল তাই বলিল—আপনার সঙ্গে পরিচয় হওয়ার পর থেকে ব'ললে আপনি হয়ত খুসী হ'বেন, কিন্তু দুর্ভাগ্য, এটা আমার চিরকালের দুরারোগ্য ব্যারাম।

—আমি খুসী হব কেন ?

—জানেন না, এটাও একটা স্বতঃসিদ্ধ যে, মেয়েদের পিছনে ল্যাংবোটের মত কতকগুলি হতাশ প্রেমিক চলা-ফেরা ক'রলে তারা খুসী হয়।

অপর্ণা জবাব দিল না।

ক্ষণিক অপেক্ষা করিয়া বলিল—কেবল হতাশ প্রেমিক ?

—হ্যাঁ।

—একজনও সফলকাম প্রেমিক থাক্‌বে না।

—না।

অপর্ণা মৃদু হাসিয়া কৃত্রিম ক্ষোভের সহিত বলিল—আমার কি হবে তাহ'লে ?

অমল উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া বলিল—বিয়ে হবে না।

—হবে না ! কেন ?

অমল জানে অপর্ণা অভিমান করিলে বড় ভাল লাগে, সে তাই বলিল —প্রেমিককুলকে হতাশ ক'রতে ক'রতে এমন একটা বয়সে এসে পেঁছিবেন যখন আর বিয়ে করা যায় না।

অপর্ণা আবার ক্ষণিক অগ্রসর হইয়া বলিল—বড়ই শোচনীয় অবস্থা !

—না হয়, ডাইভ বোমরু বিমানের মত রোজ ডাইভ ক'রবেন কোন ব্যক্তি ঠিক ক'রে, ডাইভ ক'রবেন বটে কিন্তু আর উঠতে পারবেন না—মাটিতে পড়ে একেবারে ছাতু !

—সর্ব্বনাশ। তবে এক কাজ করা যাক্, একটি দিন ঠিক ক'রে মনে মনে সংকল্প করি, ঘুম থেকে উঠে, যাকে দেখ্‌বো তাকেই বিয়ে ক'রে ফেল্‌বো।

অমল বলিল—এটা ভাল প্রস্তাব, অমনি ডেস্‌পারেট না হ'লে লোক বিয়ে ক'রতে পারে না। হ্যাঁ, তবে দিনটা কবে ঠিক ক'রলেন সেট জানাবেন।

—কেন প্রত্যূষে হাজির হবেন নাকি ?

—মন্দ কি ? লক্ষ্যভেদ ক'রেছিল ফাল্গুনী, কিন্তু সভায় উপস্থিত ছিল ত অনেকেই—তাদের মতই ভগ্ন-হৃদয়ে না হয় ফিরে আস্‌বো—

অপর্ণা তীব্র কটাক্ষ হানিয়া একটু তিরস্কারের সুরেই বলিল—আপনার মুখেও লাগাম নেই, মনেরও না। ল্যাংবোটের মত ঘুরতে সখ করে ? ছিঃ—

অপর্ণা রেস্টুরেণ্টে প্রবেশ করিয়া বলিল—আলডুস্ হাক্সলির কি কি বই পড়েছেন ?

—সামান্যই। অমল জানিত এ প্রসঙ্গ অবান্তর এবং দোকানের লোকগুলির চোখে কুয়াশার পর্দ্দা টানিয়া দিবার একটা কৌশল মাত্র। অমল অপর্ণার দুর্ব্বলতা দেখিয়া হাসিল।

মেসে ফিরিবার পথে অপর্ণার একটি কথা অমলের মনে কাঁটার মত বিঁধিতেছিল। যে ইঙ্গিতের উত্তরে সে বলিয়াছিল তাহার মনের লাগাম নাই সে ইঙ্গিত তাহার ইচ্ছাকৃত এবং অপর্ণারও বুঝিবার মত বয়স ও শিক্ষা আছে, কাজেই ভুল বুঝিবার সম্ভাবনা তাহার নাই এবং এই উত্তরটুকুও তাহার সুচিন্তিত অভিমত নিশ্চয়ই। অমল ভাবে, তাহার পারিবারিক ও আর্থিক অবস্থার কথা জানিলে হয়ত অপর্ণা এইরূপ উক্তি করিতে পারিত, কিন্তু সে ত তাহা জানিবার কোন সুযোগ দেয় নাই। যদি কেবলমাত্র বন্ধুত্বই হয়, কেবলমাত্র জীবন পথে একটু 'ভাল লাগা' হয় তবে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না—সে নিজেই হয়ত অসংযমের সহিত কল্পনা করিয়া গিয়াছে. অকারণে হঠকারিতার সহিত অযৌক্তিক ভাবে স্বপ্নরাজ্য সৃষ্টি করিয়াছে, তাই তাহার পক্ষে স্বর্গচ্যুতির আশঙ্কা ও বেদনা পাওয়া স্বাভাবিক কিন্তু অপর্ণার হয়ত নয়। এত বুঝিয়াও, এত ভাবিয়াও অমল নিজেকে অপর্ণার দুর্নিবার আকর্ষণমুক্ত করিতে পারে না, অক্টোপাশের বাহুর মত অপর্ণা তাহাকে যেন নিম্মর্ম অনিবার্য্য ভাবে পরিবেষ্টিত করিয়া ফেলিয়াছে—আকর্ষণে তাহাকে ক্রমাগতই সমুদ্রের তলদেশে টানিয়া লইয়া যাইতেছে। সে প্রাণপণ চেষ্টায়ও নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছে না ; অসহায় একান্ত নিরুপায় হইয়া অনির্দ্দিষ্ট অদৃশ্য সাহায্যের জন্য নিমজ্জমান লোকের মত বার বার বাহু প্রসারিত করিতেছে—

মেসে ফিরিয়া অমল বাড়ীর পত্র পাইল—মা লিখিয়াছেন ব কলমে। মা লিখিতে জানেন না কিন্তু পড়িতে পারেন, কাজেই পাড়ার বৌ ঝি ধরিয়া কোন সময়ে হয়ত পত্র লিখিয়া লন। এতদিন আঁকাবাঁকা অক্ষরে যত পত্র আসিয়াছে তাহার চেহারা অমলের পরিচিত, কিন্তু আজকার পত্রখানির লেখা নতুন ছাঁদের। লেখা মেয়েলী, আঁকাবাঁকাও বটে

কিন্তু তাহার মধ্যে বেশ একটা শ্রী আছে এবং বানান ভুল নাই—লেখাটা তাহার একেবারেই অপরিচিত। লেখা যাহাই হোক, পত্রের সংবাদটি শুভ নয়—মা'য়ের আজ কয়েকদিন জ্বর, কিন্তু আজ অর্থাৎ পত্র লিখিবার দিন ভালই আছেন এবং পরিশেষে চিন্তা করিতে নিষেধ করিয়াছেন। অমল মাতৃআজ্ঞা পালন করিতে পারিল না, বিশেষ রকম চিন্তাই—করিতে হইল। বাড়ীতে থাকেন মা একা, বার্দ্ধক্য ও দীর্ঘ বৈধব্যে শরীর জীর্ণ—রোগশয্যায় কে তাঁহাকে জল দিতেছে, পথ্য দিতেছে—কে চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতেছে! পাড়ার লোক যদি দয়া করিয়া তৃষ্ণায় জল দিয়া থাকে তবে পাইয়াছেন নইলে নয়। পল্লীগ্রামেও পরোপকারের মহৎ প্রবৃত্তি দুষ্প্রাপ্য। অমল ভাবিয়া দেখিল একবার যাওয়া প্রয়োজন—

কিন্তু হাতে একটি পয়সা নাই, মাহিনা পাইতে এখনও দুইদিন—অবশ্য ১লা পাইলে ১লাই যাওয়া যাইতে পারে। করিবার কিছুই নাই—মাহিনার জন্য অপেক্ষা করিতেই হইবে।

অমল ছাত্রবাড়ীতে যাইয়া ছাত্রকে কাজ দিয়া আনমনে ভাবিয়া যাইতেছিল, মায়ের অসহায় অবস্থার কথা—তাহাদের বাড়ীর জীর্ণ দালানের সেই স্বল্পান্ধকার ঘরে মা থাকেন, অযত্নে দালানের গায়ে পাকুড়-গাছ জন্মিয়াছে। তাহাদের উঠান দিয়াই পাড়ার বধূগণ ঘাটে যান, হয়ত যাওয়া আসার পথে মায়ের কুশল প্রশ্ন করিয়া সময় থাকিলে এক ঘটি তৃষ্ণার জল আনিয়া দেন। এই পর্য্যন্ত—হাতে যদি অর্থ না থাকে তবে ঔষধ হয়ত এক ফোঁটাও জোটে নাই, জুটিলেও হাতুড়ে বৈদ্যের ঔষধ কাজে লাগে নাই—

কাহার কণ্ঠস্বরে চমকাইয়া অমল ফিরিয়া চাহিল। বর্ত্তমানের মাঝে মনটাকে টানিয়া দেখে—রমলা দরজার কবাট ধরিয়া কি যেন বলিতেছে—কি বলিয়াছে সে তাহা বুঝিল না! সে একটু উদাস দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া বলিল—কি ব'ল্‌লেন?

—আপনার কি হ'য়েছে ? বড় বিমনা মনে হচ্ছে—

সংক্ষেপে অমল বলিল—হ্যাঁ মনটা ভাল নাই ।

রমলা কাছে আসিয়া ছাত্রের পাশের চেয়ারে বসিয়া বলিল—কি হ'য়েছে, কোন্ দুঃসংবাদ পেয়েছেন ?

—হ্যাঁ, আজ চিঠি পেলাম মায়ের অসুখ ।

—মায়ের অসুখ ? তা চ'লে গেলে ত পারতেন ! আবার পড়াতে এসেছেন কেন ?

প্রকৃতিস্থ থাকিলে অমল হয়ত স্বীকার করিত না কিন্তু হঠাৎ চিন্তা না করিয়াই সে বলিল—যাবো ত' কিন্তু এটা মাসের শেষ—

রমলা বলিল—কেন, আপনি একটু খবর দিলেই পারতেন, বাবার কাছ থেকে আপনার মাইনে চেয়ে রাখতুম। কাল সকালে রেখে দেব, আপনি এলেই পাবেন ।

—সকাল নয়, রাত্রে পেলেই চলবে। আমি রাতের গাড়ীতেই যাবো ।

অমল আশ্চর্য্য হইয়া গেল—এই স্পর্দ্ধিতা মেয়েটির নির্ল্লজ্জ আত্মাভিমানের অন্তরালে কেমন করিয়া কোথায় এই সহানুভূতি লুকাইয়া ছিল ! সে তাহার দারিদ্র্যের প্রতি একটা নিম্মর্ম শ্লেষই প্রত্যাশা করিয়াছিল কিন্তু আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিতভাবে সমবেদনা পাইয়া সে রমলার মুখের পানে কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল ।

রমলা পুনরায় প্রশ্ন করিল—বাড়ীতে আর কে আছেন ?

—আর কেউ নেই । প্রতিবেশীরা আছেন ?

—আপনার দেশ কোথা ?

—যশোর জেলায় কোন গণ্ডগ্রামে, ম্যাপে সে নাম পাওয়া সম্ভব নয় ।

রমলা একটু চিন্তা করিয়া বলিল—বাড়ীতে যখন আর কেউ নেই

তখন ত যাওয়াই দরকার—এ রকম অবস্থায় আপনার বিয়ে করা উচিত ছিল।

অমল হাসিল। একটা জবাব দিবে স্থির করিয়াছিল কিন্তু কিছু বলিবার পূর্ব্বেই রমলা পুনরায় বলিল—জানি ব'ল্‌বেন, টাকা নেই চাকুরী নেই ইত্যাদি, আপনাদের কথা শুন্‌লে রাগ হয়, যেন মেয়েরা খেয়েই তাদের ফতুর ক'রে দিলে—

অমল জবাব দিল—তা নয় খেয়ে তারা ফতুর করে না, তবে আমাদের মনের মত ক'রে তাদের রাখতে পারি না বলেই কষ্ট হয়, ভাবি দারিদ্র্যের মাঝে টেনে দুঃখ দেওয়ার চেয়ে না আনাই ভাল—

রমলা বলিল—মেয়েরা কি কষ্ট করতে জানে না। তাদের কি ইচ্ছে করে না স্বামীকে সেবা ক'রে সুখী ক'রতে, তারাও কি চায় না স্বামী সুখী হোক্—

অমল আরও বিস্মিত হইয়া গিয়াছিল—রমলার মুখে এমন কথা সে প্রত্যাশা করে নাই। তাহার সমস্ত মুখোস যেন সহসা খুলিয়া পড়িয়াছে! কিন্তু কেন? অমল বিস্মিত, মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া ছিল।

রমলা চোখ দুইটিকে দূরে অন্ধকার গলির মাঝে ন্যস্ত করিয়া বলিল—কি দেখ্‌ছেন।

অমল বলিল—আপনার মুখে এ কথা প্রত্যাশা করি নি!

—কেন?

—যার মধ্যে ইয়েটস্‌, কিপলিংএর ভাবধারা বিচরণ ক'রছে তার মাঝে ক্ষুদ্র গৃহ, গৃহস্থালীর কথা, তার তুচ্ছতম সুখ দুঃখের কথা কি বেমানান বলে মনে হয় না! আপনার অন্তর হবে গগনবিহারী, তা কেন পৃথিবীর বাস্তবতায় নেমে আস্‌বে!

রমলা অকারণে ক্ষণিক হাসিয়া লইয়া বলিল—মানুষ মানুষই, তারা

ব্যোমযান নয়। খোকার উদ্দেশ্যে সে বলিল—যা আজকে উনি পড়াতে পারবেন না, ওঁর মন যে রকম তাতে ও হবে না।

খোকা ছুটি পাইয়া মহোল্লাসে হৃষ্টচিত্তে পুঁথিপত্র গোছাইয়া রওনা দিল।

রমলা ক্ষণিক পরে প্রশ্ন করিল—আচ্ছা অমলবাবু, একটা প্রশ্নের উত্তর দেবেন—সত্যি কথা বলতে হবে—

—নিশ্চয়ই ব'লবো। সত্যভাষণের সৎসাহস আমার আছে—

রমলা অত্যন্ত অকস্মাৎ এবং বিনা আড়ম্বরে বিনা দ্বিধায় প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, আপনি কি রকম মেয়ে বিয়ে ক'রবেন? বাজে কথা বাদ দিয়ে ব'লবেন, এনখও ভাবিনি, ভেবে বলবো, ওসব কথা চলবে না—

অমল বলিল—এ সব বিষয়ে আমার চিন্তা করা আছে। আমি বিয়ে করবো একটা গেঁয়ো মেয়েকে যে ঠিকানা লিখলে পত্র যথা স্থানে পেঁছিবে না। সাত চড়ে কথা কইবে না, যথেচ্ছ অত্যাচার করা চলবে অথচ প্রতিবাদ শুনতে হবে না, এমনি একটা মেয়েকে—

রমলা আসিয়া বলিল—সত্য কথা আপনি বলেন নি নিশ্চয়ই।

যথার্থই সত্য কথা বলেছি। মিথ্যা বলার কোন হেতু নেই।

রমলা প্রতিবাদ করিল—হেতু অবশ্যই আছে।

—কি?

—যেহেতু আমি শিক্ষিত, শিক্ষিত না হ'লেও শিক্ষাভিমানী, সেই হেতুই এই কথাটা বলেছেন, সম্ভবতঃ আমার গর্ব্ব বা স্পর্দ্ধাকে আঘাত ক'রবার উদ্দেশ্যেই—

অমল আরও আশ্চর্য্য হইল—রমলার কথার মধ্যে এতখানি তীক্ষ্নদৃষ্টি ও বুদ্ধির পরিচয় সে কোন দিনই পায় নাই। সে রমলা অত্যন্ত নগ্নভাবে নিজের অন্তরের দৈন্য ও অক্ষমতাকে কথার ফাঁকে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, সে আজকে এমনি সরলভাবে নিজেকে প্রকাশ করিবে তাহা

সে আশা করে নাই। অমল বলিল—আপনাকে আঘাত ক'রে আমার লাভ? আপনার গর্ব্ব ও স্পর্দ্ধা থাকতে পারে কিন্তু তার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ নেই, কাজেই তাকেও আঘাত করা আমার এক্তারের বাইরে—

—তবে কেন? শিক্ষিত মেয়েদের উপর আপনার রাগ কেন?

—রাগ নেই, যথেষ্ট প্রলোভন আছে, আপনাদের মত মেয়েদের সঙ্গে আমার স্বল্প পরিচয়কে আমি যথেষ্ট গৌরবের বলে মনে করি; কিন্তু মোটর থাকা ভাল জানি তাই বলে মোটর কিনবার সখ থাকা আমাদের উচিত নয়। আর যাই হোক, আমি যে আপনাদের বাড়ীতে চাকুরী ক'রেই জীবিকা অর্জ্জন করি একথা আমি কখনও ভুলি না, কাজেই অতখানি আশা পোষণ করা সম্ভব নয়। যাদের আমরা কেবল ফুলের মত দেখতে চাই তাদের ধূলায় ফেল্‌তে স্বভাবতঃই মায়া করে—এ সম্বন্ধে এতগুলি কথা বলিয়া অমল নেহাৎ অপ্রস্তুতের মতই থামিয়া গেল।

রমলা কি যেন ক্ষণিক চিন্তা করিয়া বলিল—এই মাত্র! আর কারণ নেই?

—আর একটা কারণ এই যে, তারা দুঃখের সঙ্গে দারিদ্র্যের সঙ্গে ভালভাবেই পরিচিত, কাজেই আমার দারিদ্র্যকে ভয় করে তারা আমার প্রতি অপ্রসন্ন হবে না, আমার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ ক'রবে না।

—শিক্ষিত মেয়েরাও আপনার কাঁধে কেবল ভারই না হ'য়ে সংসারের সাহায্যও ত ক'রতে পারে।

—পারে না। কারণ আজকার জগতে তাদের মেয়েরাই শিক্ষিত, যাদের ছেলেদের পড়িয়েও মেয়েদের পড়াবার ক্ষমতা থাকে—এক কথায় যারা বড়লোক তাদের মেয়েরাই শিক্ষিত সুতরাং আমাদের সঙ্গে তাদের প্রভেদ আকাশ পাতাল—

রমলা বলিল—যাক্, কিছু মনে ক'রবেন না। আপনাকে এ সব

প্রশ্ন করলুম কেন জানেন ? লিখবার সময় মাঝে মাঝে মনস্তত্ত্বের দিকে নজর যায়, তাই আপনাদের মনের খবর না জান্‌লে লেখা সম্ভব নয় ? আপনাদের মনকে study করা একান্তই দরকার হ'য়ে পড়ে।

অমল বলিল—যা হোক্‌, আপনার লেখার যদি সহায়তা ক'রতে পারি তবে আনন্দিত হব ; কিন্তু আমার যতদূর ধারণা নিজের মনটাকে ভাল ক'রে দেখলেই পরের মনকে বোঝা যায়—সে পুরুষই হোক আর মেয়েই হোক।

অবান্তর আরও কিছু আলোচনার পরে অমল চলিয়া আসিল। রমলাকে সে নূতন করিয়া দেখিয়াছে তাহার নূতন পরিচয় পাইয়াছে —তাহার আভিজাত্য অহঙ্কারের অন্তরালে যে মন আছে তাহা ত আর সকলেরই মত, বৃথা মুখোসে সে কেবল নিজেকে প্রতারিত করে। যাহার সহিত নিষ্ঠুর অভিনয় করিয়া সে সংগোপনে হাসিত ও খেলার আমোদ পাইত আজ তাহার জন্যই সে সমবেদনা বোধ করিতে লাগিল। সভ্যতার মোহ ভারাক্রান্ত অন্তর তাহার সত্যই মুমূর্ষু ! তাহাকে ব্যঙ্গ করিয়া লাভ নাই, উদ্ধার করা প্রয়োজন।

পরদিন সকাল হইতে সমস্ত চিন্তা তাহার মন হইতে নির্ব্বাসিত হইয়াছিল কেবল একটিমাত্র চিন্তা শ্রাবণের মেঘের মত সমস্ত অন্তরাকাশ ছাইয়া দিল। অসুখ গুরুতর না হইলে মা কখনও তাহাকে অসুস্থ সংবাদ দেন নাই, কারণ তাঁহার স্বভাব সে জানে। সাধারণ জ্বর-জ্বারিকে তিনি অসুখ বা শয্যাগ্রহণের মত অবস্থা নয় বলিয়াই স্বীকার করেন না। বৃথা একটি দিন দেরী করিয়া সে হয়ত শেষ দেখাও করিতে পারিবে না— রমলা সকালেই টাকা দিতে চাহিয়াছিল, আনিলেই হইত। বৃথা আভিজাত্যের অভিমান লইয়া বসিয়া থাকিয়া সে হয়ত জীবনের মহার্ঘতম সুযোগকে হারাইবে।

যদি মা আর নাই উঠেন, তবে ত এ জগতে তাহার আর কোন আকর্ষণই থাকিবে না—এই পরিশ্রম, এই জীবনসংগ্রাম, এ সমস্তই ব্যর্থ হইয়া যাইবে। যদি বৈধব্যক্লিন্ন, দারিদ্র্য লাঞ্ছিত মাকে সে জীবনে কয়েক দিনের জন্যও খুসী না করিতে পারে, তবে বৃথা বিদ্যার্জ্জনের সমারোহে ও অর্থের আড়ম্বরে তাহার কি প্রয়োজন!

কলেজের গৃহে বসিয়া এই কথাই সে ভাবিয়া যাইতেছিল—শংকা ও ব্যর্থতাকে উত্তেজিত করিয়া দুঃসংবাদকে মনের ব্যাকুলতা দিয়া ফেনাইয়া চরম দুঃখের সৃষ্টি করিয়া মনে মনে সে কাল্পনিক দুর্ভাগ্যকে বিশ্বাস করিয়া ফেলিতেছিল। কি পীড়া হইয়াছে কিছুই সে শোনে নাই, মাঝে মাঝে কেবল সজল চোখ দু'টিকে পরিষ্কার করিতে বাহিরের পানে চাহিয়াছিল—

বাহির হইবার পথে অপর্ণা তাহাকে ডাকিয়া প্রশ্ন করিল—আপনার কি হ'য়েছে? আজ এত চুপচাপ কেন?

অমল বলিল—না এমন কিছু নয়।

অপর্ণা ব্যাকুলতার সহিত প্রশ্ন করিল—কি হ'য়েছে বলুন না।

—আমার মায়ের খুব অসুখ সংবাদ পেয়েছি, আজই দেশে যাবো—

অপর্ণা প্রশ্ন করিল—কি অসুখ—আজই যাবেন?

—হ্যাঁ—আপনার মায়ের আদেশ কবে পালন ক'রতে পারবো জানি না।

—সে পরে হবে—কখন যাচ্ছেন? গাড়ী কখন? আপনাদের দেশ কোথায়?

অমল ধারাবাহিক প্রশ্নগুলির ক্রমিক উত্তর দিয়া চুপ করিল। অপর্ণা পুনরায় বলিল—বাড়ীতে কে কে আছেন?

—মা একা।

—তবে, জমিদারী থেকে আপনার পড়ার খরচ সব পাঠান কে?

অমল হাসিয়া বলিল—চ'লে যায়। মা একা বলেই যাওয়া বিশেষ প্রয়োজন।

—নিশ্চয়ই, দেরী করা মোটেই সঙ্গত নয়। আর মাকে ওখানেই বা রাখেন কেন, এখানে এনে কাছে রাখলে উভয়েরই দুর্ভাবনা যেতো।

অমল সংক্ষেপে জবাব দিল—হুঁ।

অপর্ণা ব্যস্ততার সঙ্গে বলিল—যাক্, এসব আলোচনার সময় এ নয় কিন্তু আপনার মা কেমন থাকেন তা আমাকে একটু জানাবেন—আমিও হয়ত ভাববো—

অমল আনন্দোজ্জ্বল চোখ দুইটির কৃতজ্ঞতা-করুণ দৃষ্টি অপর্ণার মুখের উপর নির্ভয়ে ন্যস্ত করিয়া বলিল—আপনি অনুমতি ক'রলে অবশ্যই জানাবো, আর আমার দুঃখে যে সহানুভূতির প্রমাণ পেলাম আপনার কাছ থেকে—তার জন্যে মনে মনে গর্ব্ব বোধ করছি। আপনার উদারতাকে প্রশংসা করি।

অপর্ণা কৃত্রিম তিরস্কারের সুরে বলিল—এখন উদারতা হিসাব করার সময় আপনার না থাকাই উচিত ছিল। যান তাড়াতাড়ি ফল-টল কিনে তৈরী হ'য়ে নিন্—

অপর্ণা উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই চলিয়া গেল।

অমল ক্লান্ত পাদক্ষেপে চলিতে চলিতে ভাবিল—তার দীনা দুঃখিনী মাতার জন্যে আজ অপর্ণা যে ব্যাকুলতা প্রকাশ করিয়াছে তাহা সে না করিলেও ক্ষতি ছিল না, অশোভনও হইত না। তবুও এই আভিজাত্য, ওই শিক্ষার অভিমানের মাঝে তাহার জন্ম, তাহার মাতার জন্যে যে সহৃদয়তা সে দেখাইয়া গেল তাহা তাহার অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও উদারতার প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

অমল মনে মনে বিশ্বাস করিল—অপর্ণার মনেও দুর্ব্বলতা

দেখা দিয়াছে, তাহা না হইলে এই সমবেদনা স্বাভাবিক নয়—সে যে আজ বিমনা একথা ত আর কেহ লক্ষ্য করে নাই কিন্তু অপর্ণা তাহা লক্ষ্য করিতেছে—

······যদি কোনদিন এমন হয় যে অপর্ণা তাহার মায়েরই সেবায় নিযুক্ত হইল। তবে সেইদিন তাহার মাতাকে এমনি আগ্রহে, এমনি যত্নে সে সেবা করিতে পারিবে—এমনি করিয়া তাহার কুশল সংবাদের জন্য ব্যাকুল হইবে। আজ যেমন তাহার জন্যই মাতার প্রতি এই আগ্রহ—একদিন সে হয়ত তাহার মাকেই মা বলিয়া গ্রহণ করিতে পারিবে।

অমল আনন্দিত হইল—অপর্ণা সত্যই সুন্দর! তাহাকে না পাইলে দুঃখের কিছু নাই কিন্তু এই সুদুর্লভ সৌন্দর্য্যকে ভাল না বাসিয়া পারা যায় না। অন্তরের এই উদারতা, এই সমবেদনার আকর্ষণ-শক্তি অমোঘ—অমল তাই আজ একান্তই অসহায়।

পাঁচ

অমল ষ্টেশনে নামিবার কিছু পরেই সূর্য্যোদয় হইল। এখান হইতে চার মাইল দূরে—তিনটি মাঠ অতিক্রম করিয়া তবে তাহার বাড়ী। সোজা রাস্তা গিয়াছে, তিন মাইল—মাঠের ভিতর দিয়া একটু রাস্তা সংক্ষেপ করা যাইতে পারে।

সুটকেশটাকে হাতে ঝুলাইয়া সে রওনা দিল।

রাস্তার দু'ধারে গ্রাম, তাহাতে সবে জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে, রাস্তার উপর ক্ষুধার্ত্ত ঘুঘু ও শালিক খাদ্য অন্বেষণ করিয়া ফিরিতেছে। ঘাসের উপর রাত্রির সঞ্চিত শিশির তখনও শুকায় নাই—কৃষক গৃহের

বধূগণ উঠান ঝাঁট্‌ দিতে দিতে সলজ্জ কৌতূহলী দৃষ্টিতে অমলের পানে চাহিতেছে। অমল কোনদিকে না চাহিয়াই চলিয়াছে—

দুঃসংবাদকে মনে মনে সে বড় করিয়া অত্যন্ত ব্যস্ত বিমর্ষ হইয়া উঠিয়াছিল—যদি বাড়ী যাইয়া দেখে সমস্তই শেষ হইয়া গিয়াছে, তবে? অমল আর ভাবিতে পারে না, চোখ দুইটি ঝাপসা হইয়া যায়। পথ চলিতে চলিতে হোঁচট খায়।

রাস্তা ছাড়িয়া অমল মাঠের সোজা পথ ধরিল—গ্রামের সাম্‌নেই দেখা যায় আম বাগান। তাহার ফাঁকে তাহাদের পৈতৃক দালানের এক অংশ দেখা যায়। আম বাগানের পথের উপরে পা দিতেই তাহার বুক কাঁপিয়া উঠিল, যাইয়া কি দেখিবে কে জানে। স্বল্পান্ধকার ঘরে তাঁহার জীর্ণদেহের পঞ্জরে কি এখনও হৃদপিণ্ডটি ধুকধুক করিয়া চলিতেছে।

সদর উঠানে পা দিয়া অমল দেখিল, বৈশাখের কাঠফাটা রৌদ্রে উঠানের মাটি চৌচির হইয়া ফাটিয়া গিয়াছে। অমল শঙ্কিত হইল, এই বিদীর্ণ পাষাণ মৃত্তিকা ভবিষ্যতের কোন অমঙ্গল সূচিত করিতেছে কিনা তাহা কে বলিতে পারে!

দালানের সামনে একটি রক। ভিতরের উঠানে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, তাহার মা বালিশ হেলান দিয়া সেখানে অর্দ্ধশায়িত অবস্থায় রহিয়াছেন। রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া অমল ভাবিল, যাহা হউক মা বাঁচিয়া আছেন।

সুটকেশটাকে, ফেলিয়া, সে মায়ের শয্যা পার্শ্বে দাঁড়াইয়া প্রশ্ন করিল —কেমন আছ মা!

মাতা চমকাইয়া উঠিয়া বলিলেন—কি অমল, তুই চলে এলি যে!

—আস্‌বো না, কেমন আছ?

—ভালই, আজ ভাত খেতে বলেছে কিন্তু আজ ত একাদশী; কাল খাবো—এই দ্যাখ বাবা অসুখ হ'লে এই জন্যেই লিখি না।

—কে জল দেয়, পত্তি দেয় বল, না এসে পারি কেমন ক'রে ?

—আমার পত্তি আর অষুধ দিতে ভগবান আছেন, তোর ভাবনা কি ? রাত্রিতে ত ঘুম হয় নি এখন চা খাবি ত ?—দাঁড়া।

অমল মাতার দেহটিকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল—সে কি, তুমি উঠবে নাকি ?

—না, না। না উঠ্‌লে খাবি কি ক'রে ?

—সে কি! দশ বার দিন রোগের পর মানুষ উঠ্‌তে পারে নাকি! আমি তৈরী ক'রছি, তুমি ব'সো—

অমল কাপড় জামা ছাড়িয়া, প্যাকাটি দিয়া উনান ধরাইয়া একটি কড়ায় জল তুলিয়া চা তৈয়ারী করিতে লাগিয়া গেল। মা প্রশ্ন করিলেন —দুধ কোথায় ?

—দাঁড়াও জোগাড় করি। অমল বাটি চিনি চা প্রভৃতি গোছাইয়া লইয়া চাহিয়া দেখে কে একটি মেয়ে মায়ের পাশেই দাঁড়াইয়া আছে—কৈশোর পার হইয়া সবে যৌবনে পদার্পণ করিতে পা বাড়াইয়াছে—বৈশাখের নূতন পাতার মত সজীব সুন্দর। সমস্ত মুখে গ্রামের সরলতা, স্বাস্থ্যের লালিত্য। খুব উজ্জ্বল গৌরবর্ণ নহে, তবুও গৌর। বয়সের ধর্ম্মে, স্বাস্থ্যের প্রাচুর্য্যে বর্ণ কমনীয়, সুন্দর—সমস্ত দেহ নিটোল মর্ম্মর মূর্ত্তির মত মসৃণ, সুগঠিত। সপ্রতিভ সকৌতুক দৃষ্টিতে তাহার পানে একবার চাহিয়া মাতার আদেশ শুনিতে লাগিল। মা বলিলেন—একটু দুধ এনে দিতে পারিস্ অমলকে ?—গৌরী!

গৌরী চলিয়া গেল, অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাহার গমন ও চলন-ছন্দ দেখিতেছিল—অপর্ণার চলন আভিজাত্যপূর্ণ, এর চলিবার ভঙ্গী সাবলীল, চঞ্চল।

দুধের অপেক্ষা না রাখিয়াই অমল, তিক্ত চা একটু একটু পান করিতেছিল। গৌরী দুধ আনিয়া তাহার সামনে রাখিয়া চলিয়া গেল।

অমল দুধ মিশ্রিত চা লইয়া মায়ের নিকট আসিয়া বসিল—কৌতূহল হইয়াছিল, গ্রামের মেয়েকে সে চিনিল না ইহা কি সম্ভব !

গৌরী দরজার পাশে দাঁড়াইয়াছিল। মা বলিতেছিলেন—গৌরীকে চিনিস্ ? ওই মুখুজ্জে বাড়ীর ছোট্‌ঠাকুরপো, মহেশ, তার মেয়ে। পোষ্টাফিসে চাকুরী করতো কখনও ত বাড়ী আসে নি, এখন পেনসন নিয়ে বাড়ী এসে বসেছে—তার মেয়ে। ওরা ত এ গাঁয়ে আসে নি কখনও, চিন্‌বি কি ক'রে! ওই আমাকে বাঁচিয়েছে, পত্তি দেওয়া, জল দেওয়া সব করেছে, একটিবারও উঠ্‌তে দেয়নি। এই সকালে এসে বিছানা ক'রে এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। ভগবান ওকে পাঠিয়েছেন —ওর গুণ আর শোধ দিতে পারবো না—

অমল মনে মনে কৃতজ্ঞ হইল। তাহার নিরুপায় অসহায় রুগ্না মাতাকে যে এমনি অযাচিতভাবে সেবা যত্ন করিয়াছে তাহাকে মনে মনে অমল কৃতজ্ঞতাই জানাইল। তাহার দান ভুলিবার নহে—কিছু বলিবে ভাবিয়া দরজার পানে চাহিল কিন্তু পূর্ব্বে যে শাড়ীর আঁচলটা দেখা যাইতেছিল এখন আর তাহা দেখা যায় না। গৌরী হয়ত চলিয়া গিয়াছে—

মা প্রশ্ন করিলেন—তুই খাবি কোথায় ?

—কোথায় আবার খাব ? বাড়ীতে—আমি রেঁধে নেব যা হয়।

—তুই কি পারবি ? কোনদিন—

—কেন, সেবার তোমার অসুখের সময়ত রেঁধে খেয়েছি—তুমি ভেব না। এখন ঘরে কিছু আছে, না বাজার ক'রবো সেইটে দেখি। কিন্তু আজ কি তুমি কিছুই খাবে না, একটু মিছরির সরবৎ, কি—

—ছিঃ, ও কথা ব'লতে নেই। আজ যে একাদশী। কাল পত্তি ক'রবো, একদিনে কি হবে ?

অমল জানে কোন মতেই মাকে কিছু খাওয়ানো যাইবে না। বৃথা চেষ্টা না করিয়া সে ঘর দোর পরিষ্কার করিতে লাগিয়া গেল।

দুপুর বেলায় ক্লান্ত দেহেই সে মায়ের বোগ্নোয় করিয়া আলোচাল ও কিছু আলু বেগুন সিদ্ধ করিবার জন্য উঠাইয়া দিল। মা'কে সযত্নে সে ঘরে রাখিয়া আসিয়াছে, মা হয়ত একটু বিশ্রাম করিতেছেন। উনানের সামনে বসিয়া অমল নানা কথা ভাবিতেছিল—

অমল আপন মনেই হাসিল—এই তাহার গৃহ, এই তাহার সমাজ, এই জীর্ণ বাড়ীখানার সর্ব্বাঙ্গে দারিদ্র্যের অত্যাচার শত চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে, তাহার মাঝে ওই অপর্ণার উপস্থিতি ও স্থিতি কেবলমাত্র বেমানানই নয়, হাস্যকরও। অপর্ণা যদি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিয়াও আসে তবে ইহার মধ্যে তাহার স্থান কোথায়? আপনার অসংযত কল্পনা ও বিশৃঙ্খল লুব্ধ প্রকৃতির কথা ভাবিয়া সে আপন মনেই বার বার হাসিতেছিল।

কাঠের উনুন নিভিয়া ধোঁয়া উঠিতেছিল। অমল পুনরায় কিছু কাঠ ও কুটা দিয়া, বহু ফুঁ দিয়া ধরাইয়া দিল।

পাড়ার চক্রবর্ত্তী বাড়ীর খুড়ীমা ঝঙ্কার দিয়া অমলের মাতার উদ্দেশ্যে বলিলেন- দিদি, একবেলা কি আমি অমলের ভাত দিতে পারতুম না। অমল হাত পুড়িয়ে খাচ্ছে, সে কি?

মা যেন কি একটা জবাব দিলেন বোঝা গেল না। অমল বলিল—এতে আর কষ্ট কি খুড়ীমা!

—ওমা, পুরুষ ছেলে কি ওই পারে? আচ্ছা দাঁড়া, আমি তরকারি ডাল দিয়ে যাবো'খন।

খুড়ীমা ঘাটে চলিয়া গেলেন। অমল ভাত টিপিয়া দেখিল বেশ নরম হইয়াছে—অর্থাৎ সিদ্ধ হইয়াছে। অমল বেড়ী দিয়া বোগ্নো নামাইয়া ফেলিল কিন্তু সরা নাই; কিরূপে এই ভাত হইতে ফেন

নিষ্কাষিত করিতে পারা যায় তাহা সে বুঝিয়া উঠিতে পারিল না। হাঁড়িতে সে দু' একবার রাঁধিয়াছে তাহার ফেন নিষ্কাষণ পদ্ধতি সে জানিত, কিন্তু এই বোগ্‌নো হইতে কিরূপে ফেন নির্গত করা সম্ভব। ক্যাজামিয়াঁর বা রিকেটের ইংরাজি সাহিত্যের ইতিহাসে এ সমস্যার সমাধান নাই, নিউটনের ক্যালকুলাসেও নাই। অমল বেড়ীর সাহায্যে একবার এ কাত, আর একবার ও কাত করিয়া দেখিল কিন্তু উত্তপ্ত পাত্র হইতে হয় সবই পড়ে, না হয় কিছুই পড়ে না। অমল একটা সরা লইয়া আসিবে স্থির করিয়া উঠিতে যাইতেছে হঠাৎ দেখে গৌরী একটা খুঁটি হেলান দিয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছে—

অমল বিস্মিত লজ্জিত দৃষ্টিতে একটু চাহিয়া থাকিতেই গৌরী বলিল— আপনি পারবেন না, আমি মাড় গেলে দিচ্ছি।

অমল সাহায্য গ্রহণ করাকে সম্ভবতঃ অপৌরুষেয় মনে করিয়া বলিল —না, আমি পারবো, একটা সরা, না হয় বাটি নিয়ে আসি।

গৌরী প্রতিবাদ করিল—বাটি, সরা কিছুই লাগবে না। সরুন্—

মা প্রশ্ন করিলেন—কি হ'ল রে গৌরী।

গৌরী জানাইল যে সে ব্যবস্থা করিয়া দিবে। পাত্রের ভাত গুলির দিকে চাহিয়া একটু সকৌতুক হাসির সহিত বলিল- ভাত ত সিদ্ধই হয় নি।

অমল পুনরায় অপ্রস্তুত হইয়া বলিল—হ'য়েছে, টিপে দেখেছি—

গৌরী আর একবার হাসিয়া উঠিল—অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক এই হাসিটুকু অমলকে যেন এক মুহূর্ত্তে অপ্রস্তুত করিয়া দিল। অমল পুনরায় গাম্ভীর্য্য রক্ষা করিয়া বলিল—হাসছো যে!

—ভাত সিদ্ধ হয় নি।

—না, হয় নি, দেখলাম এত ক'রে।

—কিছুতেই সিদ্ধ হয়নি। কোন উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই

গৌরী একটা ভাত পরীক্ষা করিয়া বেড়ীর সাহায্যে বোগ্‌নোটা পুনরায় উনুনের উপর চাপাইয়া দিল। অমল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতেছিল, কেবলমাত্র উত্তপ্ত সফেন ভাতই নয়, গৌরীর কৌতুক-উজ্জ্বল কমনীয় সরল মুখখানি। গৌরী অমলের দিকে চাহিয়া বলিল—আপনার কাজ নয়, যান্‌ জেঠিমার কাছে।

অমল অত্যন্ত অপ্রতিভের মত এক পায়ে দুই পা মায়ের ঘরে ফিরিয়া আসিল। অপর্ণা ও রমলাকে সে কথার জালে জড়াইয়া তিরস্কার করিয়াছে, ব্যঙ্গ করিয়াছে কিন্তু কোনদিন এমনি করিয়া পরাজিত হয় নাই—দ্বিধায়, নিজের অক্ষমতায় এমনি অপ্রস্তুত সে কোনদিন হয় নাই অথচ এই ছোট্ট গ্রাম্য মেয়েটি তাহাকে এক নিমেষে অপদার্থ প্রমাণ করিয়া দিল। নিজের অক্ষমতাকে প্রত্যক্ষ করিয়াও মানুষ অনেক সময় ক্ষুণ্ণ হয় না, অমলও হইল না বরং মনে মনে এই চঞ্চল মেয়েটির সাবলীল ব্যবহারকে সে সাধুবাদ দিল।

অমলকে দেখিয়া মা বলিলেন—গৌরীই নামিয়ে দেবে, আমার জন্যে এতই ত ক'রেছে; একটু রেঁধে দেওয়া তাও সে পারবে। আর জন্মে নিশ্চয়ই ও আমার কেউ ছিল। নইলে এমনি ক'রে না ব'লতেই ও আমার জন্যে এত করবে কেন? কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখ দুইটি সজল হইয়া উঠিল, ক্ষণিক পরে বলিলেন—ওর বাবা ত দু'পয়সা ক'রেছে, আমরা গরীব, আমার ক'রে এ যত্নআত্তি ক'রতে ও আসবে কেন—ওর বাপ মাও কিছু বলে না, বরং দুবেলা খোঁজ নিতে পাঠায়।

অমল মনে মনে মাতার সাশ্রু-নেত্রের নিষ্প্রভ অভিব্যক্তির সঙ্গে সঙ্গে মনে মনে কৃতজ্ঞতা জানাইল—যদি কোন দিন সুযোগ আসে তবে সে ইহার প্রতিদান অবশ্যই দিবে।

কিছুক্ষণ পরে গৌরী আসিয়া জানাইল ভাত হইয়া গিয়াছে। অমল বাহির হইয়া দেখে—সমস্তই প্রস্তুত বেগুন ভাতে, আলু ভাতে মাখা,

এমন কি মুখ ধুইবার জল পর্য্যন্ত।
খুড়ীমা তরকারী ডাল দিয়া গিয়াছেন্মাই, গৌরীর উদ্দেশ্যে বলিল—এত কি
অমল এতখানি প্রত্যাশা করেমই ক'রতুম—
দরকার ছিল? এ সব কুটু মুচকি হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, নমুনা ত দেখলাম।
গৌরী আবার নুন মাখতে পারতুম না?

—আল নুনে পুড়তো। সবাই কি সব পারে! গৌরী পুনরায়
—ন

হাঁ এই হাসি ও ব্যঙ্গ গ্রামের একটি মেয়ের পক্ষে প্রগল্‌ভতা। সমালোচকের দৃষ্টি দিয়া দেখিলে একথা অস্বীকার করা যায় না কিন্তু এই মেয়েটির মুখে এই হাসি যেন প্রগল্‌ভতা নয়। হাসিলেই গালে টোল দেখা যায় তাই মনে হয় ও সর্ব্বদাই হাসিতেছে—অমল এই ব্যঙ্গ ও প্রগল্‌ভতাকে অন্ততঃ অশোভন মনে করিল না?

ক্ষুধার্ত্ত অমল যাহা খাইতেছিল তাহাই অতি সুস্বাদযুক্ত মনে হইতেছিল তবুও ওই মেয়েটিকে জব্দ করিবার জন্যেই বলিল—এ আলু ভাতে ত নুনে পুড়েছে।

—কখ্‌খনও নয়।

—নিশ্চয়ই—আমি খাচ্ছি আর তুমি বল্‌বে নুনে পোড়েনি! পুড়েছে—

—মিথ্যাকথা। ওটুকু আন্দাজ আমার আছে।

—মিথ্যাকথা!

—হুঁ। যতই বলেন, আপনার চেয়ে ভাল রাঁধতে পারি। কথাগুলি অতি দ্রুত উচ্চারণ করিয়া সে ততোধিক দ্রুতপায়ে দালানে গিয়া উঠিল। অমল তাহার গমন পথের দিকে চাহিয়া রহিল—নারীসুলভ মন্থর গতির ছন্দ আজও তাহার আয়ত্ত হয় নাই, কৈশোরের চঞ্চলতা অতিক্রান্ত-কৈশোরেও রহিয়া গিয়াছে।

আহারান্তে অমল ভাবিতেছিল—এঁটো থালা বাসন কি হইবে, সে উচ্ছিষ্ট কুড়াইতেছিল। ভাবিল এ কাজটি অবশ্যই তাহাকে করিতে হইবে, কিন্তু গৃহ হইতে ক্ষণীকণ্ঠে মাতা বলিলেন—ও রেখে যা অমল।

মা যেরূপভাবে শুইয়া আছেন তাহাতে অমলকে দেখা সম্ভব নয়, গৌরী নিশ্চয়ই তাহাকে বলিয়াছে। অমল তবুও বলিল—না পারবো মা, এ আমি খুব পারি—

গৌরী আবার আসিয়া বলিল—থাক্ হ'য়েছে। ওতে এঁটো লেগে থাক্‌বে যে!

অমলের মনে মনে রাগ হইয়াছিল, বার বার এই মেয়েটি তাহাকে অপদার্থ প্রমাণ করিবেই। অমল গম্ভীরভাবে বলিল—থাক্‌বে না।

থালা বাটি গোছাইয়া প্রস্তুত হইতেই গৌরী বোগ্‌নোটা দেখাইয়া বলিল—ওটার কি হবে।

অমল সদর্পে সেটাকেও থালার উপর উঠাইয়া লইল। গৌরী এবার একান্তই অশোভন ভাবে হাসিয়া বলিল—ওটা মাজতে তেঁতুল লাগে যে! তাই জানেন না তার—

—তেঁতুল আন্‌ছি।

—দু' হাতই ত এঁটো, তেঁতুল আন্‌বেন কি ক'রে! সব যে এঁটো হ'য়ে যাবে?

অমল পরাজিত হইয়া একান্ত হতাশার সুরে বলিল—তবে কি হবে!

গৌরী একটু হাসিতে অমলকে একেবারে পরাজিত করিয়া দিয়া সাজানো বাসন লইয়া ঘাটে চলিয়া গেল। অমল দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া চিন্তা করিয়া দেখিল—এই মেয়েটি যে বার বার তাহাকে অপ্রতিভ করিয়া দিয়াছে তবুও সে দুঃখিত হয় নাই কেন!

৮

মায়ের ঘরে বসিয়া অমল প্রশ্ন করিতেছিল—তুমি কাল কি দিয়ে ভাত খাবে ?

মা কিছুই বলেন না, বারবার কেবল বলেন—আমাদের আবার কি লাগ্‌বে। অবশেষে অমলের জিদে বলিলেন—বেতাগের ঝোল ও হিঞ্চে শাক ভাতে তিনি পছন্দ করেন।

অমল বেলা পড়িতেই দাও লইয়া বাহির হইয়া পড়িল—বেতাগ সংগ্রহ করা কঠিন হইল না কিন্তু পাঁচটি এঁদো পুকুর ঘুরিয়া কোনমতে কিছু হিঞ্চে শাক জোগাড় করিয়া হৃষ্ট মনেই বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বারান্দায় সেগুলিকে নামাইয়া রাখিয়া সে সগর্ব্বে ঘরে ঢুকিয়া বলিল—মা কাল আমি তোমায় রান্না ক'রে দেব। কেমন ?

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে, গৃহের মধ্যে অন্ধকার বেশ ঘনীভূত। সেই অন্ধকার হইতে গৌরী টিপ্পনী করিল—আজকার মত আ-সিদ্ধ ভাত ত ?

মা ব্যস্ততার সঙ্গে বলিলেন—ভাত কি সিদ্ধ হয়নি রে অমল।

—হুঁ হয়েছিল মা।

ম্যাচ জ্বালাইয়া লণ্ঠন ধরাইতে ধরাইতে গৌরী বলিল—না জেঠিমা, একেবারে কাঁচা চাল, আমি শেষে সিদ্ধ ক'রে দি। ফেন গাল্‌তে ত ভেবেই অস্থির—

মাতা তাহার রুগ্ন মুখে একটু হাসি ফুটাইয়া বলিলেন—ও কি রেঁধেছে যে পারবে—

গৌরী মুখ টিপিয়া বলিল—সে কথা স্বীকার ক'রলেই ত হয়।

অমল ছেলেমানুষের মত বলিয়া উঠিল—ও মেয়েলি কাজ কে না পারে !

—তাই ত ছিষ্টি এঁটো হচ্ছিল আর কি !

ঘরের কোণে অতীত সমৃদ্ধির সাক্ষী স্বরূপ একটি জীর্ণ টেবিল ছিল।

গৌরী তাহার উপর লণ্ঠনটা রাখিয়া দিল। অমল প্রশ্ন করিল—শোবো কোন খাটে মা ?

গৌরী আঙুল দিয়া দেখাইয়া বলিল—ওখানে।

ঘরের বিপরীত দিকে আর একটি খাট ছিল, তাহার উপর শয্যা রচনা করা হইয়া গিয়াছে। অমল দেখিয়া বিস্মিত হইল। মাতা প্রশ্ন করিলেন—রাত্রে কি খাবি ?

—ক্ষিধে নেই, কিছু খাবো না।

গৌরী চট্ করিয়া উত্তর দিল—রাঁধার ভয়ে জেঠিমা। মা বলেছে আমাদের বাড়ীত খেতে।

মা প্রশ্ন করিলেন—তোর মা জানে ?

—হ্যাঁ, অমি ব'ললুম দুপুরের কাহিনী, মা ব'ললে কেন খেতে বল্লি নি এখানে—

অমল 'কাহিনী' কথাটা ব্যবহারে একটু আশ্চর্য্য হইয়াছিল। সে গৌরীকে অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—এবার মার চিঠি কি তোমার লেখা ?

মা জবাব দিলেন—হ্যাঁ, ওই লিখেছে। অসুখের কথা লিখতে বারণ করলুম তা শুন্‌লে না।

—তুমি কতদূর পড়েছ ?

গৌরী একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—কতদূর আবার ?

মা বলিলেন—ইস্কুলেই ত পড়েছে, পাঁচ বছর, তার পর বাড়ীতে এসে পড়া বন্ধ হ'য়ে গেছে—কোন্ ক্লাস ত মা ?

— ক্লাস সেভেন। জেঠিমা রাত্রি হ'য়ে গেছে, যাই। রাত্রে ডাক্‌তে আস্‌বো ?

মা বলিলেন—না আমিই পাঠিয়ে দেব, আবার ডাক্‌তে লাগবে কেন ?

গৌরী চলিয়া গেল।

সন্ধ্যার পরে অমল মৃদু লণ্ঠনের আলোকে বসিয়া পত্র লিখিতে ছিল—অপর্ণা যখন মায়ের কুশল সংবাদ স্বেচ্ছায় জানিতে চাহিয়াছে তখন তাহাকে জানানই উচিত। অপর্ণা এ ব্যস্ততা না দেখাইলেও পারিত ; তাহার মায়ের মত কত দুঃস্থ দরিদ্র শীর্ণ রুগ্ন মাতা অসহায় অবস্থায় রোগ-শয্যায় কাটায় সে কথা ভাবিবার বা জানিবার অবসর ও ইচ্ছা তাহার না থাকাই সম্ভব। সে ধনী কন্যা, শিক্ষা-গর্ব্বে উদ্ধত ও সহানুভূতিহীন হইলেও অশোভন হইত না, কিন্তু তাহার সাহচর্য্যই তাহাকে এই সমবেদনা জানাইতে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে।

অত্যন্ত সাবধানতার সঙ্গে ভাষাকে যথেষ্ট সংযত রাখিয়া সে পত্র লিখিয়া ফেলিল। পরিশেষে কেবলমাত্র শুভেচ্ছা ও নমস্কার জানাইয়াই শেষ করিল।

মা প্রশ্ন করিলেন—কি করিস্—অমল ?

অমল বলিল—পত্র লিখ্‌ছি ওখানে বন্ধুবান্ধব সকলে তোমার অসুখের জন্য ব্যস্ত আছে, তাদের জানাচ্ছি।

মা ক্ষীণ হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—আমার জন্যে ? সম্ভবতঃ তিনি ভাবিয়া থাকিবেন—যে দিন অকস্মাৎ বৈধব্য তাঁহার আশা আকাঙ্ক্ষাকে নির্ম্মম ভাবে ধূলিসাৎ করিয়া দিয়াছিল সেইদিন হইতে অমল বড়-না-হওয়া পর্য্যন্ত কেহ তাঁহার জন্যে ব্যস্ততা প্রকাশ করে নাই, আজ যদি অমলের বন্ধুরা করিয়া থাকে তবে সে তাঁহার ভাগ্য। অমলের যদি বন্ধু জুটে তবে সেও ভাগ্য। মাতা প্রশ্ন করিলেন—যার কাছে পত্র লিখ্‌লি তার নাম কি ?

অমল মিথ্যা কথা বলিতে পারিল না। মিথ্যা কথা সে প্রয়োজন হইলে বলে, কিন্তু মায়ের সামনে বসিয়া মুখোমুখি মিথ্যা কথা বলা তাহার পক্ষে একান্তই অসম্ভব। সে বলিল—অপর্ণা রায়—

— মেয়ে ?

—হ্যাঁ, খুব বড় লোকের মেয়ে, আমার সঙ্গে পড়ে। সে নিজেই আলাপ ক'রলে, তাদের বাড়ীতে নিয়ে তার বাবা মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলে।

মা আর কোন প্রশ্ন করিলেন না। ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া মা বলিলেন—আমরা গরীব তা তিনি জানেন ?

'তিনি জানেন' কথাটা মায়ের মুখে শুনিয়া অমল ব্যথিত হইল—এই সমীহ বিশেষতঃ তাহার মায়ের মুখে অত্যন্ত পীড়াদায়ক মনে হইল—বার বার কাণের কাছে ওই কথা দুইটি প্রতিধ্বনিত হইয়া তাহাকে যেন বলিতে লাগিল—তোমার দারিদ্র্য ও অক্ষমতা তুমি ভুলিলেও আমি ভুলি নাই—

অমল বলিল—সম্ভবতঃ না।

মা বলিলেন—নিজের অবস্থার কথা গোপন করা পাপ। এবার যেয়ে সব বলবি—

অমল ব্যথিত চিত্তে ভাবিয়া চলিল—আজ যদি সে ভাল ভাবে পাশ করিয়া অন্ততঃ একটা প্রফেসারীও পায় তবে কি অপর্ণাকে লইয়া এই দৈন্যাহত মাকে লইয়া গৃহরচনা করা যায় না! অপর্ণা কি অন্তর হইতে ঐশ্বর্য্যকে বেশী ভালবাসিবে ? অপর্ণার মধ্যে এই মানসিক সংকীর্ণতা সে ভাবিতে পারিল না।

ছয়

অমল সন্ধ্যার কিছু পরে গৌরীদের বাড়ীতে উপস্থিত হইল।

গৌরীর বাবা ও মা তাহাকে পরম আদরে অভ্যর্থনা করিলেন। মহেশবাবু তাহাকে বারান্দায় মাদুরের উপর বসাইয়া বলিলেন—

ইংরিজিতে এম্-এ পড়ছো—কেমন পড়াশুনো হচ্ছে? ফার্ণ্ট ক্লাশ পাবে মনে হয়? আর পাবেই বা না কেন—ফার্ণ্ট ক্লাশ অনার্স'ই ত পেয়েছিলে।

অমল বলিল—এখন পর্য্যন্ত যেরূপ পড়াশুনা হ'য়েছে তা'তে আশা কম।

—কেন, কেন বাবা?

—টিউসনি ক'রতে হয়—টাকাটা ত নিজেই জোগাড় করি, কাজেই সুস্থ মনে পড়া অনেক সময় হয় না।

—যাক্, সামনের বছরটা যেমন ক'রে হোক্ পড়াশুনা ক'রবে, যাতে ফার্ষ্ট ক্লাস হয়।

অমল মহেশকাকার কথার মধ্যে আন্তরিকতার পরিচয় পাইয়াছিল সন্দেহ নাই, তবুও তাহার মনে হইল এই সমাদর ও সহানুভূতি নিরর্থক নাও হইতে পারে। গৌরীর সংগে তাহার বিবাহের সামাজিক কোন বাধাই নাই। তাহার জীবনের প্রতি, কৃতকার্য্যতার প্রতি হয়ত সেই কারণেই তাঁহার এই আগ্রহ।

কাকীমা রান্নাঘরের বারান্দা হইতে খাইতে ডাকিলেন। গৌরীই পরিবেশন করিবে। কাকীমা অমলকে বসাইয়া প্রশ্ন করিলেন—অমল, আমার কথা তোমার মনে আছে?

অমল কাকীমাকে দেখিয়াছে বটে, কিন্তু কিছুই মনে পড়ে না। সে ঘাড় নাড়াইয়া সম্মতি জানাইল মাত্র। তিনি পুনরায় বলিলেন—ছোটকালে তোমার আড়ি ছিল আমার সংগে। তোমাদের পুকুরে জল আনতে যেতাম, তোমার বয়স হয়ত তখন বড়জোর ছয়। তোমাদের বড় ঘর ও পশ্চিমের পোতার ঘরের মাঝে এতটুকু একটু রাস্তা ছিল, তুমি দুই ঘরের দাওয়ায় দুই পা দিয়ে দাঁড়িয়ে রোজই ব'লতে—ছুঁয়ে দি ছুঁয়ে দি। মাঝে মাঝে ছুঁয়ে দিয়ে পালিয়ে যেতে—

অমল হাসিয়া উঠিল—গৌরীও মায়ের পাশে দাঁড়াইয়া হাসিল। গৌরী অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে অমলের প্রতি একবার চাহিল।

—শুনলাম, দুপুরে নিজে রেঁধেছ, কি দরকার ছিল? ও গৌরীও নেহাত অবুঝ, আমাকে একটু জানাল না। কাল তুমি এখানেই খাবে, গৌরী তোমার মায়ের রান্না ক'রে দেবে।

অমল খাইতে খাইতে মুখ তুলিয়া বলিল—মার সংগেই আমি খাবো।

কাকীমা একটু হাসিয়া বলিলেন—তুমি ত কোনকালেই এমন লাজুক ছিলে না। পুরুষ ছেলে একটু মাছ না হ'লে কি খেতে পারবে?

—ছোটকাল থেকে ত মার সংগেই খাই—আর মা—

কাকীমা পুনরায় একটু হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন—মার সংগে বসে না খেলে ভাল লাগে না—না? বেশ বাবা তাই খাবে; কিন্তু তুমি ত ভুলে গেছ, ছোটকালে তুমি দিবারাত্রি একরকম আমার কাছেই থাক্‌তে—তোমার মা ত তোমাকে দেখ্‌তে সময়ই পেতেন না! কত রাত্রি তুমি আমার এখানেই ঘুমিয়েছ—

অমল কৃতজ্ঞতার সঙ্গে বলিল—আমার মনে নেই ত।

—থাক্‌বে কি করে? তখন ত তোমার বয়েস বড় জোর দেড় বছর। তুমি সাম্‌নের উপর রান্না ক'রে খেলে তাই কষ্ট পাই—মা তোমার অবশ্য নই, কিন্তু কোলে পিঠে ক'রে মানুষ ত ক'রেছিলাম—

গৌরী বলিল—ভাত রাঁধার নমুনা ত দেখ্‌লাম—কিন্তু কিছুতেই স্বীকার যাবেন না যে পারি না।

অমল প্রতিবাদ করিল—তোমার চেয়ে ভাল পারিব,—আলু ভাতে ত নুনে পোড়া—

—মিথ্যে দোষ দিলেই ত আর হয় না।

কাকীমা হয়ত মনে মনে হাসিলেন—ভবিষ্যতের কোন সম্ভাবনায়।

বলিলেন—যাক্, কাল তোমরা দুটিতে মীমাংসা ক'রে নিও—তুই কাল দিদির রান্না ক'রে দিয়ে আসিস্—সকাল সকাল দশটার আগে—

—কিন্তু সে কি খাওয়া যাবে!—অমল মিটিমিটি হাসিয়া বলিল।

গৌরী বলিল—আপনি ত ভারী ঝগড়াটে। দেখ্‌বো, জেঠিমা ত কাল খাবেন। তিনি ত মিথ্যা বল্‌বেন না।

কাকীমা হাসিলেন—মেয়ের এই স্বভাব-সুলভ প্রগল্‌ভতা দেখিয়া এবং খুসী হইলেন সম্ভবতঃ তাহাদের নৈকট্যের পরিচয় পাইয়া।

পরদিন সকালে পাড়ার উপর একটু ঘুরিয়া আসিয়া অমল দেখে,—গৌরী পিঠের উপর একরাশ ভিজাচুল ছড়াইয়া সমস্ত শক্তি দিয়া বাটনা বাঁটিতেছে। শ্রমে মুখখানি রক্তিম হইয়া উঠিয়াছে। ভিজা চুল স্থানচ্যুত হইয়া বার বার মুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। অমল মুগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া প্রশ্ন করিল—মা, তুমি জল খেয়েছ?

মা রান্নাঘরের দাওয়ায় বেড়া হেলান দিয়া বসিয়াছিলেন, তিনি একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিলেন—গৌরী থাক্‌তে তোর আর সে ভাবনা নেই।

একটু পরে দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিয়া বলিলেন—পরের মেয়ে, কবে বিয়ে হ'য়ে কোথায় চলে যাবে! বুড়োকালে যদি ওর মত কেউ কাছে থাক্‌তো তবে ত কোন ভাবনাই ছিল না।

আত্মপ্রশংসা শুনিয়া গৌরী মাথা নীচু করিয়া রহিল।

মা পুনরায় বলিলেন—তোকে বিদেশে পাঠিয়ে কত ভাবনাই ভাবি কিন্তু কি ক'রবো! আমি যদি মরে যাই তুই কি ক'রবি, একটু স্থিতি ভিতি ক'রে দিয়ে যেতে যেন পারি।

অমল বলিল—ও সব কি ব'লছো। ক'লকাতায় আমার কোন কষ্ট হয় না। যাক্,—কিন্তু—

গৌরী চট্ করিয়া বলিল—কিন্তু কিন্তু করেন কেন? চা খাবেন ব'ললেই হয়।

অমল ব্যঙ্গ করিল—তুমি কি চা ক'রতে পারবে?

গৌরী হাসিয়া বলিল—আমি ত স্বীকার করেছি যে আপনি আমার চেয়ে অনেক ভাল রাঁধ্তে পারেন তবে আবার কেন? আমাদের তৈরী চা ভাল না লাগারই কথা—

—কারণ?

—মিস্ অপর্ণা রায়ের মত বিদুষী মেয়েদের হাতে যাঁরা চা খান তাঁদের গেঁয়ো চা পছন্দ হবে কন?

অমল চিন্তা করিয়া বুঝিল—টেবিলের উপর লেখা চিঠিখানার ঠিকানা অন্ততঃ গৌরীর চোখ এড়ায় নাই।

মা প্রশ্ন করিলেন—তুই ত থাকিস্ মেসে, তোর সঙ্গে ওঁর পরিচয় হ'ল কেমন করে?

অমল বলিল—আমাদের সঙ্গেই পড়ে যে, নিজেই আলাপ ক'রেছে।

— খুব বড়লোক?

— হ্যাঁ, খুব না হ'লেও বড়লোক।

গৌরী প্রশ্ন করিল—কেমন দেখ্তে?

অমল চট্ করিয়া জবাব দিল—তোমার চেয়ে সামান্য একটু ভালো।

গৌরী হতাশ সুরে বলিল – তবে আর চা ক'রে কি হবে! এত খারাপ হবেই।

—হোক্, মাঝে মাঝে খারাপ চা খেতে হয়।

মা হাসিলেন – গৌরীও হাসিয়া উঠিল। মা অপর্ণার প্রসঙ্গে পুনরায় প্রশ্ন করিলে, অমল চিঠি লিখিবার কারণ, তাহার সহানুভূতি ও কুশল প্রশ্নের জন্য ব্যস্ততার কথা সকলই জানাইল।

গৌরী কৌতূহলী হইয়া প্রশ্ন করিল—খুব সুন্দরী?

অমল হাসিয়া জবাব দিল—ভয়ঙ্কর রকমের সুন্দরী।

গৌরী ওষ্ঠ উল্টাইয়া বলিল—ও বাবা!

যাহাই হোক মা তাহাকে না খাওয়াইয়া কখনই খাইবেন না। অমল তাই সকাল সকালই খাইতে বসিয়াছিল। খাইতে বসিয়া সে আশ্চর্য্য হইয়া গেল—দুই রকমের মাছ, ও নানা তরকারী। সে প্রশ্ন করিল—মা, মাছ এলো কোথা থেকে?

মা বলিলেন—গৌরীর মা পাঠিয়েছে।

—এর আবার কি দরকার ছিল! আমি ত মাছ তেমন ভালও বাসিনা।

মা সামনে পিঁড়ির উপর বসিয়া ছিলেন, একটু সোজা হইয়া বসিয়া বলিলেন—দরকার তোর না থাক্‌লেও তার ত আছে। সেই ত তোর আসল মা—তুই যখন ছোট, আমি ত ভাসুরপো আর দেওরপোদের জন্যে প্রাণপাত করে দিবারাত্রি কাটিয়েছি, তোর দিকে ফিরে চাইবার অবসরও হয়নি, তখন ওই ত তোকে রাখতো—ওর ছেলেপুলে ত অনেক বয়সে হ'য়েছে তাই—আর তার ত গৌরীই বড় মেয়ে।

অমলের মনে পড়ে, বিধবা হইবার পরে এই সংসারে তাহার মা দিবারাত্রি ধান ভানিয়া, রান্না করিয়া কোন মতে শ্বশুরের ভিটা ধরিয়া পড়িয়া ছিলেন—তখন তাঁহার সংসারে আদর ছিল না এমন নয় কিন্তু যেদিন তাঁহার প্রয়োজন ফুরাইল সেদিন সরিকরা সকলেই তাঁহাকে এখানে নির্ব্বাসিত করিয়া, নিরুপায় করিয়া দিয়া চলিয়া গেল—অমল নিজের বাহু বলেই আপনার শিক্ষালাভ করিয়াছে। অমল এ সকল জানিত—তাই গৌরীর মায়ের প্রতি মনে মনে সে কৃতজ্ঞতা জানাইল।

মা ধীরে ধীরে বলিলেন—যাদের জন্যে তখন আমি তোর দিকে তাকাইনি তারা ত কেউ আমাকে দেখ্‌লো না—কিন্তু গৌরীর মা

সেদিনও ছিল আজও আছে। নইলে আজ তার আর আমাদের মধ্যে কত তফাৎ তবুও সে ত ভুলে যায় নি। যাদের জন্য প্রাণপাত ক'র্‌লাম তারা ত এখন বড় হ'য়েছে, আমরা বেঁচে রইলুম কি না সে খোঁজও ত তারা একবার নেয় না।

অমলের আরও মনে পড়ে, সে যখন স্কলারসিপ্‌ পাইয়া ম্যাট্রিক পাশ করিল তখন সকল জেঠতুতু খুড়তুতু ভাইকেই মা অনুরোধ করিয়াছিলেন কিন্তু কেহ তাহার ভার লয় নাই—এমন কি বাসায় থাকিতে দিলেও সে পড়িতে পারিত—নানা অজুহাতে তাঁহারা তাহাও থাকিতে দেন নাই। এমন কি এজমালি সম্পত্তির উপযুক্ত অংশ হইতেও তাহাকে বঞ্চিত করিয়াছেন। নানা কথা মনে পড়িয়া অমলের মন বিষণ্ণ হইয়া উঠিল—দরিদ্র দেখিয়াও যাহারা সাহায্য করে, সহানুভূতি দেখায় তাহারা সত্যই মহৎ। কৃতজ্ঞতায়, করুণায় বিষণ্ণতায় তাহার মন আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল।

গৌরী প্রশ্ন করিল—রান্না কেমন হ'য়েছে ব'ললেন না।

অমল মুখ তুলিয়া বলিল—বেশ হ'য়েছে, সত্যিই তুমি ভাল রাঁধতে পারো।

গৌরী প্রশংসা শুনিয়াও খুসী হইল না—সে এমনি উত্তর আশা করে নাই। অমলের নিন্দার অন্তরালে প্রশংসা থাকিত, আজ তাই তাহার মনে হইল যেন এই প্রশংসার অন্তরালে নিন্দাই রহিয়াছে। গৌরী তাই মুখ ভার করিয়াই দাঁড়াইয়া রহিল।

অমল পুনরায় হাসিয়া বলিল—সত্যই ভাল হ'য়েছে। কিন্তু গৌরী তাহা বিশ্বাস করিল না।

খোকার পড়ার ক্ষতি হইতেছে এবং নিজেরও হইতেছে, অতএব অমল তিন চারদিন পরেই কলিকাতা ফিরিয়া আসিল। যে কয়েকটি

টাকা টিউসনি হইতে পাইয়াছিল তাহা যাতায়াতে নিঃশেষিত হইয়া গিয়াছে—মেসের টাকা বাকী। একটি মাস এখনও চালাইতে হইবে, বাড়ী হইতে এই বৈশাখ মাসে কিছু সংগ্রহ করা সম্ভব হয় নাই। নিজের অবস্থার কথা নিরুপায় মাতাকে জানাইয়া কোন লাভ নাই।

যে কয়েকটি টাকা ছিল মেসের ম্যানেজার বাবুকে দিয়া সামান্য কয়েক আনার পয়সা সে নিজের অত্যাবশ্যক খরচের জন্য রাখিয়া দিল। কলেজে যাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না—কেন সে নিজেও বুঝিতে পারে না কিন্তু যাইতেই হইবে। অন্যসূত্রে কিছু একটা উপায় করা প্রয়োজন। রোমাঞ্চকর উপন্যাস প্রকাশক জনৈক ভদ্রলোকের সহিত তাহার সাহিত্যক্ষেত্রে পরিচয় হইয়াছিল—হয়ত পরিশ্রম করিলে কিছু করা যাইতে পারে। বিলিতি উপন্যাস ত তাহার কিছু কিছু পড়া আছে, প্রয়োজন হইলে পড়াও যাইতে পারে।

কলেজে যাইয়া অমল দ্বিতলের বারান্দা দিয়া যাইতেছিল—আগে আগে একদল ছাত্রী যাইতেছেন—অপর্ণা কি যেন বলিতে বলিতে যাইতেছে। অকস্মাৎ সে ফিরিয়া, স্বদল ত্যাগ করিয়া আসিয়া প্রশ্ন করিল—কখন এলেন?

—আজ সকালে।

—মা পথ্য করেছেন?

অমল লক্ষ্য করিয়াছিল মার পূর্ব্বে অপর্ণা 'আপনার' কথাটা বাদ দিয়াছে—সহসা কি যেন ভাবিয়া সে অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে হাসিয়া বলিল—হ্যাঁ, পথ্য করেছেন।

—এত সকালেই ফিরলেন যে!

—সেখানে থাকবার প্রয়োজন কিছু নেই, তাই আর রইলাম না।

—তাঁকে একটু সবল ক'রে এলেই ত পারতেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু তার প্রয়োজন হ'ল না।

অপর্ণা এতক্ষণে প্রশ্ন করিল—মেয়ে কি রকম দেখ্‌লেন।

—অসুখ সেরেছে, তবে পথ্য করেন নি, খুব দুর্ব্বল—

অপর্ণার জন্যে তাহার বান্ধবীগণ এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়াছিল কিন্তু অপর্ণার প্রস্থান করিবার কোনরূপ সম্ভাবনা না দেখিয়া চলিয়া গেল।

অমল হাসিয়া বলিল—আপনার যথেষ্ট সাহস বেড়েছে দেখছি।

—কেন ?

—এত লোক সমক্ষেও আমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে আপনার সাহস হ'য়েছে—এটা—

অপর্ণা কটাক্ষ করিয়া কহিল—ও এই ? আপনারা কি বাঘ যে ভয় ক'রবে—

অমল হাসিয়া কহিল—আয়নায় দেখ্‌লে এ কথা বিশ্বাস হয় না কিন্তু আপনাদের মুখ চোখ ঐ কথাটাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়।

অপর্ণা একটু তিরস্কারের সুরে বলিল—এত দিন পরে দেখা হ'ল, তাতেও ঝগড়া ক'রবার লোভ আপনি সংবরণ ক'রতে পারছেন না ! আশ্চর্য্য আপনার মন—

অমল স্বীকারোক্তি করিল—সত্য কথা ব'লতে কি—ঝগড়া—যদি তাই হয় তাতেই খুব আনন্দ পাই !

অপর্ণা হাসিয়া ব্যঙ্গ করিল—You are brutally cruel.

একটা ঘণ্টা বাজিল।

অমল বলিল—চলুন, ক্লাসে।

—ক্লাস হবে না, চলুন লাইব্রেরীতে যাই—না হয় গল্প করি—

অমল অপর্ণাকে অনুসরণ করিয়া চারতলার একটি শূন্য কক্ষে উপস্থিত হইল। অপর্ণা একটা বেঞ্চে বসিয়া বলিল—বসুন, আপনার সমস্ত কাহিনী শুনি। আপনার পত্রের জন্যে আমি সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রছিলাম —যা হোক সংবাদ পেয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'লাম।

অমল সমগ্র ঘটনাই বর্ণনা করিল—তুচ্ছ, তুচ্ছতম সমস্তই বলিল কিন্তু দুইটা সংবাদ যা অবশ্যই দেওয়া কর্ত্তব্য তা সে গোপন করিল এবং প্রসঙ্গক্রমে এড়াইয়া গেল—একটি তাহাদের দারিদ্র্য এবং অপরটি গৌরীর কাহিনী।

জানালার ফাঁকে দূর দিগন্তের যে অংশটুকু দেখা যাইতে ছিল তাহারই মাঝে ধূসর একখানি নিবিড় মেঘের পানে চাহিয়া অপর্ণা সমস্তই শুনিল। অমল চুপ করিলে ক্ষণিক পরে অপর্ণা বলিল—মা আমার পত্র দেখে ছিলেন।

—কি ব'ললেন ?

—তিনিও আরোগ্য সংবাদে আনন্দিত হ'লেন! অপর্ণা আরও কি যেন একটা বলিতে যাইতেছিল হঠাৎ থামিয়া গেল।

অমল তাই প্রশ্ন করিল—আর কিছু ?

—আর আবার কি ? আপনি এলেই একবার নিয়ে যেতে বলেছেন।

—ভাল—অবশ্যই যাবো।

—আজ আমাদের ওখানে যেয়েই চা খাবেন।

—বেশ। কিন্তু একটা প্রশ্ন আপনাকে ক'রতে পারি—নির্ভয়ে ?

অপর্ণা হাসিয়া বিদ্রূপ করিল—আমাদের করবেন ভয়—এত বিনয় আপনার ?

অমল বলিল—এতদিন আপনাদের দলের মাঝে থেকে আমাকে কখনও চেনেন এমন ভাব দেখান নি, কিন্তু আজ যথেষ্ট ব্যঙ্গ সহ্য ক'রতে হবে জেনেও কেন অকস্মাৎ বেরিয়ে এলেন—

—সংবাদটার জন্যেই, আর পূর্ব্বে আসিনি তার কারণ, প্রয়োজন ছিল না। আজ আপনাকে কোন প্রশ্ন না ক'রলে দুঃখ পেতেন হয়ত—

—ও আমাকে দুঃখ দিতে চান না তাহ'লে !

—সজ্ঞানে ইচ্ছা করি না—তবে আপনার মনে এ সুবুদ্ধিটুকু থাকলে সুখী হ'তে পারতাম।

অপর্ণা অকস্মাৎ উঠিয়া গেল। অমল স্থবির, জীর্ণ জড়ের মত তাহার গমন পথের পানে চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই অনাগত স্বপ্নের সৌরভে আমোদিত হইয়া উঠিল।

সাত

৪টায় শেষ ক্লাসটাও হইয়া গেল। অমল বাহির হইয়া দেখে অপর্ণা পথে অপেক্ষা করিতেছে, অমল নিকটবর্ত্তী হইতেই বলিল—চলুন, আর দেরী না।

অমল বলিল—এখানে প্রাথমিক গলা-ভেজানো সেরে গেলে হ'ত না?

—না, আধঘণ্টা চা না খেলে মানুষ মরে না—চলুন।

অমল অপর্ণার এই আগ্রহকে উপেক্ষা না করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চলিল।

ট্রামে উঠিয়া অপর্ণা একটা সিটে বসিয়া বলিল—বসুন—

ট্রামের যাত্রী যাহারা তাহারা মুখের দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে চাহিয়া ভাবিতেছিল—এই ভাগ্যবান ব্যক্তিটি কে? তাহাদিগের মুখের উপরে একটা করুণার দৃষ্টি হানিয়া অমল বসিয়া পড়িল। অপর্ণা কণ্ডাক্টরকে ডাকিয়া দুইখানি টিকিট করিয়া ফেলিল। অমল হাসিয়া বলিল—টিকিট কেনার এত গরজ কেন?

—আপনি আমার অতিথি, পাছে আপনি টিকিট করেন এই ভয়ে।

অমল পুনরায় হাসিয়া বলিল—যাক, আমার মাঝে এতখানি উদারতা

যে থাকতে পারে ভেবেছেন, এতেই আমি ধন্য হ'য়েছি। অমল জানিত উভয়ের টিকিট করিলে ফিরিবার সময় চৌরঙ্গী পর্য্যন্ত ট্রামে ফিরিয়া বাকীটুকু হাঁটিয়া ফিরিতে হইত।

অপর্ণা হাসিয়া টিকা করিল—ভুলও বুঝতে পারি।

অমল বলিল—ভুল বোঝাই আপনাদের—অর্থাৎ মেয়েদের ধর্ম্ম।

অপর্ণা জবাব দিল না—পাশের পেভমেণ্টের পথচারীদিগের প্রতি একটা অনৈচ্ছিক দৃষ্টি রাখিয়া কি যেন ভাবিতে লাগিল। অমল মনে মনে ভাবিল—অপর্ণার পরাজয়ের কথা। কথায় সে এমন বার বার কখনও পরাজিত হয় নাই—এমন ভাবে দল ছাড়িয়া আসিয়া সে কখনও আলাপ করে নাই, আগ্রহভরে তাহাকে বাড়ীতেও লইয়া যায় নাই। অপর্ণার কি যেন একটা হইয়াছে—সে ভাল করিয়া অপর্ণাকে লক্ষ্য করিল। অন্যান্য দিন তাহার বেশে মুখে একটা সযত্ন প্রসাধনের রেশ পাওয়া যায়, আজ চুলগুলি তাহার অযত্নবদ্ধ, মুখে কোনরূপ প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহার করা হয় নাই। অমল বুঝিল অপর্ণার একটা কিছু হইয়াছে এবং তাহাকে এমনি করিয়া লইয়া যাইবার পিছনেও একটা উদ্দেশ্য আছে। সে তাই প্রশ্ন করিল—আপনার কি হ'য়েছে বলুন ত ?

অপর্ণা অমলের মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তার মানে ? এ প্রশ্ন আপনার মনে হয় কেন ?

—নাচার, হ'লে কি ক'রবো ?

—সংযম শিক্ষা করতে হবে—

—তাই হবে, চুপ ক'রে ভব্য ভদ্রলোকের মত বসে থাকি ?

—হ্যাঁ। চুপ ক'রে বসে থাকুন।

অমল গেট-দরজা ঠেলিয়া আগেই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল। কে যেন দ্বিতলের ঝুলবারান্দা হইতে বলিল—অমলবাবু, নমস্কার।

...হাতীত

স কহিল—

দেহ ও

অমল চাহিয়া দেখে করুণা। স্মিত হাস্যে উচ্চকণ্ঠে তাহার ইল। নমস্কার।

বৈঠকখানায় বসিতে না বসিতেই করুণা আসিয়া উপস্থিত হয়, অম অপর্ণা বলিল—আপনি বসুন অমলবাবু, একজন সাথী ত দিয়ে গেলাম।

করুণা প্রশ্ন করিল—আপনার মার অসুখ সেরেছে?

অমল আশ্চর্য্য হইল—অপর্ণাদের বাড়ীতে অমলকে লইয়া নিশ্চয়ই কিছু আলোচনা হইয়াছে, তাহা না হইলে করুণার পক্ষে তাহার মাতার অসুস্থতার সংবাদ পাওয়া সম্ভব নয়। সে করুণাকে পাশের চেয়ারে আদর করিয়া বসাইয়া বলিল—হ্যাঁ, অসুখ সেরেছে। তুমি জানলে কি ক'রে?

করুণা বিজ্ঞের মত বলিল—ও সব খবর জানি।

—কেমন ক'রে?

—আপনার চিঠি আমি পড়েছি যে! মা পড়েছে, বাবা পড়েছে—মা আপনাকে নিয়ে আসতে বলেছে, জানেন।

—কেন?

করুণা প্রশ্নে কোনরূপ গুরুত্ব আরোপ না করিয়াই বলিল—এমনি।

অপর্ণা এই সময়ের মাঝেই কাপড় ছাড়িয়া খাবার ও চা লইয়া ফিরিল। অমলের সামনে খাবার ও চা রাখিয়া বলিল—নিন, ক্ষিদে পেয়েছে নিশ্চয়ই।

—কিন্তু আমি একটি রাঘব বোয়াল—এ অনুমান ক'রে আমাকে অসম্মান করা হ'ল না কি? পক্ষান্তরে এতে আমার ক্ষীণ স্বাস্থ্যের প্রতি কটাক্ষ করা হচ্ছে না কি?

অপর্ণা তাচ্ছিল্যের সহিত বলিল—হোক্, না খাওয়ার মধ্যেও কোন পৌরুষ নেই।

—না, না, কিছু তুলে রাখুন, খামকা নষ্ট করে কি হবে?

যে থাকতে প তই হবে—না খেলে অমার্জ্জনীয় অপরাধ বলে গণ্য হবে। উভয়ের ন্দ্র আপনার ?

বাকীটা ণা হাসিয়া বলিল—খাবারটা এখানে আপনার সাম্‌নে না হয় নাই ম—চা খেলেই ভদ্রতা রক্ষা হবে।

আহারান্তে অপর্ণার মা আসিয়া অমল ও তাহার মাতার কুশল প্রশ্ন করিলেন। তিনি ক্ষুণ্ণ স্বরে কহিলেন—তাঁকে, অমন গ্রামে ফেলে রেখেছ কেন বাবা ? এখানে আন্‌লে তোমারও সুবিধে হয়—মেসে খাওয়া দাওয়ার ত কত কষ্ট হয় !

অমল একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া বলিল—মা এখানে কিছুতেই আস্‌তে চান না। গ্রাম ছাড়তে মা একেবারেই নারাজ।

—সেখানে তোমাদের আর কে আছেন ?

—আমাদের ব'ল্‌তে সরিকরা আছেন, তা ছাড়া আমি মায়ের একই ছেলে।

—তোমাদের জমিদারীর যা পাওনা তা ক'ল্‌কাতা থেকে মাসে মাসেও ত আনাতে পারো—সেখানে পড়ে থাকবার কি প্রয়োজন !

অমল মিথ্যা কথা বলিল—মিথ্যা বলা তাহার স্বভাব নহে কিন্তু আজ সত্য বলিতেও যেন তাহার বড় দ্বিধা হইতেছিল। সে বলিল—মাকে সারাজীবন ধ'রে এই কথাটাই আমি বুঝিয়ে উঠ্‌তে পারি নি।

অপর্ণার মা একটু থামিয়া বলিলেন—হ্যাঁ তা হয়, তিনি যে কেন সেখানেই পড়ে থাকেন তা বোঝার বয়স তোমার হয়নি অমল, কিন্তু আমরা ত বুঝি—ঐ ভিটাই ত তাঁর জীবন।

অমল তাঁহার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দিয়া গেল। অমল সন্দেহ করিল, অপর্ণার মা সকলের কুশল প্রশ্নের ফাঁকে পরোক্ষে তাহার বাড়ীর অবস্থা জানিতে চাহিয়াছেন। অমল সে প্রশ্নকে বার বার কৌশলে এড়াইয়া গিয়াছে তাই মনের মাঝে কাঁটার মত একটা অস্বস্তি অনুভব করিতেছিল

—তাহার মনে হইল, এ মিথ্যা ভাবণে বা সত্য গোপনে, তাহার অপরাধ হইয়াছে।

সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট চিত্তে বলা যায় না অপর্ণার মা চলিয়া গেলেন, অমল কি যেন একটু চিন্তা করিয়া প্রশ্ন করিল—আপনার বাবা কোথায় ?

—আফিসে, রাত্রি ৮টার আগে আসার কোন সম্ভাবনাই নাই।

—অতএব ?

—আমি আর করুণা ছাড়া কথা ব'লবার কেউ নেই।

—শুভ খবর। প্রসঙ্গান্তরে সে প্রশ্ন করিল—আমাদের সমিতির খবর কি ?

—সংবাদ শুভ—বেথুন পর্য্যন্ত আমাদের প্রচার কার্য্য গেছে, দুই একজন নতুন সভ্যা হ'য়েছেন।

—তারপর ?

—পরশু একটি সোসাল হবে, ডলি মিত্রের বাড়ীতে—নং অম্বিকা ঘোষ লেন। আপনাকে উপস্থিত থাক্‌তে হবে, কাল কলেজে নোটিশ পাবেন।

অস্থিরচিত্ত করুণা এতক্ষণ যেন কোথায় গিয়াছিল, অকস্মাৎ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল—অমলবাবু জানেন ? দিদির বিয়ে—

অমল সহসা কিছু বলিতে পারিল না—এত দিনের স্বপ্ন তাহার মাত্র দুইটি প্রগল্‌ভ শব্দে একেবারে ধূলিসাৎ হইয়া গিয়াছে। মনের সংগোপনে যে চিন্তাধারা তাহার জীবন-রসে সঞ্জীবিত হইয়াছিল সহসা বিদ্যুৎ প্রবাহের স্পর্শে যেন তাহা মুহূর্ত্তে মরিয়া গিয়াছে—যাতনায় একটু ছট্‌ফট্‌ করিতে, আর্ত্তকণ্ঠে একটু কাতরোক্তি করিতে যেন তাহার সময় হয় নাই। অমল নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল—শুভ সংবাদ, নেমন্তন্নটা কবে ? কোথায় বিয়ে হবে—

করুণা কহিল—ওই ত, অজিতবাবুর সঙ্গে—বিলেত ফেরৎ।

অমল ম্লান হাসিয়া বলিল—বল ত এতক্ষণ এমনি খবর গোপন রাখতে হয়? কবে? তোমার দিদির কি অন্যায়। ইতর ব্যক্তি যারা তারা ত' মিষ্টান্নের আশা অন্ততঃ ক'রতে পারে—

অমল অপর্ণার মুখের দিকে চাহিল। সে অবনত মুখে লজ্জিত দৃষ্টিতে টেবিলের উপরে কি যেন দেখিতেছে। কর্ণমূল পর্যন্ত তাহার আরক্তিম হইয়া উঠিয়াছে, তাহাতে বোঝা যায় এই অপরিসীম লজ্জাকে সে গোপন করিতে পারে নাই। ক্ষণিক বাদে সে চোখ তুলিয়া চাহিল। অমল দেখিল, এমনি আর্দ্র, এমনি করুণ, এমনি দীন নেত্রে যে অপর্ণা তাহার পানে চাহিতে পারে তাহা সে কোনদিন ভাবিতেও পারে নাই। ধরা-পড়া চোরের মত নির্ব্বাকভাবে সে কেবল লাঞ্ছনার জন্য মনে মনে প্রস্তুত হইতেছে।

অমল হাসিয়া বলিল—এ শুভ সংবাদটা দেওয়ার জন্য এতদূর নিয়ে আসার কি প্রয়োজন ছিল? এটা ত কলেজেই জানাতে পারতেন।

অপর্ণা তবুও কিছু বলিল না। অমলের মুখের পানে চাহিয়া থাকিল মাত্র। অমল করুণাকে ডাকিয়া বলিল—অজিতবাবুর বাড়ী কোথায়?

করুণা বলিল—তাও জানেন না—শ্যামবাজারে, তাঁকে চেনেন না?

—না। চিন্‌বো কি ক'রে!

—তিনি ত প্রায়ই আসেন।

অমল করুণার নির্ব্বুদ্ধিতায় হাসিয়া বলিল—বিয়ে কবে? নেমন্তন্ন ক'রবে ত?

—শীগ্‌গিরই—

অপর্ণা করুণাকে একটা ধমক দিয়া বলিল—যা মিথ্যা কথা বলিস্ না। যা এখান থেকে—

করুণা যেমন ছুটিয়া আসিয়াছিল তেমনি ছুটিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু যাহা বলিবার তাহা নিঃশেষেই বলিয়া গেল। অমল বলিল—সত্য কথা

ত, কিন্তু

বলায় ওর ত কোন অপরাধ হয় নি, আর শুভ সংবাদ যতই প্রচ। উপরে ততই মঙ্গল হয়— কর

অপর্ণা এতক্ষণে কথা কহিল। বলিল—কথাটা সত্য নয়। বেশী বললে আংশিক সত্য বলা যায়।

—যথা ?

—অজিতবাবু বিলেত-ফেরত বড় লোকের ছেলে। টাকা বাড়ী গাড়ী কিছুরই অভাব নেই—বিলেত গিয়ে তিনি কোন ডিগ্রিও আন্‌তে পারেন নি, এমন কি একটি মেম-সাহেবও না। মা বাবার ধারণা এমন সৎপাত্র আর ভূ-ভারতে নেই—

—আপনার ?

—লেখাপড়া শিখি আর যাই করি, বিবাহের ব্যাপারে আমাদের মতামত আজও অবান্তর হ'য়েই আছে।

—আপনারও ত মত হওয়াই উচিত। বাড়ী গাড়ী এসব কিছুরই ত অপ্রাচুর্য্য নেই—আর অধিক কি চাই ? এর চেয়ে বেশী মানুষে কি আশা ক'রতে পারে !

অপর্ণা ক্ষীণ একটু হাসিয়া বলিল—ও আর কিছু আশা ক'রবার নেই, তাহ'লে ?

—নাঃ, আপনাদের আর কি চাই !

অপর্ণা কোন জবাব দিল না। অমল বারবার আঘাত করিয়াও কোন জবাব না পাইয়া বিষণ্ণ হইল। অনুশোচনা হইল, এমন করিয়া আঘাত না করিলেই হয়ত ভাল হইত। তাহার চাহনির মাঝে যে বেদনা ক্ষরিয়া পড়িতেছে তাহা উপেক্ষা করা ভাল হয় নাই—এই বিবাহের মাঝে নিশ্চয়ই কোথায়ও একটা দুঃখময় প্রসঙ্গ আছে। হয়ত এমনও হইতে পারে অপর্ণা মনে মনে তাহারই মত স্বপ্নরচনা করিয়াছিল তাহা আজ ধূলিসাৎ হইতে চলিয়াছে। অমল তাই বলিল—বলা হয়ত আমার অন্যায়,

অমল দাওয়ার অধিকার আমার নেই জানি, তবুও যে ঘনিষ্ঠতা হ'য়েছে হয় ' দাবীতে এবং আমার অন্তরের থেকে আপনাকে যতখানি আপনার ক'রে ভেবেছি তার দাবীতে—

অমলের স্বর অশ্রুভারে কাঁপিয়া কাঁপিয়া উঠিতেছিল সে সহসা থামিয়া গেল। অপর্ণা তাহার মুখের দিকে উৎকণ্ঠিত ব্যাকুল দৃষ্টিতে একবার চাহিল। অমল পুনরায় ধীর কণ্ঠে কহিল—যদি বিয়ে করেনই তবে মানুষকে ক'রবেন, গাড়ী বাড়ী আর ব্যাঙ্ককে ক'রবেন না। তোমার অন্তরের যে পরিচয় পেয়েছি সে গাড়ী আর বাড়ীতে শান্তি পাবে না।

অকস্মাৎ "তোমার" বলিয়া ফেলিয়া এবং নিজের অসংযত অশান্ত কণ্ঠস্বরের জন্য লজ্জিত হইয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল এবং কোন কিছু চিন্তা না করিয়া, এমন কি একটা বিদায় নমস্কার না জানাইয়াই সে চলিয়া আসিল। গেটের নিকট হইতে ফিরিয়া চাহিয়া দেখিল অপর্ণা ঘরের মাঝে তেমনি করিয়া নির্ব্বাক নিস্পন্দ ভাবে বসিয়াই আছে। বাহিরের কোন্ অনির্দ্দিষ্ট দৃশ্যের মাঝে তাহার দৃষ্টি আপনাকে হারাইয়া ফেলিয়াছে।

ট্রামে বসিয়া অমল ভাবিতেছিল—

অপর্ণা তাহার বিবাহের সংবাদটা ইচ্ছা করিলে কলেজেও দিতে পারিত, বাড়ীতে যাইয়া তৃতীয়পক্ষ মারফতে জানাইবার কি প্রয়োজন? হয়ত এ সংবাদ জানাইবার ইচ্ছা তাহার ছিল না, করুণা অত্যন্ত আকস্মিকভাবে এবং অনিচ্ছাকৃত ভাবে বলিয়া ফেলিয়াছে। কিন্তু অপর্ণার মাঝে আজ সে যে সংযম এবং প্রতিঘাত করিবার অনিচ্ছা দেখিয়াছে তাহা স্বাভাবিক নয়—হয়ত তাহার মন এ বিবাহে অনুমতি দেয় নাই, তবুও তাহাকে বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া না জানাইলে ক্ষতি ছিল না।

আরও কিছু বয়স হইলে সে হয়ত অন্যরূপ ভাবিতে পারিত, কিন্তু যৌবনের উদার ও মহৎ অন্তর লইয়া সে বার বার অপর্ণার উপরে অভিমানে ক্রোধে নিজেকে নিজে দংশন করিতেছিল। বড় লোকের মেয়ের সহিত আর একজন বড় লোকের ছেলের বিবাহ হইতেছে—এমন কতই নিত্য হয় তাহাতে অমলের মনে করিবার কি আছে। তবুও সে কিছুতেই অপর্ণাকে ক্ষমা করিতে পারিল না। নিষ্ফল ক্রোধে বার বার তাহার চোখ দুইটি অশ্রুসজল হইয়া উঠিতেছিল—

ট্রাম যখন মধ্যপথ অতিক্রম করিয়াছে তখন অমল স্থির করিল—সে দরিদ্র, এই অসম্ভব আশা পোষণ করা তাহার পক্ষে যাহাকে বলে বাতুলতা তাহাই মাত্র। তাহার কর্ত্তব্য অন্যরূপ—সে এই পথেই রমলাদের বাড়ীতে পড়াইতে যাইবে স্থির করিল এবং কাল হইতে মনের সমস্ত স্বপ্ন-বিলাসের মোহ ছাড়িয়া দিয়া, সমস্ত অতীত পরিচয়কে অস্বীকার করিয়া সে পড়াশুনা সুরু করিবে। যেমন করিয়াই হোক্, সে অপর্ণার অবিরাম দুর্নিবার আকর্ষণ হইতে নিজেকে মুক্ত করিবে। কেহ ভাল বাসিল না বলিয়া দুঃখ করা চলে, দুঃখময় জীবনকে ধ্বংস করা চলে, কিন্তু অভিযোগ করা চলে না—

অমল রমলাদের বাড়ীর সদর দরজায় কড়া ঘনঘন নাড়িয়া দিল। খোকা দরজা খুলিয়া একটু অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া বলিল—আপনি?

অমল কথা বলিল না—পড়িবার ঘরে বসিয়া খোকার উদ্দেশ্যে কহিল—বই নিয়ে এস—

বই একতলা হইতে দ্বিতলে স্থান পাইয়াছিল, খোকা আনিতে গেল। কিন্তু ফিরিয়া আসিল না। রমলা আসিয়া বলিল—কবে এলেন? আপনার মায়ের শরীর ভাল?

অমল সংক্ষেপে জবাব দিল—হ্যাঁ।

রমলা একটা চেয়ারে বসিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—পথ্য ক'রেছেন ?

—হ্যাঁ।

—এত শীগ্‌গির চলে এলেন, আর একটু সুস্থ্য ক'রে এলেই ত পারতেন।

অমল এই সামান্য সহানুভূতিতে অনেকটা আনন্দ বোধ করিল—অশান্ত অভিমান পীড়িত অন্তরে যেন একটা ঠাণ্ডা প্রলেপের কোমলতা অনুভব করিল। অমল হাসিয়া বলিল—খোকার পড়ার ক্ষতি হচ্ছে, আর আমি থেকে বিশেষ কিছুই ত ক'রতে পারবো না।

—কি অসুখ ?

—জ্বর, তার সঙ্গে সামান্য একটু বুকের দোষও ছিল।

—বাড়ীতে শুশ্রূষা ক'রবার কে আছেন ?

—মা বলেন ভগবান আছেন, আর আমি বলি সহৃদয়া প্রতিবেশিনীরা আছেন।

রমলা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—যা হোক্ খুব ভরসা বল্‌তে হবে।

—হ্যাঁ, ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান ব'য় একটা কথা আছে।

রমলা প্রবেশোন্মুখ খোকাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—চা'র ব্যবস্থা করে এসেছিস ? যা নিয়ে আয়—এতদিন পরে উনি এলেন, একটু ভদ্রতাও ত ক'রতে হয় !

অমল বলিল—আপনি থাক্‌তে তার ভাবনা নেই বলেই মনে হয় !

চা আসিল। অমল দুই এক চুমুক খাইয়া বলিল—আপনার খবর কি—এতদিনে নতুন কিছু—

রমলা বলিল—একটা সুখবর আছে, আমাদের একটা Cultural society হ'য়েছে, আমি মেম্বার হ'য়েছি। পরে আপনাকেও মেম্বার ক'রবো।

অমল ভীত কণ্ঠে বলিল—সেখানে কি হবে ?

—সাহিত্য প্রভৃতি সম্বন্ধে আলোচনা হবে।

অমল দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আমি যে কাপালিক!

রমলা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল—কাপালিককে এবার কালিদাস করে দেব আমরা সকলে মিলে। অপনার অংকশাস্ত্র বড়ই নিরস—ভরসা আপনার মাঝে এখনও যেন একটু সাহিত্যপ্রীতি জীবিত আছে—

—সেটা যে জীবিত আছে এটা বুঝ্তে পারি না, কিন্তু আপনার সঙ্গে আলোচনা ক'রলে মনে হয় যেন কিছু কিছু বুঝি—

—যাক্, যদি ভাল লাগে, আপনাকেও সভ্য হ'তে হবে কিন্তু।

—অবশ্যই, সাহিত্যক্ষেত্রে আপনি আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবেন, দেখি ও সব ব্যাপার কিছু কিছু বুঝি কিনা।

রমলা আঁখি ভঙ্গি করিয়া কহিল—ও সব একেবারেই না বোঝেন এমন ত নয়, তবে স্বীকার করার সৎসাহস আপনার থাকা উচিত।

—তার চেয়েও বড় প্রয়োজন আপনাকে—

কথাটা দ্ব্যর্থক, রমলা তাহা বুঝিয়াই আত্মপ্রসাদের সঙ্গে কহিল—আমাকে?

রমলা অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে হাসিয়া প্রস্থান করিল। অমল এতগুলি মিথ্যাকথার পুনরুক্তি করিয়া মনে মনে কেন যেন খুসী হইয়া গেল।

আট

পরদিন কলেজে যাইয়া অমল সমস্ত ঘরগুলি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিল, কিন্তু অপর্ণা আসে নাই। কাল সে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল সমগ্র অতীতকে সে ভুলিবে ; কিন্তু আজ অপর্ণা কলেজে আসে নাই দেখিয়া একটা অজ্ঞাত আশঙ্কায় তাহার মন বার বার কাঁপিয়া উঠিতেছিল। অসম্ভব ভবিষ্যৎ-সম্ভাবনায় সে পর্য্যায়ক্রমে শঙ্কিত ও দুঃখিত হইতেছিল। সারাটা দিন কলেজের ইটকাঠময় দালানটির মধ্যে ক্রৌঞ্চের মত পাখার ঝটপট করিয়া তাহার মন ক্লান্ত হইয়া পড়িল। বিকালে চা খাইতে খাইতে সে স্থির করিল—অপর্ণার বাড়ীতেই সে যাইবে। আজ সে যেমন করিয়া হোক, তাহাকে সমস্ত কথা বলিয়া একটা হেস্ত নেস্ত করিয়া আসিবে—এমনি সংশয় দ্বিধা ও শঙ্কার মধ্যে দিন অতিবাহিত করা সম্ভব নয়।

অন্য কোন কথা চিন্তা না করিয়া, এমন ভাবে যাওয়াটা শোভন হইবে কিনা তাহা না ভাবিয়াই সে ট্রামে উঠিয়া পড়িল। অন্য সকল চিন্তার মধ্যে আর একটা চিন্তা ছিল—সেটা টাকার। আজ রাত্রি হইতেই সে সেই রোমাঞ্চকর উপান্যাস লিখিতে সুরু করিয়া দিবে, অতএব অর্থাভাব তাহার রহিবে না ; সুতরাং হাতে যাহা আছে তাহা সে নিঃসঙ্কোচে খরচ করিয়া যাইতে পারে।

অপর্ণার বাড়ীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া অমলের অন্তর কাঁপিয়া উঠিল—বাড়ীতে কাহারও সাড়া নাই, কেমন করিয়া কাহাকে সে ডাকিবে ; কিন্তু সে যখন আজ সবই শেষ করিতে আসিয়াছে তখন সামান্য ভদ্রতা-অভদ্রতার কথা বিবেচনা করিয়া লাভ কি ?

অমল সদর দরজা, বাড়ীর বৈঠকখানার দরজা অতিক্রম করিয়াও কাহাকেও পাইল না। অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিল, অপর্ণা গৃহের

কোণে একটা সোফায় জড়ের মত, মর্ম্মরমূর্ত্তির মত স্থির হইয়া বসিয়া আছে। অমলের প্রবেশ, জুতার শব্দ কিছুই তাহার কানে যায় নাই। অমল ব্যথিত হইল—যে অপর্ণার চটুল বাক্যবিন্যাস ও চঞ্চল গতিভঙ্গির কত প্রশংসা সে মনে মনে করিয়াছে আজ সে সামান্য একখানা শাড়ী পরিয়া, অত্যন্ত রুক্ষ কেশপাশকে পৃষ্ঠে এলাইয়া দিয়া বসিয়াই আছে। অমল ডাকিল—অপর্ণা!

অপর্ণা বলিল—কখন এলে? হঠাৎ এলে যে!

দুইজন অকস্মাৎ অবাক হইয়া গেল—তাহারা কবে কখন 'আপনি'র গণ্ডী অতিক্রম করিয়া 'তুমি'তে আসিয়া পৌঁছিয়াছে তাহা তাহারা নিজেরাই বুঝিতে পারে নাই। তাই আজ উভয়েই অকস্মাৎ হাসিয়া ফেলিল।

অমল বলিল—কলেজে গেলে না যে!

অপর্ণা একটু হাসিয়া, ব্রীড়াভঙ্গি সহযোগে বলিল—নিত্য বারোমাস কলেজে যেতে হবে না কি? পড়ায় এত অনুরাগ এখনও আমার হয়নি—

—অকস্মাৎ বীতরাগই বা হ'ল কেন?

অপর্ণা জবাব না দিয়া পুনরায় প্রশ্ন করিল—তুমি কলেজ থেকেই এলে ত? খাবে না? ক্ষিধে পেয়েছে ত—

অমল বলিল—কলেজস্কোয়ারে ক্ষিধে পেয়েছে, তাই বালিগঞ্জে এসেছি খেতে—চমৎকার তোমার বুদ্ধি—

—খাবে না তাহ'লে? বেশ—তুমি মারমুখী হ'য়ে ঝগড়া ক'রতে এসেছ বলে মনে হয়—

—সত্যিই তাই।

করুণা আসিয়া পড়িল। অপর্ণা বলিল—খাবার, চা নিয়ে আয়।

করুণা রহস্য ব্যক্ত করিয়া ফেলিল—অমলবাবু, দিদি আজ বলেছে যে আপনি আসবেন—

—সত্যি ?

—হ্যাঁ।

অপর্ণা বলিল—যা খাবার নিয়ে আয়। করুণার প্রস্থানের পর বলিল—কেন যেন মনে হ'ল তুমি আসবে—কলেজে যাই নি বলেই হোক বা সমিতির সভায় যোগদানের কোন সংবাদ নিতে—অপর্ণা হাসিয়া ফেলিল।

অমল বলিল—হাসলে যে।

—আমার অনুমান সত্য হ'য়েছে বলে আর কি? অপর্ণা তবুও হাসিতে লাগিল।

অমল বুঝিয়া পায় না অপর্ণা আজ এমন করিয়া প্রগল্‌ভের মত কেবল হাসিতেছে কেন? সে অত্যন্ত অবাক বিস্ময়ে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

অপর্ণা বলিল—কাল সমিতির সভায় যাবে ত ?

—তুমি ?

—যাবো, কলেজ থেকে একসঙ্গেই কেমন ?

অমল ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—তোমার ত বেশ পরিবর্ত্তন হ'য়েছে দেখছি—আগেকার লোকটিকে তোমার মাঝে আর চিনবার যো নেই দেখছি।

—তোমারও ত তাই।

—মানে।

—আমাদের বাড়ীতে বলে আন্‌তে পারিনি, আর আজ স্বেচ্ছায় খোঁজ নিতে এসেছ—আশ্চর্য্য !

—মিথ্যা কথা আমাকে ব'লতে হ'য়েছে বটে, তবে বলে বলে আন্‌তে হয়নি। না বল্‌তেই আসা, বিশেষতঃ কোন মেয়ের বাড়ীতে কারও পক্ষেই সম্ভব নয়।

চা পান করিতে করিতে অমল বলিল—যা হোক্, শুভকর্ম্ম কবে ?

—যথা সময়ে নিমন্ত্রণ পত্র পাবে সন্দেহ নেই।

—নিশ্চয়ই, কিন্তু আমাদের মত লোকের একটু আগে জানা দরকার —তৈরী হ'তে হবে ত।

অপর্ণা আঁখি ভঙ্গি করিয়া বলিল—অর্থাৎ ? বিয়ে হবে আমার, আর তৈরী হবে তুমি—তার মানে—

অমল বলিল—অত্যন্ত সহজ অর্থ, অতি পরিষ্কার—একটা উপহার-টার কিছু দিতে হবে ত—গরীব মানুষ জোগাড় করতে কিছু সময় যাবে—

—ও, কি দেবে ? একটি কবিতা, না একটি সোনার দুল, না আর কিছু—

অমল চিন্তিত হইয়া অত্যন্ত গম্ভীর ভাবে বলিল—কি দেব তার জন্যে নয়, কি দেওয়া যায় তা ভেবে বের ক'রতেই ত যথেষ্ট সময় লাগ্‌বে।

অপর্ণা চা পান করিতে করিতে বলিল—এখনই ভাবতে সুরু কর কিন্তু দুশ্চিন্তা ক'রতে আমি বলি না—দোকানে যেয়ে যা প্রথম চোখে পড়ে তাই কিনে নিয়ে আস্‌বে—

—ধর সেটা যদি একটা বালতি বা ঘটি হয়—অমল হাসিয়া উঠিল।

—ভালই হবে, গেরস্তের কাজে ভয়ঙ্কর উপযোগী।

—হ্যাঁ, তা বটে, সন্দেহ নেই।

দুইজনেই ক্ষণিক চুপ করিয়াছিল—অমল অনেক কিছু বলিবে ভাবিয়াছিল কিন্তু মুখোমুখি বসিয়া সে যেন বলার কিছুই খুঁজিয়া পাইতেছিল না। অপর্ণাই তাহার কপাল হইতে অবলম্বিত এক গোছা রুক্ষকেশ অপসারিত করিয়া প্রশ্ন করিল—হঠাৎ কি জন্যে এলে সত্যি ক'রে বল না।

—আসবার কারণটি ভেবে বের করে তারপর এসেছি এমন অনুমান

তুমি কেন ক'রলে, অন্যরূপও ত হ'তে পারে। আসাটাই প্রয়োজন ছিল, কারণ অনুসন্ধান ক'রবার প্রয়োজন হয় নি।

—আমার অসুস্থতা মনে ক'রেছিলে—উদ্বিগ্নও হ'য়েছিলে সম্ভব।

—তাও সম্ভব, কলেজে যেয়ে তোমাকে না দেখেই কেমন মনটা খারাপ হ'য়ে গেল, ভেবে চিন্তে চলেই এলাম।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—তুমি সত্যই মহৎ। যাক্, কাল সমিতিতে তোমার একটা কবিতা পড়া চাই—আছে ত?

—না।

—তার মানে, কবিতার খাতা নেই তোমার? একটা বেছে নিয়ে আসবে।

—খাতায় খাতায় কবিতা লিখবার ক্ষমতা আমার নেই।

অপর্ণা বলিল—মাটি ক'রেছ, তোমার কবিতা যে আমি দিয়েছি।

—রাতারাতি এত লোকে এত কাজ ক'রতে পারে, আমি কি একটা কবিতাই লিখ্তে পারবো না।

অপর্ণা খুসী হইয়া বলিল—একেই বলে সাধনা। কাল কলেজ থেকে একসঙ্গেই যাবো—ঠিক রইল।

—অবশ্যই ঠিক রইল।

অপর্ণা অকস্মাৎ একটু হাসিয়া প্রশ্ন করিল—বিবাহটা শুভকর্ম্ম বলে মনে হয়!

—অবশ্যই, বাঙালীর জীবনে অবশ্য কর্ত্তব্য।

তবে আমার জীবনে এমন একটা শুভকর্ম্মের সংবাদ পেয়ে তুমি ক্ষেপে গেলে কেন?

—ক্ষেপে গেলুম?

—হ্যাঁ।

—বল কি

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—অপ্রিয় হ'লেও সত্য। তুমি বলে গেলে মানুষকে বিয়ে ক'রতে, আমি মানুষ পাই কোথা—বিয়ে আমরা করি টাকাকে, ভালবাসি মানুষকে!

অমল আশীর্ব্বাদের ভঙ্গিতে হাত তুলিয়া কহিল—জয়স্তু—তোমার সাধনা সিদ্ধ হোক্।

—হোক্, আপত্তি ক'রবো কেন।

অপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—বসো, আমি তৈরী হয়ে আসি—একটু বেড়িয়ে আসা যাক্—কেমন?

অমল পুলকিত হইয়া নাটকীয় ভঙ্গিতে কহিল—তোমার অভিরুচি!

অমল বালিগঞ্জের পার্কে ঘণ্টাখানেক অপর্ণার সহিত ঘুরিয়া গল্প করিল—অনেক কথাই হইল কিন্তু কি সমস্ত কথা হইল তাহা গোছাইয়া বলা যায় না, কারণ এ জগতে যাহারা ভালবাসিয়াছে তাহারা কোনদিনই গোছাইয়া কথা বলিতে পারে নাই—অবান্তর, অর্থহীন কথার মধ্যেই প্রেমের প্রকাশ; কথা বলাই প্রয়োজন—তাহার অর্থের নহে।

অমল বাসায় ফিরিয়া দেখিল তাহার সংকল্প সে সাধন করিতে পারে নাই। একটা কিছু হেস্তনেস্ত করিবে বলিয়াই গিয়াছিল, স্পষ্ট যাহা হয় বলিয়া রহস্যময়ী অপর্ণাকে সে প্রত্যক্ষ করিয়া আসিবে কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া সে দেখিল—যাহা বলিবে ভাবিয়াছিল তাহা যেন কোন মায়ামন্ত্রে অপর্ণার সান্নিধ্যে মন হইতে উবিয়া গিয়াছে, যাহা বলিবে তাহার কিছুই বলা হয় নাই, যাহা বলিবে না তাহার সবখানিই বলিয়া আসিয়াছে। সে ভাবিয়াছিল—স্পষ্ট করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে সে তাহাকে ভালবাসে কি না এবং ভালবাসিলে বিবাহ করিতে প্রস্তুত আছে কি না কিন্তু তাহার কোনটিই জিজ্ঞাসা করা হয় নাই।

অপর্ণার কথা বিচার করিয়া সে দেখিল কিন্তু তাহার মাঝে তাহার মনের সন্ধান সে পাইল না, যতই সে বিচার করে ততই অপর্ণা তাহার কাছে দুর্ব্বোধ্য ও রহস্যময়ী হইয়া উঠে। অমল মনে মনে হাসিল—কি বিচিত্র মানুষের মন, কি বিচিত্র এই মেয়েটি! তবে এটুকু সে নিঃসন্দেহে বিশ্বাস করিল, সে অপ্রত্যাশিত ভাবে তাহার উপস্থিতিতে সে খুসীই হইয়াছে।

ডলি মিত্রের বাড়ীতে আজ সমিতির সভা।

ডলি নিজেই অভ্যর্থনা করিতেছিল। অপর্ণা ও অমল যখন উপস্থিত হইল তখন সভার সময় আসন্নপ্রায়। অপর্ণা রাস্তার উপর দাঁড়াইয়া বলিল—তুমি ত বাড়ী চেনো না, আমি না এলে কি ক'রতে?

—আসতুম না।

—বাঃ সমিতির উপর ত তোমার খুব টান!

—তা নেই, তা তুমি জানো; তবে সভ্যাদের প্রতি যথেষ্ট মমতা আছে।

—সভ্যাদের—বহুবচন!

—হ্যাঁ।

—একটু একনিষ্ঠ হওয়া কি ভাল নয়!

—না। বিশ্বপ্রেমের যুগ—তা ছাড়া তোমার প্রতি নিষ্ঠার পরাকাষ্ঠা দেখালেও ত লাভ নেই।

—কেন?

অমল কৃত্রিম দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া বলিল—ওই যে সেই অজিতবাবু, বিলেত ফেরৎ—

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—তিনি বুঝি আমাকে গ্রাস করেছেন?

—না, সম্প্রতি মুখব্যাদান ক'রেছেন।

ডলি গেটের ওপার হইতে বলিল, এই যে অপর্ণাদি, বাড়ী চিনতে পারেন নি বুঝি, না? আসুন অমলবাবু, কবিতা এনেছেন ত?

ডলি তাহাদের বিলম্বের জন্য অভিযোগ করিয়া সভাগৃহে অভ্যর্থনা করিল! সভাগৃহের মাঝে দুইজন নবাগতা মহিলাকে উদ্দেশ্য করিয়া কহিল—আসুন, পরিচয় করে দি। ইনি অপর্ণা রায় আমাদের সম্পাদিকা, আর ইনি স্বনামধন্য কবি অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইংলিশের ভাবী ফার্ষ্ট ক্লাস ফার্ষ্ট।

অমল মুখ তুলিয়া নমস্কার করিতে যাইয়া চমকিয়া উঠিল—যাহাদিগকে নমস্কার করিতে হইবে তাহাদের একজন রমলা মিত্র ওরফে খোকার দিদি। অমল নমস্কার করিল, ডলি মিত্র বলিল—ইনি রমলা মিত্র, ইনি মাধুরী সরকার, দুজনেই বেথুনের থেকে নবাগতা সভ্যা।

অমল রমলাকে কি বলিবে ভাবিয়া পাইল না। রমলাও কেমন থতমত খাইয়া যেন চুপ করিয়া গেল, পূর্ব্বে যে কোনও প্রকার পরিচয় ছিল বা আছে তাহা প্রকাশ করিল না। একটা অজানা আশংকায় অমল শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল, সে কোন মতে সংযত হইয়া বলিল—যাহোক্ আমাদের সমিতির অসৎ উদ্দেশ্যের প্রতি আপনাদের সহানুভূতি আছে জেনে আনন্দিত হলাম। আশা করি ভবিষ্যতে—

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—না, তোমাকে আর ভদ্রসমাজে চালু ক'রতে পারলাম না—অসৎ উদ্দেশ্যে কি ব'লছিলে—বল মহৎ—

অমল বলিল—অসৎ বলে ফেলেছি নাকি? ওটা Printing mistake—তবে যাহা মহৎ তাহাই অসৎ—

—তার মানে?

—ওই ভেদবুদ্ধি আছে বলেই তোমার মোহান্ধ আত্মার মুক্তি হবে না।

অপর্ণা ও অনেকেই হাসিয়া উঠিল। অপর্ণা বলিল—যাক্ তোমার আধ্যাত্মিকতা একটু যেন বুঝেছি—তুমি মুক্তপুরুষ! তোমার কি!

প্রাথমিক আলাপ পরিচয়ের পরে সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

ডলি অমলের নামই প্রস্তাব করিল সভাপতিত্বের জন্য। সকলে সমস্বরে অনুমোদন করিল। জনৈক সভ্য বলিল—অমল তোমার পা কাঁপবে না ত!

অমল কৃত্রিম করুণকণ্ঠে কহিল—পা ত কাঁপে না, কাঁপে বুক। সেটা থামানোর কোন কৌশলই জানা নেই।

অমলের সভাপতিত্বে সভা আরম্ভ হইল। অমলের পাশে বসিয়াই অপর্ণা কার্য্যসূচি দেখাইয়া দিল। অমল বলিল—আজ আমাদের এই সামাজিক অনুষ্ঠানের প্রথম আনন্দদায়ক বস্তুই হবে—নতুন সভ্যা মিস্ রমলা মিত্রের কবিতা।

রমলা তাহার ভ্যানিটি ব্যাগ খুলিয়া কবিতাটি বাহির করিল এবং অত্যন্ত মৃদু ও অস্পষ্ট কণ্ঠে তাহা পড়িয়া গেল, কেহ কিছুই বলিল না, কেবলমাত্র অমল বলিল—চমৎকার।

অমলের প্রশংসাবাদে ডলি ও অপর্ণা একটু মৃদু হাসিল—এবং অন্যান্য সভ্য ও সভ্যা কেবলমাত্র চুপ করিয়া রহিল। রমলা মুখ নীচু করিয়া ছিল—সভাগৃহ মাঝে চাহিয়াও দেখিল না যে একটা অস্পষ্ট ও প্রচ্ছন্ন হাসি অত্যন্ত সংগোপনে তাহাকে ব্যঙ্গ করিতেছে।

অমল এই ব্যঙ্গ লক্ষ্য করিয়াছিল এবং সেটাকে চাপা দিবার জন্যই তাড়াতাড়ি বলিল—দ্বিতীয় কার্য্য আপনাদের হ'চ্ছে সুধাকণ্ঠী শ্রীমতী ডলি মিত্রের একখানি কাব্য সঙ্গীত শ্রবণ।

ডলি বিলোল আঁখি কটাক্ষে অমলকে প্রতিবাদ করিয়া কহিল—সুধাকণ্ঠী? ব্যঙ্গ?

অমল কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—এ সভাপতিত্বের কাজ করা আমার পক্ষে অসম্ভব—এটা সনাতন নিয়ম যে সভাপতি উপযুক্ত বিশেষণ দ্বারা বক্তা প্রভৃতিকে পরিচিত করে দেবেন; কিন্তু বক্তা বা গায়িকা যদি

প্রতিবাদ করেন তবে আমি সভা পরিচালনা ক'রতে অক্ষম—যাক্ ভুল সংশোধন ক'রে নি—আপনারা এবার কাক্‌কণ্ঠী মিস্ মিত্রের একটা গান শুনুন। হ'য়েছে মিস্ মিত্র ?

সকলে হাসিল। মিস্ ডলি মিত্র বলিল—ওইটেই প্রাপ্য বিশেষণ।

ডলি গান করিল—আধুনিক একখানা কাব্য-সংগীত। গান থামিবার সংগে সংগে সকলেই করধ্বনির সাহায্যে ডলির প্রশংসা করিল। কেবল একটি মাত্র ব্যক্তি সভাগৃহের কোণে বসিয়া নীরবে নতদৃষ্টিতে এই সংগীতকে অভিনন্দিত করিল না। অমল সেই দিকেই চাহিয়া ছিল—দৃষ্টি মিলিত হইতেই রমলা ব্যথিত দৃষ্টিতে অমলের মুখের পানে চাহিয়া রহিল। অমল কেন যেন তাহার দিকে চাহিয়া থাকিতে পারিল না, চোখ ফিরাইতেই দেখে অপর্ণা তাহার দৃষ্টি ও এই দুর্ব্বলতা লক্ষ্য করিয়া আপন মনেই একটু হাসিতেছে।

অমল পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান উল্লেখ করিয়া দিয়া মৃদুকণ্ঠে অপর্ণাকে প্রশ্ন করিল—তুমি হাস্‌লে যে ?

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া কহিল—হাসি পেলে কি ক'রবো ?

—চুপ ক'রে থাক্‌বে। কেন হাস্‌লে বল না ?

অপর্ণা বলিল—মিস্ মিত্রের সংগে পরে আলাপ ক'রে নেব, কেমন ?

অমল ব্যংগ করিল—এটা ত হাস্যকর প্রসংগ নয়।

—তাই নাকি ? জানতুম না। অপর্ণা স্মিতহাস্যে অমলকে কি যেন জানাইতে চাহিল কিন্তু অমল কিছু না বুঝিয়া চুপ করিয়া রহিল।

এই সামাজিক অনুষ্ঠানের শেষ দফা ছিল, অমলের কবিতা। অপর্ণা অমনোযোগী অমলের হাতের উপর একটা চাপ দিয়া বলিল—কি করছো ? এবার তোমার কবিতা। বড্ড আনমনা ত ?

অমল বলিল—ও, হ্যাঁ এবার স্বনামধন্য কবি শ্রীযুক্ত অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি কবিতা আপনারা শুনুন।

সকলেই হাসিয়া উঠিল। এমনভাবে কথা কয়েকটি বলিয়া ফেলিল যেন সে নেহাৎ অভ্যাসবশতঃই বলিয়াছে। অমল পুনরায় বলিল—আপনাদের নির্ব্বাচিত মাননীয় সভাপতির সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, আপনারা এর নিন্দা ক'রবেন না। নিন্দা যিনি ক'রবেন তাঁকে পরশ্রীকাতর বলা হবে—

অপর্ণা বলিল—ভণিতা না ক'রে এখন পড়।

অমল বলিল—আমি সভাপতি, এটা মনে রেখো। বয়স না মানো আমার পদবী মেনে চলো।

অমলের কৃত্রিম ক্রোধই যথেষ্ট উপভোগ্য হইয়াছিল তাই সভাস্থ সকলে করতালি দিয়া তাহাকে অভিনন্দিত করিল। অমল তাহার কবিতা পড়িল—রবীন্দ্রনাথের "পঞ্চ শরে ভস্ম ক'রে করেছ একি সন্ন্যাসী" কবিতার প্যারডি। "বিশ্বময় দিয়েছে তারে ছড়ায়ে" স্থানে "ক'লকাতাময় দিয়েছ তারে ছড়ায়ে" শুনিয়াই সকলে হাসিয়া উঠিল। অমল দৃষ্টির প্রান্তে রমলাকে লক্ষ্য করিল—সে তেমনি নির্ব্বাকভাবে সভার কোণে বসিয়া আছে। সভার এ হাসি উৎসবের অনেক দূরে কোথায় যেন সে বিচরণ করিতেছে। এ সভায় তাহার এই পরাজয় অমলকে আজ কেন যেন ব্যথিত করিয়া তুলিল।

নয়

সভান্তে জলযোগের বন্দোবস্ত ছিল।

ডলিরা বড়লোক। নিজেকে কিছুই তদারক করিতে হয় না, উর্দ্দীপরা বেয়ারারাই পরিবেশন করিতেছিল। অপর্ণা চা'য়ের বাটি হাতে লইয়া ডাকিল—মিস্ মিত্র, অতদূরে কেন? আসুন ভাল করে পরিচয় ক'রে নি। আসুন, আপনি ত ভারি লাজুক।

রমলা অপর্ণার পানে চাহিয়া বলিল—লাজুক দেখলেন কোথায়?

—তবে আসুন।

রমলা উঠিয়া আসিল। অমল ও অপর্ণা যেখানে বসিয়াছিল তাহার সামনে আসিয়া বসিতেই অপর্ণা একটা কাপ তুলিয়া দিয়া বলিল—আসুন, একটু চা আগে হোক।

রমলা চা'র কাপটি হাতে করিয়া বলিল—বলুন—

অপর্ণা সমিতির খাতা বাহির করিয়া বলিল—আপনি ত রেবা বসুর বন্ধু, না?

—হ্যাঁ।

খাতার একটি শূন্য কলমে আঙুল রাখিয়া অপর্ণা বলিল—আপনার বাসার ঠিকানা ত এর মাঝে এন্ট্রি করা হয় নি। বলুন—

যথারীতি নতুন সভ্যার ঠিকানা লেখা হইল। অপর্ণা ফাউনটেন পেনে ক্যাপ লাগাইতে লাগাইতে বলিল—আপনার কবিতাটি বেশ হয়েছে, আশা করি সামনের অধিবেশনেও আপনার একটি কবিতা থাকবে। কথাটা বলিয়া অপর্ণা একটু মৃদু হাসিল—অমল জানে এটা ব্যঙ্গ।

রমলা অপর্ণার মুখের পানে দৃঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিষ্ঠ ভাষায়ই

বলিল—মানুষের অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ করার মাঝে মহানুভবতা নেই, এ কথা আপনিও নিশ্চয়ই জানেন।

অপর্ণা আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—তার মানে? আপনি এটাকে কেন ব্যঙ্গ মনে ক'রছেন জানি না—সেটাও আমার ভাষার অক্ষমতা বলে কি ক্ষমা ক'রতে পারেন না?

রমলা ম্লান হাসিয়া বলিল—ভাষার অক্ষমতা নয় সেটা। আপনাদের মুখ, চোখ, চাপা হাসি সমবেতভাবে আমার অক্ষমতাকে ব্যঙ্গ ক'রেছে, এ কথাটুকু বুঝবার মত বুদ্ধি আমার আছে।

অমল চা'এর কাপ তাড়াতাড়ি নামাইয়া রাখিয়া বলিল—এ কথাটা কি আমার উদ্দেশ্যেও বলা চলে মিস্ মিত্র?

রমলা অপর্ণার পানে চাহিয়াই কহিল—না—অবশ্য যদি আপনার 'চমৎকার' কেবলমাত্র অভিনয়ই না হয়।

অপর্ণার উদ্দেশ্যে অমল কহিল—কবিতা না বুঝে যদি কেউ তাকে ব্যঙ্গ করে তবে তাতে দুঃখিত হওয়ার কিছু নেই, এটা নির্ভয়ে আমি ব'লতে পারি। মিস্ মিত্র এটা আপনি মনে রাখবেন—এখানে যাঁরা আছেন বা আসেন, তাঁরা সকলেই কবিতার উৎকৃষ্ট সমালোচক একথা বলা চলে না—

অপর্ণা অপাঙ্গে অমলকে দেখিয়া লইয়া বলিল—সে গর্ব্ব তোমার মত কেউ করে না।

অমল কহিল—তা নিয়ে তোমার মত ঝগড়াও রোজ রোজ কেউ ক'রে না।

অমলের বলিবার ভঙ্গিতে তাঁহারা তিনজনই হাসিয়া উঠিল। ডলি আসিয়া কহিল—অমলবাবু, চা পেয়েছেন?

—পেয়েছি কিন্তু খেতে পারি নি।

ডলি আতিথেয়তার ত্রুটি হইয়াছে মনে করিয়া প্রশ্ন করিল—কেন কি হ'য়েছে?

—ঝগড়া ক'রতে ক'রতে চা ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আর ঠাণ্ডা চা খাওয়া আমার অভ্যাস নয়।

ডলি হাসিয়া বলিল—ঝগড়া কার সঙ্গে ক'রলেন ?

—আপনাদের মাননীয়া সম্পাদিকা মহাশয়া, তাঁকে কর্ম্মভার দিলে এরকম ঝগড়া অনিবার্য্য।

ডলি বলিল—বেশ, আবার চা দিচ্ছি, আবার ঠাণ্ডা হ'লে, না হয় আবার দেব—

অপর্ণা কহিল—না ডলি, আর দিতে হবে না। অমলের পানে বক্র দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—আর চা খায় না।

অমল হতাশার সুরে হাত দোলাইয়া বলিল—এই দেখুন ঝগড়া কি খাম্‌কা বাধে।

রমলা একটু কটাক্ষের সঙ্গেই বলিল—এ শাসন না মেনে ত পারবেন না, কেন আর পৌরুষ দেখাবার বৃথা চেষ্টা !

—অর্থাৎ ?

রমলা হাসিয়া জবাব দিল—অর্থাৎ আদেশ।

অপর্ণাকে অমল বলিল—আমাকে আদেশ দেওয়ার ধৃষ্টতা তোমার থাকা উচিত নয়।

অপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—নেই, ওঠো। রাত্তির হ'লো, আমাকে পৌঁছে দিয়ে তুমি বাসায় যাবে। আর মা তোমাকে যেতে বলেছেন।

ডলি চা লইয়া আসিয়া বলিল—কই, অমলবাবু এর মধ্যে চ'ল্‌লেন ?

—হ্যাঁ।

—এ কি অপর্ণাদি ! জানি আপনি ব'ল্‌লে অমলবাবুর থাক্‌বার সাধ্যি নেই, কিন্তু একটু পরে গেলে ক্ষতি কি ?

অপর্ণা এ খোঁচায় চটিয়া গিয়াছিল, বলিল—কেন, ও কি আমার বাহন নাকি ?

ডলি বলিল—বাহন বলা ঠিক হবে না, তবে—

অমল কহিল—বাড়ীতে পেয়ে আমাকে অপমান না ক'রলেও পারতেন মিস্ মিত্র। কথাগুলো আমার পক্ষে খুব শ্রুতিসুখকর হ'চ্ছে না!

ডলি তবুও বলিল—অপর্ণাদির বাহন হওয়া পরম সৌভাগ্যের কথা। একথা আপনার জানা উচিত।

অমল বলিল—পুরুষ মানুষ হ'লেই কেবল বুঝ্তেন সেটা কত বড় দুর্ভাগ্য এবং অপমানকর।

অপর্ণা একটু তিক্তকণ্ঠেই বলিল—সৌভাগ্যই হোক, আর দুর্ভাগ্যই হোক, এ নিয়ে আলোচনা করাটা আমার কাছে খুব সুরুচির পরিচয় বলে মনে হয় না।

ট্রামে উঠিয়া অপর্ণা চাহিয়া দেখিল, সেখানা প্রায় জনহীন। সে নির্ভয়ে জিজ্ঞাসা করিল—একটা সত্যি কথা ব'লবে?

—কেন ব'লবো না? মিথ্যে কথা বলা আমার অভ্যাস নয়।

—তুমি রমলা মিত্রকে আগে থাক্তে চিন্তে?

—হ্যাঁ চিন্তুম।

—তবে আজ সভা-ক্ষেত্রে সে কথা স্বীকার ক'রলে না কেন?

—ও করে নি তাই। এর মাঝে ওর হয়ত কোন উদ্দেশ্য আছে।

—কি ক'রে তোমার সঙ্গে পরিচয়?

—তোমার সঙ্গে কেমন ক'রে পরিচয়—এর কোন জবাব হয়? কোনও সূত্রে দেখা হ'য়েছে; আলাপ হ'য়েছে এই পর্য্যন্ত। এখনও এত আলাপ হয়নি যে সর্ব্বত্রই তাকে চেনা দরকার। সে যদি আমাকে চিনতো আমিও পুরাতন পরিচয় স্বীকার ক'রে নিতাম।

অপর্ণা কোন কথা কহিল না। অনেকক্ষণ পরে একটু চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—কি যেন একটা কথা তুমি গোপন ক'রলে—যাক তা আমি শুনতে চাই না, তবে এটা আমি বুঝেছি যে তোমার নিশ্চয়ই কোথায়ও ওকে কেন্দ্র ক'রে দুর্ব্বলতা আছে।

—যদি কোন কিছু গোপনই ক'রে থাকি তবে তাকে গোপনই থাকতে দাও! এ সন্দেহ যে তোমার কেন হ'ল জানি না, তবে ভবিষ্যতে একদিন তোমার সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেব, আজ নয়। তোমার মা কি সত্যই ডেকেছেন?

—হ্যাঁ।

—কেন?

—জানি না, সম্ভবতঃ তোমার কাছে আমার বিয়ে সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন ক'রবেন। তাঁর ধারণা তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হ'লে আমি বেশ সুখী হব।

—সে সংবাদ আমার চেয়ে তুমিই বেশী সঠিকভাবে দিতে পারবে আশা করি। তুমিই তাঁকে সব জানিয়ে দিও। আমার সঙ্গে এ আলোচনার কোন প্রয়োজনই দেখি না।

অপর্ণা বলিল—আমার মতামত যে তোমার চেয়ে আমিই ভাল জানাতে পারবো এ কথা আমি জানি, কিন্তু তোমার মতামতটা ত আমি জানাতে পারবো না।

—বলা বাহুল্য মাত্র—তবে আমরা একমত হ'য়ে যদি তাঁকে আমাদের যুগ্ম মত জানাই তবে সেইটেই ভাল হয়না কি?

—ভাল হয় সন্দেহ নেই, তবে সেটা কি তুমি আমাকে জানাবে? জানাতে পারবে?

অমল বলিল—অবশ্যই পারবো, তোমার মতটা পাওয়া যাবে ত?

—তাও যাবে।

—তবে চল পার্কে নেমে, সভার অধিবেশনে আমাদের প্রস্তাব পাশ ক'রে নিয়ে, পরে উপরে পেশ ক'রবো।

—চল।

পার্কে প্রবেশ করিয়া অমল প্রথম আকাশের পানে চাহিয়া দেখিল—দূরে চারতলা বাড়ীর পরে আকাশের গায়ে একটা ঝাক্‌ড়া নারিকেল গাছের মাথা জ্যোৎস্নাস্নাত উজ্জ্বল আকাশের পটভূমিকার সাম্‌নে চীনে কালো রংএর মত নিবিড় কালো হইয়া রহিয়াছে। তার মাথার উপরে এক ফালি চাঁদ শূন্য পার্কের পানে চাহিয়া আছে। অমলের কবিপ্রাণ সহসা যেন নূতন পুলকে শিহরিয়া উঠিল। বলিল—এস এখানে ঘাসের উপরেই বসি অপর্ণা।

দুইজনে বসিয়া পড়িল। অমল জ্যোৎস্নাস্নাত অপর্ণার মুখের দিকে লুব্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—তোমাকে কি সুন্দর দেখাচ্ছে আজ?

—আজ? হঠাৎ—

—হঠাৎ-ই, এত সুন্দর তোমাকে কোনদিন দেখিনি—এই পরিবেশ, এই জ্যোৎস্না রাত, এর মাঝে তোমার দেহশ্রী মাদকতাময়, মোহময় হ'য়ে উঠেছে। অমল আস্তে অপর্ণার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া বলিল—তোমার মতটা তা হ'লে ব'লো—

অপর্ণা বলিল—কোন ইতিহাসে কোন পুরাণে কোনদিন শুনেছ যে মেয়েদের মনের কথা পাওয়া যায়—আর পাওয়া গেলে পুরুষের আগে পাওয়া যায়! এই বুঝি তোমার মনস্তত্ত্বের জ্ঞান!

—জ্ঞান আমার ক্রমেই সংকীর্ণ হয়ে আস্‌ছে, সেটা বুঝেছি। তাহ'লে আমার কথা কয়েকটিই বল্‌তে হবে?

—হ্যাঁ, কিন্তু রমলার সঙ্গে পরিচয় প্রসঙ্গে যে কথাটা গোপন ক'রেছ সেটা আগে বলতে হবে।

অমল মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল, বলিল—ব'লবো, তবে সেটা শুনবার পরে আর আমার মতামত দেওয়ার প্রয়োজন হবে না মনে করি।

অপর্ণা অকস্মাৎ যেন কিসের শঙ্কায় ব্যাকুলভাবে শেষ রাত্রির পাণ্ডুর চাঁদের মত অমলের মুখের দিকে চাহিল। একটু পরে অমলের চোখের দিকে চাহিয়া বলিল—বল, প্রয়োজন অপ্রয়োজন সে বিচার আমার।

—আমাদের সমিতিতে এত লোক থাক্‌তে মানে এত মেয়ে থাক্‌তে কেবলমাত্র রমলার সম্বন্ধে তোমার এত কৌতূহল কেন ব'ল্‌তে পারো।

—পারি, রমলা আজ সভার মাঝে বার বার কেবল তোমাকেই ও সঙ্গে সঙ্গে আমাকে লক্ষ্য করছিল এবং আমিও সেজন্য লক্ষ্য করেছিলাম। তার চাহনি দেখে আমি বুঝেছি, সে তোমাকে ভালবাসে এবং তোমাদের মাঝে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। তোমার কবিতা প'ড়বার সময় সেটা আরও ভাল ক'রে বুঝেছি।

—শেষেরটা ভুল না হ'লেও প্রথমটা ভুল—অর্থাৎ ভালবাসার কথাটা।

—আমাদের চোখে তোমরা ধুলো দিতে পারো কিন্তু মেয়েরা পারে না।

—পারে, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণই এই।

—আমি বিশ্বাস ক'রলুম না। তার পরে বল—

অমল একটা সিগারেট ধরাইয়া বলিল—মার্জ্জনা ক'রো, সিগারেট খাই তা জানো। তুমি ও তোমার মা উভয়েই প্রশ্ন ক'রেছ—তথা অনুমান ক'রে নিয়েছ যে আমার দেশে জমিদারী আছে। তার টাকা প্রতি মাসে আসে এবং আমি আনন্দে তাই খরচ করি আর পড়ি—কিন্তু ব্যাপারটা

ঠিক তেমন সরল নয়। আমি এ কথা স্বীকার করিনি এবং প্রতিবাদও করিনি, কাজেই তোমাদের ধারণা হ'য়েছে জমিদারী আছে। আমি যেমন মিথ্যা বলিনি, তেমনি তোমাদের কল্পনাকেও আমি ভাঙ্গি নি। এর কারণ এই নয় যে আমি আমার দারিদ্র্যের জন্য লজ্জিত, কোন দিন নিজের অবস্থা নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন হয়নি তাই। এখানে আমি ছাত্র পড়িয়ে, বেনামে চুরি করা উপন্যাস লিখে আমার খরচ চালাই এবং বাড়ীতে কয়েক বিঘা পৈতৃক জমি আছে তার ফসলে বিধবা মায়ের একবেলার হবিষ্যান্ন কোনমতে চলে। সংসারে আমি আর মা, এ ছাড়া কেউ নেই। বি-এ পড়া পর্য্যন্ত মামা ও দুই একজন আত্মীয় ফি দেওয়ার সময় কিছু সাহায্য ক'রেছেন এইমাত্র। আর রমলা হ'চ্ছে আমার বর্ত্তমান ছাত্রের দিদি। সেখানে পড়িয়ে আমি মাসিক ১৫৲ টাকা অর্জ্জন করি, তার সঙ্গে আমার প্রভু-ভৃত্য সম্পর্ক, সেখানে তোমার অনুমান অর্থাৎ ভালবাসা একেবারেই অসম্ভব। এবার সম্ভবতঃ বুঝেছ ?

—হাঁ, কিন্তু রমলার সঙ্গে কি তোমার এইটুকু পরিচয় মাত্র ?

—না, আর একটু। ও কবিতা লেখে এবং তার অহঙ্কার করে, এ কথা প্রথমদিনেই ও জানিয়ে দেয়, তাই আমিও কবিতা বুঝিনা এবং অঙ্ক-শাস্ত্রে এম্-এ পড়ি এই ভাণ ক'রে এতদিন অভিনয় করেছি। সভায় অকস্মাৎ আমার অন্য পরিচয় পেয়ে ও হয়ত অবাক্ হ'য়েছে, হয়ত ভেবেছে আমি বড্ডো চালিয়াৎ—অন্ততঃ মিথ্যাবাদী ব'ললে আমার অস্বীকার করার উপায় নেই। ও আমার নাম দিয়েছে কাপালিক।

অপর্ণা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল—কাপালিক ! নিখুঁৎ নামটি !

—সম্ভব ! কিন্তু এখন কি আর তোমার বিবাহ সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার মতামতের কোন প্রয়োজন আছে ?

অপর্ণা মুখ নীচু করিয়া কহিল—কেন নেই ?

—আমি গরীব, একথা শুনলে। এখনও কি তুমি আমার মত

ছেলেকে বিয়ে করতে প্রস্তুত আছ। সম্ভবতঃ নেই, কাজেই তোমার একার মত জানালেই তোমার মা স্পষ্ট বুঝতে পারবেন—

অপর্ণা সহসা কোন জবাব দিল না। কিছুক্ষণ কি যেন ভাবিল, তার পরে মুখ তুলিয়া বলিল—তুমি কি মনে কর, আমরা তথাকথিত শিক্ষা পেয়েছি এবং কতকটা স্বাধীনভাবে ক'লকাতা সহরের বুকে চলাফেরা করি বলেই আমাদের বিয়ে ব্যাপারে একমাত্র আমার মতামতই গ্রাহ্য হবে! তা নয়—মা বাবার মতকে উপেক্ষা করার শিক্ষা এখনও পর্য্যন্ত পাইনি আমরা—

অমল বলিল—তুমি যাকে ইচ্ছে বিয়ে ক'রতে পারো, তবে তোমার বক্তব্য মা বাবার জবানিতে বলে নিজেকে ছোট ক'রো না। শ'র সুপারম্যান পড়েছ—এর পরেও কি মা বাবার উপরে নিজের মতামত চাপাতে চাও?

অপর্ণা বলিল—তুমি হঠাৎ অমন মরিয়া হ'য়ে আমাকে আঘাত ক'রছো কেন? তোমার দারিদ্র্য নিয়ে আমি ব্যঙ্গ ক'রবো এ ধারণাই বা তোমার হ'ল কেমন ক'রে? তুমি এটুকু অন্ততঃ মনে রেখো যে মোটর, টেলিফোন, রেডিওকেই আমি জীবনের মাপকাঠি করিনি, সংসারে নিজের পায়ে ভর দিয়ে, দারিদ্র্যের সঙ্গে যুদ্ধ ক'রবার ক্ষমতা আমার আছে। প্রমাণ হয়নি বটে, তবে সময় এলে প্রমাণ হবে।

অমল সহসা কহিল—চল তোমার মার কাছে সমস্ত বলে আসি, এটা তার মতামত ঠিক ক'রতে সহায়তা ক'রবে।

অপর্ণা তাড়াতাড়ি বলিল—না, তোমাকে আজ যেতে হবে না! অন্যদিন দেখা ক'রো।

—কেন?

—কারণ আছে, পরে জানাবো।

—তুমি ডেকে এনেছ মনে আছে ?

—আছে আমিই ফিরিয়ে দিচ্ছি, তুমি বাসায় যাও, আমি এটুকু একা একাই যেতে পারবো। চল, তোমাকে ট্রামে তুলে দিয়ে আসি।

অমল কিছু না ভাবিয়াই বলিল—চল।

ট্রামে উঠিয়া অমল একটা মানসিক শূন্যতা অনুভব করিল—বহুদিনের যুদ্ধান্তে আজ যেন সহসা সমস্ত দ্বিধা, সঙ্কোচ মুহূর্ত্তে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। আজ আশা করিবার কিছু নাই, ভয় করিবার কিছু নাই, দুঃখেরও কিছু নাই, অমল তাই জানালার ভিতর মুখ দিয়া কেবল দূরে গড়ের মাঠের নিবিড় পুঞ্জীভূত অন্ধকারের পানে চাহিয়া রহিল।

মানুষ যতদিন বিপদের আশঙ্কা করে, প্রতি পলে প্রতি ক্ষণে সে দ্বিধা শঙ্কায় রুদ্ধশ্বাস হইয়া থাকে—কিন্তু যখন বিপদ আসিয়াই পড়ে তখন রুদ্ধ নিঃশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া সে যেন তৃপ্তি পায়—আজ অমলও তাই একটা তৃপ্তি বোধ করিতেছিল। অপর্ণার কাছে চাহিবার কিছু নাই, বলিবার কিছু নাই, আজ সব সন্দেহের অবসান হইয়াছে। এখন যাহা কিছু করিবার, যাহা কিছু দিবার সবই অপর্ণার। সে যদি কোন দিন ডাকিয়া লয় তবে সেদিন স্বেচ্ছায় সানন্দে সে হাত প্রসারিত করিয়া দিবে।

দশ

অমল খোকাকে পড়াইতেছিল। প্রায় দেড় ঘন্টা হইয়া গিয়াছে—কিন্তু রমলা আজ আসে নাই। খোলা দরজার দিকে চাহিয়া চাহিয়া অমল বৃথাই প্রতীক্ষা করিয়াছে—এখন সে বুঝিয়াছে যে আজ আর সে আসিবে না। তাহার মিথ্যা পরিচয়, সভাগৃহে তাহার ব্যবহার, সমগ্র একত্রিত করিয়া অমল যুক্তি দ্বারা বিচার করিতেছিল—রমলা যদি আজ তাহার পরিচয় অস্বীকার করে তবে তাহাতে তাহাকে দোষ দেওয়া যায় না। তারই ভৃত্য হইয়া সে যে অপমান তাহাকে করিয়াছে, তাহা হয়ত সে ভুলিতে পারে নাই।

অমলের চিন্তাস্রোতকে বাধা দিয়া খোকা কহিল—পড়া হয়ে গেছে মাষ্টারম'শায়, উঠি?

—এ্যাঁ, অংক হয়েছে?

—হ্যাঁ। আপনি একটু বসুন, দিদি ব'লেছে।

—ও আচ্ছা।

অমল অপেক্ষা করিতেছিল।

রমলা সহাস্য মুখে ঘরে প্রবেশ করিয়া কহিল—নমস্কার, কবি অমলবাবু।

অমল প্রতিনমস্কার করিয়া বলিল—বলুন, কোন রকম ব্যঙ্গ বা তিরস্কারেরই আমি প্রত্যুত্তর দেব না প্রতিজ্ঞা ক'রে এসেছি, অতএব আপনি যথেচ্ছ ব্যঙ্গ ক'রতে পারেন।

রমলা খোকার চেয়ারটায় বসিয়া বলিল—আজ অকস্মাৎ একেবারে যুধিষ্ঠির হ'লেন কেন?

—যে কারণে আপনি আমাকে কটূক্তি ক'রবেনই প্রতিজ্ঞা ক'রেছেন।

রমলা তেমনি হাসিয়া বলিল—এ রকম প্রতিজ্ঞা ক'রেছি তা বুঝলেন কি ক'রে ?

অমল বলিল—প্রথম বচনেই বুঝেছি—ওটা মানুষ স্বভাবতঃই বোঝে। যাক্, আপনার প্রশ্ন, ব্যঙ্গ এবং তিরস্কার আরম্ভ করুন। হাড়িকাঠের সামনে দাঁড় করিয়ে রাখবেন না !

— আপনার মাঝে এত দৈন্য, এত বিনয়, একে যে অভিনয় বলে ভ্রম হয়।

—আমার মাঝে ঔদ্ধত্য আছে, একথা অন্ততঃ আপনি বল্‌তে পারেন না।

রমলা পুনরায় হাসিয়া বলিল—না, তা বলা যায় না কিন্তু এতগুলো মিথ্যে কথা আমার কাছে কেন বলেছিলেন ?

— মিথ্যে কথা ! এতগুলো ?

— হ্যাঁ, আপনি অংকশাস্ত্রে এম্-এ পড়েন, কাপালিক, কবিতা বোঝেন না— এ সমস্ত কেন ব'ললেন ?

—কেন বলেছিলুম মনে নেই, তবে বলে বেশ তৃপ্তি পেয়েছিলাম মনে আছে—আর সে দিন নতুন পরিচয় পেয়ে কেমন মজা হ'ল বলুন ত ?

—মজা ! আপনার মাঝে আর একটু লজ্জা আশা করেছিলাম।

—আজ আমার অবস্থা মিথ্যাবাদী রাখালের চেয়েও শোচনীয়। তারপর ?

—সমিতির সভায় আপনি যে আমাকে চিন্‌তে পারলেন না ?

—আপনিও ত আমাকে চেনেন নি ? ভাবলুম আমার সঙ্গে পরিচয় আছে একথা স্বীকার ক'রতে আপনি হয়ত অনিচ্ছুক, তাই আমিও তেমনি ভাবেই চলেছি।

—ও এই মাত্র। যাহোক—আপনি সমস্ত প্রশ্নের উত্তরই বেশ ভেবে চিন্তে এসেছেন দেখছি। আপনি মিথ্যা কথা বলে অভিনয় ক'রেছেন তার জন্যে ধন্যবাদ। আমার ঔদ্ধত্য ও স্পর্দ্ধাকে আপনি বেশ শিক্ষা দিয়েছেন—এটা আমার প্রাপ্য, কাজেই আমার কোন রাগ নেই আপনার উপর। তবে মানুষের অসম্পূর্ণতার প্রতি আপনার সহানুভূতি থাক্‌লে সেটাই কি বেশী মহানুভবতার পরিচয় হ'ত না!···আপনার কাছে আমার লজ্জা নেই, আপনি ত জানতেন আমি নতুন সভ্য হ'য়েছি—

—না, আমাদের সমিতির কথা জানতুম না।

—ইচ্ছা করলে ওই অসম্মানের হাত থেকে আপনি রক্ষা ক'রতে পারতেন। অপর্ণার খাতা'ত আপনি দেখেছেন।

—না, আমি সভায় যাবো তা ঠিক ছিল না, শেষ মুহূর্ত্তে গিয়েছি।

রমলা ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কি যেন ভাবিল, তাহার পর উঠিয়া যাইয়া চাকরকে চা'র তাগাদা করিয়া পুনরায় বসিয়া বলিল—অপর্ণা কে?

অমল অত্যন্ত সংক্ষেপে বলিল—আমাদের সঙ্গে পড়ে।

—আপনি তাঁকে যে 'তুমি' বলেন?

—ব'লতে ব'লতে হ'য়ে গেছে—অমনি অনেক সহপাঠীকেও ত বলি।

—আপনাদের মাঝে খুব···একটু থতমত খাইয়া সে বাক্যটি সম্পূর্ণ করিল—ঘনিষ্ঠতা, না?

—সম্ভব, নইলে আর তুমি ব'লবো কেন। তবে সে ঘনিষ্ঠতার অর্থ আপনি কি করবেন জানি না।

রমলা বলিল—ভয় নেই, আমি কিছু মনে ক'রবো না। তবে সে যে আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করে, আপনার মনে এ-তে বোধ হয় সন্দেহ নেই—

অমল বলিল—আমার মত দরিদ্র কোন ব্যক্তিকে সে যদি আপনার

মনে করে তবে সে তার মহানুভবতা এবং আমার পক্ষে আপনার পরিচয়ের মত তার পরিচয়ও যথেষ্ট গৌরবের।

চা খাইতে খাইতে অমল বলিল—মিস্ মিত্র, একটা জিনিষ কখনও ভুলবেন না। আমি কি এবং আমার কতটুকু এ জগতে প্রাপ্য তা আমি কখনও ভুলি না ; সেদিনও আমি ভুলিনি যে আমি আপনাদের ভৃত্য মাত্র এবং আজও ভুলিনি যে আমি তাই। এই চা, খাবার আপনার পরিচয়, এ সমস্তকেই আমি যথেষ্ট মূল্যবান এবং আপনাদের স্নেহের দান বলে মনে করি—

রমলা বলিল—মানুষ—মেয়েরা কি কেবল অর্থ দিয়েই লোককে বিচার করে। মানুষ হিসাবে তার গুণ, শক্তি, শিক্ষা এগুলো কি বিচার করে না—

—জানি না, তবে এমন সুচারু অভিজ্ঞতা আমার জীবনে হয়নি।

—আপনি বেছে নিতে পারেন নি। নইলে আপনি দেখতে পেতেন মানুষের আভিজাত্যের খোলসের অন্তরালেও তার প্রাণ আছে।

—অবসর ও সুযোগ পেলে দেখ্বো।

—সত্যি ক'রে বলুন—আপনি কেন এতগুলো মিথ্যা পরিচয় আমাকে দিয়েছিলেন ?

—জানি না।

—জানি, আমাকে লাঞ্ছনা দেওয়াই আপনার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু আর কেন ? এতেও কি আপনার হয় নি ?

—আমাকে বৃথা দোষ দেবেন না, মিস্ মিত্র। যা কেবল খেলার ছলে—অমল লজ্জিত হইয়া মাটির দিকেই চাহিয়া ছিল।

—হ্যাঁ, কেবল খেলার ছলেই বটে—তবে তা আজ প্রায় প্রাণঘাতী হ'য়ে উঠেছে, তা বুঝতে পারেন।

অমল রমলার মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া বলিল—আমার

জন্যে জীবনে কেউ কোনরূপ দুঃখ বা কষ্ট পায় তা আমি চাই না। আমার জন্যে যদি কোন কষ্ট পেয়ে থাকেন তবে আমি দুঃখিত এবং মুক্তকণ্ঠে আমার অপরাধ স্বীকার ক'রে ক্ষমা চাইছি।

—ক্ষমা চাইবার কিছু নেই। আমি দুঃখিত ত হইনি, আপনাকে প্রথমে যতখানি অবহেলা হয়ত করেছিলাম আজ যে ততখানি শ্রদ্ধা করি একথা কি আপনি বুঝতে পারেন?

—আমার ভাগ্য।

রমলা টেবিলের উপর বাম হাতের তর্জ্জনীটা কয়েকবার অকারণে বুলাইয়া অমলের মুখের পানে চাহিয়া বলিল—অপর্ণা ও আপনার মাঝে ঘনিষ্ঠতা, তথা ভালবাসা গড়ে উঠেছে এ সংবাদ পেয়ে এবং স্বচক্ষে দেখে আমার যথেষ্ট উপকার হ'য়েছে। আমাদের মাঝে ভালবাসার মত কিছু হয়ত নেই, কিন্তু আমাদের অন্তরেরও একটা মূল্য আছে তা অস্বীকার আপনি ক'রবেন না।

—কোনদিন করিনি।

—কিন্তু আমাদের এই শ্রদ্ধার কি কোন প্রতিদানই নেই?

অমল চমকাইয়া ফিরিয়া রমলার মুখের পানে চাহিল। রমলা কি চাহে? কি সে নানা কথায় জালে জড়াইয়া ব্যক্ত করিতে চাহিতেছে! অমল প্রশ্ন করিল—আমি কি প্রতিদান দিতে পারি? আমি যে অত্যন্ত অক্ষম, সে কথা আপনি ভুললেন কেমন ক'রে?

—অক্ষমতাটা আপনার ত অভিনয়।

—না—আমি গরীব একথা আপনি জানেন।

—জানি, কিন্তু তার চেয়েও অনেক বেশী যে সেদিন জেনে এসেছি। আপনি হয়ত জানেন না যে, আপনি ও আপনার কবিতাই সমিতির সকলের আলোচ্য বিষয়।

—কেমন ক'রে জানি না। সেও হয়ত ব্যঙ্গই—

—না, সেটা appreciation !

অমল সহসা সংশয় অতিক্রম করিতে যাইয়া প্রশ্ন করিল—আপনিও appreciate করেন ?

—হ্যাঁ, এক কথায় গুণমুগ্ধ—রমলা একটু হাসিয়া অমলের মুখের দিকে চাহিল।

—বটে ?

—হ্যাঁ, স্বীকার ক'রতে কুণ্ঠা নেই, কিন্তু আপনি কি মনে করেন আমাকে—

অমল বলিল—আমার মনিব।

—কেবলমাত্র তাই।

অমল লক্ষ্য করিল, শিক্ষাভিমানী উদ্ধত, স্পর্দ্ধিত রমলার দুই চোখের কোণে দুই ফোঁটা জল, ছন্দ-পতনের দৈন্য লইয়া টলমল করিতেছে। রমলা হয়ত তাহাই গোপন করিতে নমস্কার না করিয়াই দ্রুত প্রস্থান করিল। অমল অত্যন্ত ধীরপদক্ষেপে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল।

প্রয়োজন ছিল না এবং মনে মনে অমল সমস্ত প্রয়োজনই শেষ করিয়া ফেলিয়াছিল তাই অপর্ণার সহিত দেখা হওয়া সত্ত্বেও সে কিছু বলে নাই। অত্যন্ত ভাল ছেলের মত ক্লাসের কোণে একাকী বসিয়াছিল। ঝড়ের পরে শান্ত প্রকৃতির মত তার মন আজ কেবল ভিজা ঘাসের গন্ধে রহিয়া রহিয়া একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিতেছে মাত্র। তাহার দারিদ্র্য অপর্ণাকে না হইলেও তাহার মাতা পিতাকে বিমুখ করিবে সন্দেহ নাই, কিন্তু রমলা এত জানিয়াও কেন অশ্রু গোপন করিতে নমস্কার না করিয়াই প্রস্থান করিল ?

সারাটা দিন ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাজিয়া গেল—অনেক ইংরাজ কবি,

নাট্যকারের প্রসঙ্গ ক্লাসে আলোচিত হইল। অনেক লিরিক কবিতার ব্যাখ্যা হইল, অমল স্বপ্নহীন শূন্য অন্তর লইয়া সবই শুনিয়াছে। অপর্ণা কলেজে আসিয়াছে—যে নীল সিল্কের শাড়ীখানা পরিয়া সে একদিন তাহাকে খুসী করিয়াছিল, আজ সে সেইখানাই পুনরায় পরিয়াছে—ইচ্ছাকৃতভাবেই হোক, আর নেহাৎ পর্য্যায়ক্রমেই হোক। নানারূপ কাজ করা ব্লাউসটা আজ শাড়ীর অন্তরাল হইতেও তাহার ঐশ্বর্য্যের ইঙ্গিত করিতেছে।

শেষ ঘণ্টার শেষে, সকলের প্রস্থানের পর অমল ধীরপদক্ষেপে ক্লাস হইতে বাহির হইতেছিল। ভাবিয়াছিল সম্মুখের পথ নিশ্চয়ই জনশূন্য, কিন্তু অকস্মাৎ সে আবিষ্কার করিল, অপর্ণা দরজার পাশে দাঁড়াইয়া আছে! অমলের সঙ্গে দেখা হইতেই বলিল—তোমার কি হ'য়েছে বল ত?

অমল ম্লান হাসিয়া বলিল—কি আবার হবে!

—তুমি বড্ডো সেণ্টিমেণ্টাল। তোমাকে ত আজ বাড়ীতেও নিয়ে যেতে সাহস হ'চ্ছে না।

—কেন?

—কি জানি, যেয়ে হয়ত মার কাছে সবিস্তারে এবং অতিরঞ্জিত ক'রে তোমার দারিদ্র্যের বর্ণনা ক'রবে। তোমার ত আর জ্ঞান কাণ্ড কিছু থাকবে না।

অমল হাসিল। অপর্ণা বলিল—হাসির কথা নয়—সেদিন সেই ভয়েই তোমাকে নিয়ে যাই নি, তুমি হয়ত খুব অপমানিত হ'য়ে অভিমান ক'রে এসেছ?

অমল বিস্মিত আঁখি মেলিয়া শুধু কহিল—অভিমান?

অপর্ণা বলিল—হ্যাঁ, নিজের মনের অন্তরালে ত কিছু নেই। অভিমান ক'রেছ—ভয় নেই অতটুকু দাবী তোমার আছে আমার উপর। চল, কোথায় যাবে—

অমল ব্যঙ্গ করিল—তোমাদের বাড়ীতে ত আর যাওয়া হবে না।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আর নয় আজ। খোঁচা তুমি যতই দাও—আজ আর কিছু ব'লবো না।

অমল অপর্ণার মুখের দিকে ঋজু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল—অনেকক্ষণ। প্রগল্‌ভ অপর্ণার মুখে আজ ভয় ও সহানুভূতির প্রলেপ স্পষ্ট ফুটিয়া উঠিয়াছে। সে কহিল—চল, কোথায় যাবে?

—চা খেয়েছ?

—না।

—তবে চল, চা খেয়েই বেরুই! যেখানে হয় নামলেই হবে।

কোনরূপ সিভলরি না দেখাইয়া অপর্ণার পয়সায়ই সে চা খাইয়া আসিল এবং তাহারই পয়সায় গড়ের মাঠে আসিয়া বৃক্ষের ছায়ায় বসিয়া পড়িল।

অপর্ণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—সেদিন তুমি খুব দুঃখিত হ'য়েছিলে?

—না। আমি জানি, আমার দারিদ্র্যকে তুমি তোমার মার কাছে গোপন ক'রতে চাও, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। ধর, যদি তুমি আমাকে বিবাহ ক'রতেও প্রস্তুত থাকো তাহ'লেও মা বাপের অমতে এ দারিদ্র্যকে তুমি ইচ্ছা সত্বেও গ্রহণ ক'রতে পারবে না—সে কথাও আমি জানি; তবে তোমার এই পরিচয়, এই ঘনিষ্ঠতা সম্ভবতঃ ভালবাসা—আমার চিরদিন স্মরণ থাক্‌বে। তোমাদের মত শিক্ষিতা যারা তাদের সঙ্গে মিশিবার যথেষ্ট সুযোগ আমার জীবনে হয় নি—তুমি আমার প্রথম পরিচয়। জানি না কেন যেদিন প্রথম তোমাকে দেখেছিলাম সেই দিন থেকেই ভাল লেগেছে—লাইব্রেরীতে পড়ার ফাঁকে ফাঁকে কেবল তোমাকেই দেখতাম। আজ এ দৈন্য প্রকাশ ক'রতে বাধা নেই, যখন সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষা আজ নিঃশেষে নির্মূল হ'য়ে গেছে—

আর-বলা-যায়-না এমনি ভাবে যেন অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠেই অমল থামিয়া গেল। অপর্ণা অমলের মুখের দিকে চাহিয়া ছিল—সুদূরপ্রসারী তার দৃষ্টি ও এই স্বীকারোক্তিতে তাহার অন্তর করুণায় আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল। বার বার তাহার কাছে পরাজিত হইয়া সে আনন্দিত হইয়াছে, কিন্তু আজ অমলের এমনি পরাজয় তাহাকে ব্যথিত করিল। জীবনের একটা পরাজয় কি একটা ব্যর্থতাই মানুষকে ব্যথিত করিতে পারে না, যখন গগনবিহারী সগর্ব্ব অন্তর বেদনায় ভাঙিয়া পড়ে তখনই তাহা করুণা জাগায়; গিরিচূড়ার পতনের মত বিপুল তাহার এই পরাজয়, বিরাট তাহার পতন। অপর্ণার বিলোল আঁখিপল্লব অশ্রুসিক্ত হইয়া আসিয়াছিল। সে অমলের হাতখানাকে সস্নেহে আকর্ষণ করিয়া অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে কহিল—অমল, তুমি দুঃখ ক'রো না। তোমার দারিদ্র্যকে আমি ভয় করি, আমি ঘৃণা করি এ ভেবে আমাকে অসম্মান ক'রো না। আমার অন্তরও আজ উচ্চকণ্ঠে তোমার মতই ব'লতে পারে, তোমার পরিচয় আমার জীবনে চিরস্মরণীয় হ'য়ে থাক্‌বে; কিন্তু বাপ মা তারা মনের কোন মূল্যই দেয় না, তারা দেখে সম্পদ—যা দেহের স্বাচ্ছন্দ্য দিলেও মনের শান্তি আনে না— আমরা নিরুপায়ের মত বাপমায়ের ইচ্ছায়ই চলি—

অপর্ণাও থামিয়া গেল—যাহা অন্তরের মাঝে আজ উদ্বেলিত হইয়া উঠিয়াছে তাহা ব্যক্ত করিবার ভাষা নাই, কণ্ঠ নাই। দুইজনে মুখোমুখি নির্ব্বাক—দুইটি ঝটিকা-বিক্ষুব্ধ বিরাট তরঙ্গ যেন অকস্মাৎ মন্ত্রমুগ্ধের মত থামিয়া গিয়াছে।

অদূরে ঘর্ঘর শব্দে অজ্ঞাত কত যাত্রী বহন করিয়া ট্রাম চলিয়া গেল—দুইটি তন্দ্রাচ্ছন্ন মনের মাঝে কোনও পরিবর্ত্তন আসিল না, একটা শুক্‌নো পাতা উড়িয়া আসিয়া অপর্ণার কোলের কাছে পড়িল!

অমল হাসিল। অপর্ণা প্রশ্ন করিল—হাসলে কেন?

—ছিন্নপত্রের মত আমরা যদি অতীতকে ফেলে দিতে পারতাম।

ক্ষণিক দুইজনেই আবার চুপ করিয়া রহিল।

অমল অকস্মাৎ অত্যন্ত নগ্ন প্রশ্ন করিল—তুমি কি আমাকে বিয়ে ক'রতে পারো ?

অপর্ণা কোনরকম আশ্চর্য্য না হইয়া, ম্লান একটু হাসিয়া বলিল—তুমিই বল, হিন্দুর মেয়ে আমার পক্ষে কি একথা স্বীকার করা উচিত ?

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—থাক্, শুনেও লাভ নেই।

অপর্ণা অমলের মুখের পানে চাহিয়া চাহিয়া কি যেন দেখিতেছিল, অনেক ভাবিয়া বলিল—তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ রইল।

—বল—

—বন্ধ ত হ'য়ে এল, বাড়ী যাবে নিশ্চয়ই।

—হ্যাঁ।

—যাবার আগে আমাদের বাড়ীতে একবার যেও—কিন্তু প্রতিজ্ঞা কর যে মার কাছে এ সব ব'ল্বে না।

—বেশ, তাই হবে। কিন্তু অপর্ণা, বিদায়কে দীর্ঘ ক'রে লাভ নেই। জানি আমাকে রিক্তহস্তে কেবলমাত্র বেদনা নিয়েই ফিরে আসতে হবে; তার জন্যে দীর্ঘকাল অপেক্ষা করা সবচেয়ে বড় বিড়ম্বনা।

অপর্ণা বলিল—তাই হোক্—জীবনে বিড়ম্বনার অন্ত নেই, এটা না হয় আর একটা বাড়লো—

—বেশ তাই হোক্।

এগার

কলেজ বন্ধ হইয়া গিয়াছে—

কিন্তু অমলের যাওয়া হয় নাই। রমলা ও তাহার ভ্রাতা প্রভৃতি পশ্চিমে চলিয়া গেলে তবে অমলের ছুটি। রমলার পিতা সন্ধ্যার সময়ে নিয়মিতভাবে অনুপস্থিত থাকিতেন কাজেই রমলা পরোক্ষ ভাবে খোকার অভিভাবক হইয়া উঠিয়াছিল। সেদিন পড়াইবার সময়ে রমলা আসিয়া বলিল—আমাদের পুরী যাওয়া ঠিক হয়ে গেছে। পরশু রওনা দেব সকলে।

এই নিষ্কর্মা দিনগুলি ও টিউসনি অমলের কাছে অত্যন্ত পীড়াদায়ক হইয়া উঠিয়াছিল, তাই একটা স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্বাস ফেলিয়া সে বলিল—বেশ ত, সকলেই যাচ্ছেন ত ?

রমলা বলিল—হ্যাঁ—কিন্তু আপনার কথার ভাব দেখে মনে হচ্ছে আমরা গেলেই যেন আপনি বাঁচেন।

অমল হাসিয়া বলিল—কথাটার কদর্থ ক'রলে ও রকম বলা যায়, কিন্তু ছুটি পেয়ে বাড়ীতে মার কাছে যাবো এটাও ত আনন্দের। সেটা আপনার কেন মনে হ'ল না ?

—ও, সেটা মনের বিকার, স্বীকার ক'রতে লজ্জা নেই। কিন্তু বাবা বলেছেন, আপনিও আপনার পুঁথিপত্র ও কবিতার খাতা নিয়ে আমাদের সংগে চলুন। পঠন-পাঠন চ'লবে আর অবসর সময়ে সমুদ্র তীরে আমরা ঘুরে ঘুরে কাব্য চর্চা ক'রবো—

অমল বলিল—ব্যাপারটা লোভনীয়—অত্যন্ত লোভনীয় ; কিন্তু মা যে আমারই পথ চেয়ে চেয়ে দীর্ঘদিন অতিবাহিত ক'রছে সেটার কি করা

যায়? আমরা ত কেবল আমাদের জন্যেই নয়, অন্যকে সুখী করাও আমাদের জীবনের একটা অনিবার্য্য অঙ্গ।

রমলা কৃত্রিম বিস্ময়ে চোখ দুইটি বিস্ফারিত করিয়া এবং সঙ্গে সঙ্গে অত্যন্ত বিলোল নারীসুলভ আঁখি ভঙ্গির সঙ্গে বলিল—আপনার মুখে এমন রাম নাম। পরের জন্যে ভাবনা, তার সুখ দুঃখের সঙ্গে এমন অনিবার্য্য আঙ্গিক ভাব এটা কি আপনার মত লোকের যোগ্য স্বীকারোক্তি হ'য়েছে—

অমল একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিল—অপরাধ নেবেন না। আপনার তিরস্কারের প্রবৃত্তিকে আমি প্রশংসা ক'রতে পারছি না। আমার দ্বারা যা সম্ভব তা ক'রতে আমি কার্পণ্য কোন দিন করি না। পুরী গেলে কে কতটা সুখী হবে জানি না, তবে বাড়ী গেলে মা যে খুব সুখী হ'বে এটা জানি—এবং—

রমলা বাধা দিয়া বলিল—পুরী গেলেও ত দু'একজন নগণ্য ব্যক্তি খুসী হ'তে পারে। তারাও হয়ত আপনার মায়ের মত দীর্ঘ দিন প্রতীক্ষা ক'রে আছে—

অমল দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—আপনি জানেন না, কেমন ক'রে আমসত্ব, আচার, আমসি শাক কলা মুলো খুঁটে খুঁটে সঞ্চিত ক'রে রেখে মা প্রবাসী ছেলের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষা করে—সে আগ্রহ, সে ব্যাকুল প্রতীক্ষার কোন তুলনা নেই। যত বড় প্রলোভনই থাক্, এই দুঃস্থ মায়ের নিঃস্বার্থ ত্যাগ ও স্নেহের মর্য্যাদাকে ক্ষুণ্ণ ক'রার মত হৃদয়হীন আমি হ'তে পারি নি। তার যে কোন কদর্থের জন্য আমি প্রস্তুত আছি কিন্তু—

রমলা কহিল—আপনার এই মাতৃভক্তি ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠার আন্তরিক প্রশংসা করি, কিন্তু তারপরে কি আর কারও দাবী নেই—বন্ধটাকে ভাগ ক'রে কর্ত্তব্য-নিষ্ঠা দেখবার মত?

—এখনও তেমন কোন দাবী উপস্থিত হয় নি—আর সেটা মায়ের পরেই—

রমলা কি যেন একটু ভাবিয়া বলিল—আজ অপর্ণা যদি এমনি নিমন্ত্রণ ক'রতো তবে কি এই উত্তরই দিতেন ?

অমল অত্যন্ত কঠিনকণ্ঠে জবাব দিল—অপর্ণা কেন, পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সুন্দরীও যদি আজ এমনি ব'লতো, কি গ্রেটা গার্ব্বোও যদি সম্পদ ও রূপের ভার নিয়ে আস্‌তো তবে তাকেও এই জবাবই দিতাম—অত্যন্ত নির্ভীক ভাবেই।

রমলা চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আপনার কথার উত্তর দেওয়া সম্ভব নয় তবে শুনে সুখী হ'লাম। আপনার মা এ দিক থেকে ভাগ্যবতী—

অমল কহিল—আমার মত দুর্ভাগ্য-সন্তানের মাতা বলে ?

—দুর্ভাগ্য নয়, মাতৃভক্ত সন্তানের মা বলে।

রমলারা পুরী যাইবার পরে কয়েকদিন শূন্য রাজপথে ও অর্দ্ধশূন্য লাইব্রেরী কক্ষে অকারণ ঘুরিয়া ঘুরিয়া অমল বাড়ী যাইবার দিনস্থির করিয়া ফেলিল। কাল সে যাইবে, অতএব অপর্ণার অনুরোধ মত যদি তাহাকে দেখা করিতে হয়, তবে আজই সেখানে যাওয়া প্রয়োজন। অপর্ণাদের বাড়ীতে যাইবার জন্য আগে যেমন সে একটা দুর্দ্দমনীয় আকর্ষণ অনুভব করিত আজ সে ঠিক তেমনি একটা শূন্যতা অনুভব করে, বার বার মনের মাঝে কাতরকণ্ঠে কে যেন আর্ত্তনাদ করে—লাভ নাই, কোন লাভ নাই, সবই ব্যর্থ হইয়া গিয়াছে।

তবুও যাইতেই হইবে, দুঃখ হোক্ তবুও তাহাই আজ দুর্নিবার আকর্ষণে তাহাকে ডাকিয়া যায়। অমল ট্রামে উঠিয়া কেবল তাহাই ভাবিতেছিল। এই অপর্ণা দু'টি দিনের জন্যে তাহার অন্তরকে আলোকে উদ্ভাসিত

করিয়া চির অন্ধকারে অবলুপ্ত করিয়া দিয়াছে—সে যদি তাহাকে ভুলিতে না পারে তবে জীবনের প্রতিক্ষণে সে কেবল আহত স্বরবিদ্ধ বিহঙ্গের মত একান্ত নিরালায়, অপরিসীম বেদনায় ছট্‌ফট্‌ করিবে—উল্কা দহনের আলোকে অকস্মাৎ অন্তরাকাশ আলোকিত হইয়া চিরতরে চির অন্ধকারে বিলীন হইয়া গিয়াছে, অন্ধের মত সে কেবল পথ হাতড়াইয়া ফিরিবে !

অপর্ণাদের বাড়ীর ঠিক সামনেই নতুন একখানা গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল—গেটটিকে প্রায় অবরুদ্ধ করিয়া। অমল সেটাকে লক্ষ্য না করিয়াই পাশ কাটাইয়া বাড়ীর ভিতরে ঢুকিল। বাহিরের ঘরের কলকণ্ঠ অনেক লোকের অবস্থিতি নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অমল কোন কিছুকেই মনে না করিয়া সোজা ঘরের দ্বারে উপস্থিত হইল। গৃহে অপর্ণার মাতা, অপর্ণা, তার বোন এবং আর একটি ভদ্রলোক—অপরিচিত।

অপর্ণার মাতাই ডাকিল—এসো বাবা অমল, অনেক দিন আসো নি।

অপর্ণা একটু স্মিতহাস্যে তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—ব'সো, অমন ঝড়ো কাকের মত চেহারা হ'য়েছে কেন ? অসুখ ক'রেছে ?

অমল সংক্ষেপে 'না' বলিয়া একটা খালি চেয়ারে বসিয়া পড়িল। মাতা পরিচয় করিয়া দিলেন, এই অপরিচিত ভদ্রলোক অজিতবাবু। অমল নমস্কার করিল। অজিতবাবু একটু পিঠ চাপড়াইবার ভঙ্গিতে হাসিয়া বলিলেন—ও অমলবাবু, নমস্কার। মিস্‌ রয়এর মুখে শুনেছি—আপনি কবি এবং ফার্ষ্ট হবার চান্স আপনারই—না !

অমল হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—এ সব মিস্‌ 'রয়ে'র অনুমান—তাই আপনাকে হয়ত জানিয়েছেন। আপনি বিশ্বাস ক'রলে ঠক্‌তে হবে।

অজিতবাবু অকারণে ক্ষণিক হাসিয়া বলিলেন—আমারই মত, এক্‌জামিনে ভাল রেজাল্ট ক'রতে পারলুম না কক্ষণও। তাই বিলেত থেকেঃকেবল ব্যারিষ্টারী ডিগ্রিই নিয়ে এলাম।

অমল একটু হাসিয়া কহিল—কম কি ? এইত প্রচুর বিদ্যা আয়ত্ত ক'রেছেন।

কথাটার মধ্যে যে একটু ব্যঙ্গ ছিল তাহা অপর্ণা লক্ষ্য করিয়াছিল, কিন্তু অজিতবাবু প্রশংসাবাদ মনে করিয়া হয়ত খুসী হইয়াছিলেন তাই হাসিলেন মাত্র।

অনেকক্ষণ অবান্তর আলাপের পর অজিতবাবু উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন—মিস্ রয়, তাহ'লে গাড়ীটা নিয়ে কি আজ ফিরেই যাবো। ভেবেছিলুম আপনাকে নিয়েই একটু চালিয়ে আসবো।

অপর্ণা যেন একটু বিব্রত হইয়া মায়ের দিকে চাহিল। মাতা বলিলেন—আচ্ছা আজ থাক, অমল বহুদিন পরে এসেছে—হয়ত দেশে চলে যাবে। তখন ত—

—হ্যাঁ, সেই ভাল। আচ্ছা আসি, নমস্কার, মিস্ রয় নমস্কার।

অজিতবাবু বাহির হইয়া গেলেন, ক্ষণকাল পরেই তীব্র ইলেক্‌ট্রিক হর্ণের আওয়াজ তাহার প্রস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিল। অপর্ণা যেন একটা চাপা নিশ্বাসে অস্বস্তিকে মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—দেশে যাবে কবে ?

অমল বিমনা ভাবেই উত্তর দিল—কাল।

—ও তাই বুঝি, দেখা ক'রতে এলে ? এতদিন এসো নি কেন ? আর শরীর খারাপ হ'য়েছে কেন ?

অমল শেষ প্রশ্নের জবাব দিল আগে—শরীর কিছু খারাপ হয় নি—অসুখ ত নয়ই, তবে ঘুমিয়ে উঠে এসেছি তাই একটু উস্কখুস্ক দেখাতে পারে বটে। এতদিন আসি নি তার কারণ কিছু নেই, আসা হয় নি।

মাতা বলিলেন—অপর্ণা একটু চা নিয়ে এসো ; অপর্ণা জানিত তাহার মাতা তাহার অনুপস্থিতিই চাহিতেছেন তাই দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেল। মাতা পুনরায় প্রশ্ন করিলেন—কালই যাবে বাবা !

—হ্যাঁ, কালই। মা বার বার লিখেছেন।

—যে ছেলেটি এসেছিল তার সঙ্গে অপর্ণার বিয়ে হ'লে কেমন হয় বল ত ? ছেলেটি তোমার পছন্দ হয় ?

অমল একটু হাসিয়া বলিল—এ সম্পর্কে আমার মতামত, পছন্দ অপছন্দের কি মূল্য আছে ? অপর্ণাই এ সম্বন্ধে সব চেয়ে ভাল জানাতে পারবে—

—তোমরা দু'টিতে যেমন মেলামেশা ক'রেছ, তাতে ত তুমি অনেকটা বুঝ্‌তে পারো। আর তোমারও হয়ত এ সম্বন্ধে ব'লবার কিছু থাক্‌তে পারে—

অমল অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে ঋজু দৃষ্টিতে মাতার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—অপর্ণা এম্‌-এ পড়ছে, বড় হ'য়েছে ; শুধু তাই নয় নিজের ভাল মন্দ সে ভালই বোঝে, এ ক্ষেত্রে আমার যদি ব'লবার কিছু থাকেই তবে তার পরিণতি একমাত্র তার উপরই নির্ভর করে। তাকে প্রশ্ন ক'রলেই সে খাঁটি জবাব দিতে পারবে—

অপর্ণা চা লইয়া ফিরিল এবং প্রসঙ্গটা আপনা হইতেই বন্ধ হইয়া গেল। অপর্ণা কি যেন একটা অনুমান করিয়া বলিল—এমন চুপচাপ কেন ? তোমার মত লোক চুপ ক'রে থাক্‌লেই ভয় হয়—কি ব'লছিলে—

অমল ব্যঙ্গ করিল—তোমার একটা ভাল বিয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা ক'রছিলাম, কিন্তু সে সম্বন্ধে তোমার কোন প্রশ্ন করা ঠিক হবে না।

—সেও ভাল। পড়াশুনো ছেড়ে ঘটক-গিরি আরম্ভ ক'রেছ তা জানি না তাই—ক্ষমা ক'রো। তবে—

অমল চা'য়ের কাপ তুলিয়া লইয়া বলিল—উঃ চা'এর তেষ্টায় প্রাণ কণ্ঠাগত হ'য়ে উঠেছিল আর কি। যা হোক্‌—

অপর্ণা বলিল—ও তেষ্টাটা ত দিনরাতই সমান ভাবে থাকে, তার জন্যে আর কি ? তবে ও তেষ্টাটা বেশী ভাল নয়।

—না হোক তবে, তোমার কি রকম ঘটকালিটা ক'রছি তা বলা দরকার।

অপর্ণা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—সে কথা তোমার কাছে শুনতে চাই না। ছ্যাবলামি ছেড়ে অন্য কথা বল—

উভয়ের হাস্যপরিহাসে মাতা হাসিতেছিলেন, হয়ত মনে করিয়াছিলেন এই দু'টিতে যদি এমন ক'রিয়া চিরদিন লঘুভাবে সংসারের উপর দিয়া চলিতে পারিত, তবে হয়ত বড়ই সুখের হইত। একটু হাসিয়া তিনি বলিলেন—তোমাদের দু'টিতে মিলেছে বেশ—কথায় কেউ কম নয়।

অপর্ণা কহিল—ওই কথা পর্য্যন্তই, তার বেশী নয়। এ কদিন ত ক'লকাতায়ই ছিল, একবার ত খোঁজ নিতেও এল না। এমন কি কাজ ছিল—

—মোটর গাড়ীতে গেট যে অবরুদ্ধ থাকে, আসি কেমন ক'রে—

কথাটার মাঝে যে ইঙ্গিত ছিল তাহা মাতা না বুঝিলেও কন্যা ভাল করিয়াই বুঝিল এবং কহিল—যারা কাপুরুষ তাদের অজুহাতের অভাব হয় না। যারা সাহসী, তারা জয় করে, পালিয়ে যায় না—

বার

সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনাইয়া আসিয়াছিল—

ঘরের মাঝে আলো জ্বলিলেও বাহিরে তখন অন্ধকার-আলোর একটা অস্পষ্টতা ছিল। বাহিরের বারান্দায় সে অন্ধকার ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছিল—গৃহের আলো ও রাস্তার আলোর কোনটাই সেখানে পেঁছায় নাই। অমল বিদায় নমস্কার করিয়া আসিতেছিল, সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণাও তাহাকে আগাইতে আসিয়াছে।

এই নিরুদ্ধ অন্ধকারটা যেন স্তব্ধ নিশ্বাসে ঘরের কোণে দাঁড়াইয়া আছে। অমল চলিতে চলিতে হাতে একটা আকর্ষণ পাইয়া থামিয়া দাঁড়াইল। সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণা কহিল—দাঁড়াও—

এই একটুখানি স্পর্শ, এমনি অন্ধকারে অকস্মাৎ অমলের সমস্ত রক্তপ্রবাহকে বিদ্যুৎগতিতে প্রবাহিত করিল। সে ফিরিয়া দাঁড়াইল, কিন্তু কোন কথা বলিতে পারিল না।

অপর্ণা কম্পিতকণ্ঠে কহিল—আর যাই কর, আমায় ভুল বুঝো না—

অন্ধকারে এমনি ভাবে অমলের হাতটাকে স্বেচ্ছায় আকর্ষণ করিয়া অপর্ণা যে একটা অপরাধ করিয়াছে তাহা সে এতক্ষণ ভাবিতে পারে নাই কিন্তু সেটাকে অকস্মাৎ উপলব্ধি করিয়া অত্যন্ত লজ্জিতভাবে আত্মগোপন করিতেই সে যেন দ্রুতপদে চলিয়া আসিল। তাহার প্রশ্নের জবাব শুনিবার অবকাশ বা সুযোগ হইল না।

অমল বিবশ হাতখানিকে উঠাইয়া অপর্ণাকে ধরিতে চাহিল কিন্তু পারিল না। অন্ধকারে একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া, অশোভনতা এড়াইবার জন্য পুনরায় সে চলিতে লাগিল। সে ভাবিয়া আসিয়াছিল শুধাইবে—পত্র লেখা উচিত হইবে কিনা—কিন্তু তাহা জানা হইল না, কোন জবাব

দেওয়া হইল না। সে একান্ত নিঃশব্দে রাস্তায় আসিয়া রুদ্ধ দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিল।

অন্ধকার দৃশ্যপটের মাঝে আলোকোজ্জ্বল কয়েকটি জানালা দীর্ঘ আঁখি মেলিয়া চাহিয়া আছে কিন্তু তাহার কোথায়ও অপর্ণা নাই।

অমল বাড়ীতে পৌঁছেছিল রাত্রিতে।

সকালে উঠিয়া মায়ের ভাণ্ডার অনুসন্ধান করিয়া সে জানিল—গৃহে সবই আছে কিন্তু জ্বালানি কাষ্ঠের অভাব। মা হয়ত নিত্য সকালে কাঠ কঞ্চি নারিকেলের পাত সংগ্রহ করিয়া একবেলার কাজ সারিয়া ফেলেন। অমল কিছু কাষ্ঠ আহরণ মানসে নিজেদের বাগানে যাইবে স্থির করিয়াছিল। মা চা ও জলখাবার তৈয়ারী করিয়া তাহাকে ডাক দিলেন।

অমল চা পান করিতে করিতে কিসের জন্য একটা অস্বস্তি বোধ করিতেছিল—অপর্ণার নিকট হইতে বিদায় লইয়া নতুন একটি কিছুর চারিপাশে নিজের মনকে জড়াইতে চাহিতেছিল। কিন্তু গৌরী আসিল না।

সমগ্র সকাল নিজেদের বাগানে ঘুরিয়া কাঠ কঞ্চি কাটিয়া সে দুইটি-ভার তৈয়ারী করিয়াছিল এবং একটি ভার রাখিয়া অন্যটি আনিবার সময় মা নানা অভিযোগ করিলেন—কয়েক দিনের জন্য বাড়ী আসিয়া এ পরিশ্রম সহ্য হইবে না, এখন উত্তপ্ত রৌদ্রে কাজ করা অস্বাস্থ্যকর প্রভৃতি; কিন্তু অমল হাসিয়া কেবল বলিল—কাঠ কেটে রেখে এলাম, আর একজনে নিয়ে যাক্ আর কি!

দ্বিপ্রহরে মায়ের কাছে বসিয়া নিরামিষ তরকারী খাইতে খাইতে সে কলিকাতার নানা কথা বলিতেছিল—রমলা, তৎপ্রসঙ্গে খোকা, অপর্ণা সকলই।

তথাপি বার বার সে গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল এবং মাঝে মাঝে মায়ের প্রশ্নের অনুপযুক্ত উত্তর দিয়া নিজেই লজ্জিত হইতেছিল, কিন্তু গৌরীর সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন করিতে সে পারিল না—কেমন যেন একটা দ্বিধা ও লজ্জা তাহার কণ্ঠরোধ করিয়াছিল। ভাবিয়া সে আপনি হাসিয়া উঠিল—কয়েকদিন পূর্ব্বে অপর্ণার প্রসঙ্গে তাহার মন কি বেদনার্দ্র দিনই না কাটাইয়াছে, আজও তাহাকে স্মরণ করিয়া তাহার হৃদয় গোপন কাঁটার ক্ষতে রক্তাক্ত হইয়া উঠে তথাপি গৌরীকে একবার দেখিবার জন্য এত প্রলোভন কেন তার? আপনার অন্তরের অসুষ্ঠুতায় এবং নিষ্ঠাহীনতায় সে লজ্জিত হইল না, বরং ভাবিল এই বিচিত্র মানব মন। এমনি করিয়াই মানুষের ব্যভিচারী মন জীবন-সঞ্চয় পথপ্রান্তে ফেলিয়া আপনার গতিতে আপনি চলে!

মা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিলেন—কিরে গৌরী? বাটিতে কি?

—মাছের ঝোল।

অমল ফিরিয়া দেখে গৌরী, কিন্তু কিছুদিন আগে যে সুন্দর সুডোল লীলা-চঞ্চল মেয়েটিকে সে দেখিয়া গিয়াছিল এ তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র। অমল প্রশ্ন করিল—এত কাবু হ'য়ে গেলে কি ক'রে?

গৌরী জবাব দেওয়ার পূর্ব্বেই মাতা কহিলেন—পনরদিন পরে এইত সেদিন পত্তি করেছে।

—কি হ'য়েছিল?

—জ্বর।

—অমল চাহিতেই গৌরীর চোখে চোখ পড়িয়া গেল এবং গৌরী ঈষৎ লজ্জিত আনত চোখের দৃষ্টিকে অবনত করিয়া কহিল—আপনার শরীর খারাপ কেন?

—কই, খারপ ত নয়, বরং আগের থেকে ভালই বলে মনে হয়। মাতা বলিলেন, শরীর তাহার সত্যই খারাপ হইয়াছে।

গৌরী গম্ভীরভাবে বলিল—শরীর অবশ্য খারাপ হ'য়ে গেছে আমার কিন্তু চোখটা ত হয়নি বলেই জানি।

অমল চাহিয়া দেখে গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিতেছে—হাসিতেছে কিনা তাহাও বোঝা যায় না, মুখখানা তার সদাই অমনি সহাস্য রহস্যময় থাকে। মুখে মনের ভাব ফুটিয়া উঠে না। গৌরী আর কিছু কহিল না, নিঃশব্দে কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল—যাই জেঠিমা, মার খাওয়া হয়নি এখনও।

মাতা বলিলেন—এস। বিকেলে এসো কিন্তু।

গৌরী মাথা নাড়িয়া আসিবে জানাইয়া চলিয়া গেল।

মাতা একটু দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন—মেয়েটা কেমন হাসিখুসী চঞ্চল ছিল—আজকাল একেবারে মনমরা হ'য়ে গেছে।

অমল চমকাইয়া উঠিয়া কহিল—কেন?

—কে জানে? শরীর ত এখন খারাপই, কিন্তু তার আগেই ওর অমনি পরিবর্ত্তন হ'য়েছে। আগে এসে কত খুনসুড়ি ক'রতো, এখন এসে এমনি চুপটি ক'রে দাঁড়িয়ে থেকে চলে যায়। কতদিন কতবার জিজ্ঞাসা ক'রেছি—ও কেবল বলে, কই কিছুইত হয়নি। কিন্তু আমি ত বুঝি—

—কি বোঝো?

এ প্রশ্নের কোন জবাব মা দিলেন না, তবে এইটুকু তিনি জানাইলেন যে তাহাদের মত প্রবীণার কাছে কিশোরীর মনকে ঢাকিয়া রাখা সম্ভব নয়—অপ্রকাশ্য বেদনার মাঝেই তাহার মন প্রকাশিত হইয়া পড়ে—এমনি তাহার বিচিত্রতা।

দুপুরে একটু ঘুমাইয়া উঠিয়া অমল কয়েকখানা পত্র লিখিয়া অবশেষে পাঠ্য পুস্তকের পৃষ্ঠা উল্টাইতে চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু মনটা

অপর্ণাকে ঘিরিয়া বিষণ্ণ হইয়া উঠিতেছিল—আষাঢ়ের শেষে কলিকাতা পেঁাছিয়া সে হয়ত দেখিবে, অপর্ণা অজিতবাবু ও তাহার নতুন মোটরের নিকটে আত্মনিবেদন করিয়াছে, হয়ত নিষ্প্রয়োজন মনে করিয়া পড়া ছাড়িয়া দিবে—হয়ত এই বিদায়ই তাহার নিকট হইতে শেষ বিদায় হইয়াছে।

মাতা অন্য খাটে বসিয়া কি যেন একটা সেলাই করিতেছিলেন। বাহিরে উত্তপ্ত পৃথিবী তখনও শীতল হইয়া আসে নাই। অমল শুষ্ক পত্রাচ্ছন্ন সম্মুখের বনশ্রেণীর পানে চাহিয়া কত কি ভাবিতেছিল। কখন নিঃশব্দে গৌরী আসিয়া মায়ের পাশে বসিয়াছে সে লক্ষ্য করে নাই! অমল প্রশ্ন করিল—কখন এলে গৌরী?

গৌরী মুখ না তুলিয়াই বলিল—এই ত এখনই!

ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পত্র, কবিতার খাতা, পুস্তকাদি কোন বিষয়েই সে কোন প্রকার কৌতূহল প্রকাশ করিল না এবং চলিয়াও গেল না। মায়ের পাশে বসিয়া আনত-দৃষ্টিতে মায়ের সূচ চালনার মাঝে কি যেন নিগূঢ় অর্থ আবিষ্কার করিবার জন্য সে নিবিষ্ট মনে চাহিয়া আছে। সেই ছিন্নবসন সমষ্টির মাঝে এত যে কি দেখিবার আছে সেই কেবল তাহা জানে—

অকস্মাৎ একবার মুখ তুলিয়া চাহিতেই অমলের সঙ্গে চোখোচোখী হইয়া গেল। অমল এই অত্যন্ত প্রগল্‌ভা কিশোরীটির চোখের প্রশান্ত বিষাদ-ক্লিষ্ট দৃষ্টির মাঝে যে গভীর বেদনার ছায়া পড়িয়াছে আজ তাহা স্পষ্টই বুঝিয়া ফেলিল। কিন্তু এ বেদনা সে কোথা আহরণ করিয়া হৃদয়ের গোপন প্রদেশে কাঁটার মত সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছে এবং কেনই বা তাহার ক্ষতের রক্তক্ষরণে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে?

অমল প্রশ্ন করিল—অপর্ণার কথা ত জিজ্ঞাসা ক'রলে না গৌরী?

গৌরী তেমনি একটু হাসিয়া কহিল—বলুন না।

—তার যে বিয়ে ঠিক হ'য়েছে প্রায় ?

—তাহ'লে আপনি চ'লে এলেন কেমন ক'রে ! বিয়েটা দেখবেন না ?

অমল কহিল—বড়লোকের বিয়ে দেখাটা বড় খরচের ব্যাপার, না দেখাটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ—তাই—

—পালিয়ে এলেন ?

—বল্‌লে নেহাত ভুল হবে না।

গৌরী কেমন একটু চাহিয়া, ওষ্ঠটাকে একটু বাঁকাইয়া যেন ব্যঙ্গচ্ছলেই কহিল—কিন্তু কাপুরুষের মত কাজ হ'ল না কি ? আবার পরে অনুশোচনা ক'রতে হবে হয়ত !

—অনুশোচনা করাটা ত আর ব্যয়-সাপেক্ষ নয়, তাই।

অমল নানা প্রশ্নে নানা প্রসঙ্গে গৌরীর মাঝে আগের গৌরীকে সঞ্জীবিত করিতে চাহিল, কিন্তু গৌরী মৃদু হাসিয়া করুণ নেত্র-সম্পাতে বার বার তাহার প্রচেষ্টাকে একান্তই ব্যর্থ করিয়া দিল।

মা চুপ করিয়াছিলেন। অনেকক্ষণ পরে কাঁথার ধামাটা নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন—বেলা ত প'ড়ে এল। তোমাদের বাড়ীতেই যেতে হবে গৌরী—ঢেঁকিতে ডালক'টা 'কাঁড়িয়ে' নিয়ে আসি—

গৌরী সোৎসাহে কহিল—চলুন জেঠিমা, আমি 'পার' দিয়ে দেব।

—না না, ও আমি একাই পারবো।

কুলা ধামা প্রভৃতি লইয়া তাহারা রওনা দিলেন। জীর্ণ জানালার ফাঁক দিয়া অমল তাহাদের গমন পথের পানে চাহিয়া রহিল। তাহার মাতার শীর্ণ দীঘল দেহের চলন-ছন্দের সহিত অপর্ণার যেন কোথায় একটা সাদৃশ্য আছে—কিন্তু গৌরীর পদক্ষেপ মন্থর এবং দ্রুততাবিহীন।

গৌরী পিছন ফিরিয়া প্রশান্ত দৃষ্টি মেলিয়া কি যেন খুঁজিল, কিন্তু কাহাকেও না দেখিয়া আবার চলিতে লাগিল।

কর্ম্মকোলাহলহীন, ব্যস্ততাহীন নিবিড় নীরবতা ও দারিদ্র্যের ম্লানিমা-ভরা গ্রামের নিভৃত কোণে বৈচিত্র্যহীন শ্লথ দিনগুলি একে একে একই রকমে কাটিয়া গিয়াছে। মাতার উত্তপ্ত স্নেহবিগলিত বুকের মাঝে বাস করিয়া অমলের মনের অতৃপ্তি আস্তে আস্তে কর্পূরের মত উবিয়া গিয়াছে—মাঝে মাঝে একটা বেদনা তাহার সমস্ত মনকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এই মাত্র। গৌরীর স্বাস্থ্যের উন্নতি হইয়াছে কিন্তু ব্যবহার ও কথা-বার্ত্তার কোন উন্নতি হয় নাই। শীর্ণ শুষ্ক দেহে আবার যৌবনশ্রী দেখা দিয়াছে—শুভ্রগণ্ড রক্তাভ হইয়াছে, কিন্তু তেমনি করিয়া সে অমলের কাছে আসে না, নানা অজুহাতে ও উপায়ে তাহাকে বিব্রত করে না। প্রশ্ন করিলে কোনমতে অত্যন্ত শোভন ও সংযত উত্তর দিয়া আলাপকে অনাবশ্যকরূপে সংক্ষেপ করিয়া ফেলে। মাঝে মাঝে তাহার নতনেত্র-সম্পাতে অমলের হৃদয় করুণা ও সহানুভূতিতে ভরিয়া উঠে। সহানুভূতি প্রকাশ করাটা, বিশেষতঃ গৌরীর কাছে—অত্যন্ত অবান্তর ও বিড়ম্বনা বলিয়া মনে হয়। অপর্ণা হইলে হয়ত অনেক কিছুই বলিয়া ফেলা চলিত কিন্তু গৌরীকে ভাষায় কিছু বলা চলে না, কেবলমাত্র গভীর করুণদৃষ্টির প্রশান্ততা দিয়া সমবেদনা জানানো চলে। সে এমনি—যে মুখের ভাষা সেখানে নীরব, চোখের ভাষাই নীরবে সব জানায়—

আষাঢ়ের মাঝামাঝি—আর কয়েকটি দিন পরেই অমলকে কলিকাতা যাইতে হইবে। সেদিন দুপুরের পরে মাতাপুত্র গৃহের মাঝে বসিয়াছিল, হঠাৎ একখানা কালো ছেঁড়া মেঘের বুক হইতে অজস্র ধারায় জল ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। উঠানের স্রোতের উপর বড় বড় বৃষ্টির ফোঁটা পড়িয়া ফাটিয়া যাইতেছে—জীর্ণ দালানের নোনাধরা ক্ষয়িষ্ণু ইঁটের উপর

পড়িয়া চট্‌পট্‌ শব্দ করিতেছে। অমলের কবি-মন নানা কথা ভাবিতেছিল—এক একবার অপর্ণার প্রসঙ্গে শঙ্কিত হইয়া উঠিতেছিল।

অকস্মাৎ দেখিল মা তাহারই পাশে আসিয়া বসিয়াছেন। মা প্রশ্ন করিলেন, কবে—কবে যাবি?

—সামনের বুধবার ভাল দিন আছে। কলেজও ত খুলে এল—

—তুই ছেলে পড়াস কখন?

—সন্ধ্যার পরে।

—পড়াশুনোর ত ক্ষতি হয়, এবার ত পরীক্ষার বছর। অত পরিশ্রম ক'রে কি পারবি, এই ক'মাসেই শরীর যা হ'য়েছে। খাওয়া দাওয়ারও কষ্ট হয়।

মা ইচ্ছা করিয়াই কখনও এই সমস্ত দুঃখদায়ক প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন নাই, আজ তাঁহাকে স্বেচ্ছায় এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে দেখিয়া অমল আশ্চর্য্য হইয়াছিল। বলিল—চ'লে যাবে, কষ্ট ত একটু হবেই। তুমি ভেবো না।

মা কি যেন একটা বলিতে যাইয়া ইতস্ততঃ করিলেন। ক্ষণেক পরে বলিলেন—তোর মনে পড়ে, তোর ছোট কালে সংসারের কাজ ক'রে আমি সময়ই পেতাম না, গৌরীর মায়ের কাছেই তুই প্রায় থাক্‌তিস্‌?

অমল মনে মনে একটা কিছু আশঙ্কা করিয়াছিল, একটু হাসিয়া কহিল—মনে থাক্‌বার ত কথা নয় মা, তবে তা আমি শুনেছি।

—গৌরী ঠিক ওর মার মতই। ওর মাও কেন যেন তখন তোকে নিয়ে টানাটানি ক'রতো, আমার কত সাহায্য ক'রতো, আজ গৌরীও তেমনি না ডাক্‌তেই এসে আজ আমাকে জল-পত্তি দিচ্ছে। পূর্ব্বজন্মে ওরা নিশ্চয়ই আমার আপনার জন ছিল—

মাতার চোখ দুইটি কৃতজ্ঞতায়, স্নেহে অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিয়াছিল।

তিনি বাহিরের বৃষ্টিধারার প্রতি ক্ষণেক চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন—ক'লকাতায় না জানি তোর কত কষ্টই হয়—ওরা কি ব'লছিল জানিস্ ?

—কারা ?

—গৌরীর মা বাবা। তারা এ বছরটা তোর পড়ার খরচ চালিয়ে দেবে—আর গৌরীকে যদি আমার ঘরে আনতে পারি তবেই ওদের গুণের কিছু মূল্য দেওয়া হয়। তোরও পড়ার সুবিধে হবে—অত পরিশ্রম ক'রলে শেষে পরীক্ষা হয়ত ভাল হবে না।

অমল কোন জবাব দিল না এবং বিস্মিতও হইল না, এমনি একটা আশঙ্কা সে বহুদিন হইতেই করিতেছিল। মাতা কোনও জবাবের জন্যে অপেক্ষা করিতেছিলেন কিন্তু জবাব না পাইয়া আবার বলিলেন—মার মন ত জানিস্ না, ছেলেকে কোথায়ও কারও হাতে দিয়ে সে নিশ্চিন্ত হ'তে পারে না—এক বৌ'এর হাতে দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকে। গৌরীর হাতে যদি তোকে দিয়ে যেতে পারতুম তবে আমার শান্তি হ'ত—

অমল জবাব দিল, পরীক্ষার আগে ও সমস্ত কথা ভেবো না মা। পরে যা হয় হবে—

মা একটু উৎসাহিত হইয়া বলিলেন—বিয়ে না হয় পরীক্ষার পরেই হবে কিন্তু এখন যদি ছেলে পড়াতে না হয় তবে ত—

অমল একটু দৃঢ়কণ্ঠেই বলিল—যদি পাশ করি মা নিজেই ক'রবো, কারও সাহায্য আর চাই না। এই পর্য্যন্ত ত এমনি ক'রেই দিন কেটেছে—একটা বছরের জন্যে পরের অন্নদাস আর কেন হব ? পরীক্ষা ভাল হোক্, আর নাই হোক্, যতদিন দেহ একেবারে অচল না হয় ততদিন অন্যের কাছে হাত বাড়াবো না।

মা বুঝিলেন—একটা উত্তপ্ত অভিমান তাহার অন্তরকে উত্তেজিত করিয়া তুলিয়াছে। যাহারা সাহায্য করিতে পারিত, করা উচিত ছিল, তাহারা অসময়ে নিঃসহায় অবস্থায় ত্যাগ করিয়া গিয়াছে বলিয়াই অমলের

এই অভিমান। এ অভিমান মায়েরও ছিল কিন্তু তাহার জন্য অভিমান থাকিলেও উত্তেজনা ছিল না। মা তাই বলিলেন—অত পরিশ্রম করলে শেষে পরীক্ষার ফল হয়ত ভাল হবে না।

অমল ম্লান একটু হাসিয়া কহিল—সে দুর্ভাগ্যকে প্রতিরোধ করার ক্ষমতা যখন নেই, তখন আনন্দে গ্রহণ করাই আমাদের উচিত।

মাতা চুপ করিয়া বসিয়া রহিলেন। অমল মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া বুঝিল, মা ব্যথিত হইয়াছেন কিন্তু অমলের সংকল্পকে হয়ত অযৌক্তিক মনে করিতেছেন না। দ্বিধা ও অপ্রকাশ্য একটা বেদনায় তাহার মুখখানি বাদল দিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন।

বাইরে তখনও অঝোরে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। ঘরের মাঝে স্বল্পান্ধকার পুঞ্জীভূত জয়হীন চেষ্টার নৈরাশ্যের মত নিথর নিষ্কম্প হইয়া রহিয়াছে। নিশীথ রাত্রের নীরবতার মত অস্বস্তিকর একটা অনুভূতি উভয়ের মনকে উৎপীড়িত করিতেছে—

অমল সান্ত্বনার সুরে মাতাকে কহিল—এই ঘরে আজ আমাদেরই পেটের ভাত জুটছে না মা, তার মাঝে আর এক অভাগ্যকে সংগ্রহ ক'রে আমরা আনি কেন? যদি কখন বাহুবলে বাঁচবার সংস্থান ক'রতে পারি তবে তখনই একথা ভাবা চলে—তুমি এজন্যে ব্যস্ত হ'য়ো না মা—

মাতা একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিলেন—কেউ কি কাউকে ভাত দিতে পারে? ভগবানই দেন।

প্রায় এক বৎসর পরের কথা।

বন্ধে কয়েকবার সে বাড়ী গিয়াছে, কিন্তু মা গৌরীর সহিত তাহার বিবাহের জন্যে আর অনুরোধ করেন নাই, সম্ভবতঃ পরীক্ষা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতেছেন। গৌরী তেমনিভাবে আসিয়াছে গিয়াছে কিন্তু

সেই প্রগল্‌ভতা ও প্রশ্নে অমলকে বিব্রত করে নাই, তবে অন্যত্র হাস্য-পরিহাসে তার সজীবতা প্রকাশ পাইয়াছে। অমল অনেকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছে—গৌরী তাহাকে ভালবাসে নাই। হয়ত, তাহার সহিত বিবাহের প্রস্তাব-সংক্রান্ত ব্যাপার সে অবগত আছে, তাই শোভন ব্যবহারে সে নিজেকে গোপন করে। কিন্তু মাতা একথা স্মরণ করাইয়া দিতে ভুলেন নাই যে অমলকে গৌরীর মত মেয়ের হাতে অর্পণ করিতে পারিলেই তিনি নিশ্চিন্তে মরিতে পারেন। অমল শুনিয়াছে কিন্তু কোন জবাব দেয় নাই। কথা-প্রসঙ্গে মাতা একদিন দুঃখ করিয়াছিলেন—যদি অমল তাহার কথা শুনিত তবে বিদেশে আজ এমনিভাবে পরিশ্রম করিতে হইত না, হয়ত পরীক্ষার ফল আরও ভাল হইতে পারিত।

অপর্ণার সঙ্গে ব্যবহার তেমনিভাবে চলিয়াছে। তাহাদের সমিতির হাস্যকোলাহল কোন স্থানে ব্যাহত হয় নাই। অপর্ণার বাড়ীতে যাইয়া অমল কখনও পড়াশুনায়, কখনও হাস্য-পরিহাসে কাটাইয়া আসিয়াছে। তেমনি করিয়া উভয়েই মাঝে মাঝে আপনার হৃদয়কে ব্যক্ত করিতে যাইয়া, আশাহীন চেষ্টার নৈরাশ্যপূর্ণ অনিবার্য্য ভবিষ্যতের সম্মুখীন হইয়া থামিয়া গিয়াছে। অপর্ণা অত্যন্ত ভাল মেয়ের মত আপন ইচ্ছাকে বাপমার ইচ্ছার সহিত একীভূত করিয়া দায়িত্ব মুক্তির আনন্দ লাভ করিয়াছে কিন্তু অমলকে অত্যন্ত সাবধানে নিজের অঞ্চলের নীচে বন্দী রাখিয়া তাহার দারিদ্র্যের কথা প্রকাশ করিতে দেয় নাই এবং মাকে ও অজিতবাবুকে নিরাশ করে নাই। অপর্ণার কথাবার্ত্তার মাঝে আজ আর অভিমান-ব্যঙ্গ তিরস্কার নাই, তাহা কেবল সমবেদনা ও সহানুভূতির করুণায় আর্দ্র! তাহার হৃদয়ক্ষরিত সুধাধারায় অমলের ক্ষত, অন্তরের জ্বালা মন্দীভূত হইয়া মন্ত্রমুগ্ধ সর্পের মত মাথা নত করিয়া থাকে, কখনও উত্তেজিত হইয়া আপনাকে মুক্ত করিতে পারে

না। রমলাও ঠিক আগের মত গভীর দীর্ঘশ্বাসে অপর্ণার কুশল প্রশ্ন করে —এই মাত্র।

পরীক্ষা আগতপ্রায়। অমল তেমনভাবে তৈরী হইতে পারে নাই —সে সময়ও ছিল না, পরীক্ষায় ভাল ফল দেখাইবার অভিপ্রায়ও তেমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে নাই। একটা আশাহীন উদাস উদ্যম ও অপ্রিয় কর্ত্তব্য জ্ঞানপ্রসূত বিবেকবুদ্ধির মন্থর শ্লথ উত্তেজনাহীন নিরুৎসাহের মধ্যে তাহার জীর্ণ দিনগুলি একটি একটি করিয়া কাটিয়া গিয়াছে। মাঝে মাঝে একটা বেদনা তাহাকে সকল অপাঠ্য পাঠ্য কেতাবের উর্দ্ধে পরিচালিত করে—পরীক্ষার কয়েকটা দিনের পরে অপর্ণার সহিত সামান্য এই পরিচয়ের বাঁধন চিরদিনের মত ছিঁড়িয়া যাইবে, পৃথিবীর এই জনারণ্যে হারানো পথিকের মত তাহারা হয়ত উভয়কে খুঁজিয়া ফিরিবে, কিন্তু সারাজীবনে আর খুঁজিয়া পাইবে না। অন্তরের গভীর তলদেশে রক্তক্ষরণ প্রবণ একখানা ক্ষতের অপ্রকাশ্য গোপন ব্যথায় সমস্ত জীবন রুগ্ন শিশুর মত পঙ্গু হইয়া থাকিবে। গন্তব্য ষ্টেসনের কিছু পূর্ব্বে সামান্য একটা লাল সিগনালের আলোর মত রক্ত চক্ষু বিচ্ছুরিত জ্যোতিতে জীবনের সমস্ত গতি মুহূর্ত্তে থামিয়া যাইবে—গন্তব্য স্থানে পেঁৗছিবে না। মনটা ব্যস্ত যাত্রীর মত সম্বল বাঁধিয়া অধীর অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবে।

প্রায় পনর দিন সে অপর্ণাদের ওখানে যায় নাই—আজ অকস্মাৎ একখানা চিঠিতে অপর্ণা তাহাকে আহ্বান করিয়াছে এবং বৈকালে পাঁচটায় তাহাকে উপস্থিত হইতে অনুরোধ জানাইয়াছে। পত্র সংক্ষেপ —অত্যন্ত সংক্ষেপ, তাহাতে কেবলমাত্র অনুরোধই রহিয়াছে কিন্তু কোন কারণ নাই, কোন কুশল প্রশ্ন নাই। এই পত্রটুকু হাতে করিয়া অমল রাজ্যের পুঁথি সামনে খুলিয়া বসিয়া অনেক ভাবিল, কিন্তু আহ্বানের কারণ কিছু নিরূপণ করিতে পারিল না।

পাঁচটার কিছু পূর্ব্বে অমল অপর্ণাদের বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দেখে, বাহিরে কেহ নাই। চাকর মারফতে সংবাদ দিয়া সে অপর্ণার আগমনের জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল কিন্তু অপর্ণা আসিল না, করুণা আসিল না, শুধু অপর্ণার মা একাকী নামিয়া আসিয়া বলিলেন—বসো বাবা অমল। কেমন আছ? পড়াশুনো কেমন হ'ল তোমার?

অপর্ণার মা'য়ের অত্যন্ত প্রশান্ত এবং ভদ্রতা-সুলভ কুশল প্রশ্নে সে চমকিয়া উঠিল। বলিল—ভাল আছি, কিন্তু পড়াশুনো ভাল হয়নি।

—ফার্ষ্ট ক্লাশ হবে ত?

—না।

মাতা নানা অভিযোগান্তে বিষয়ান্তরে প্রশ্ন করিলেন—বাড়ীতে তোমার মা ভাল আছেন?

—হ্যাঁ।

—মায়ের অন্তর কি তাই ভাবি। ছেলে মেয়েদের কোন কথাই তার কাছে গোপন থাকে না। তোমরা যাই মনে কর, কিন্তু আমরা তোমাদের অন্তরের গোপন তলদেশ পর্য্যন্ত স্বচ্ছ পদার্থের মত দেখতে পাই অপর্ণাকে দিয়ে খবর তোমাকে আমিই দিয়েছি—তোমার সঙ্গে কয়েকটা কথা আছে।

অমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মাতা কয়েকটি কথা যেন মনে মনে গুছাইতে একটু দেরী করিয়া কহিলেন—আমার কাছে লজ্জা ক'রো না, আমাকে তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলে বিশ্বাস ক'রো। অপর্ণার সঙ্গে অজিতের বিয়ের সম্বন্ধ আজ প্রায় একবছর চ'লেছে কিন্তু অপর্ণা এখনও রাজী হয় নি। তোমাদের মধ্যে যে একটা ভালবাসা গড়ে উঠেছে তা আর যার কাছেই গোপন ক'রতে পারো, আমার কাছে গোপন ক'রতে পারবে না। পরীক্ষার পরেই যেখানে হোক্ তার বিয়ে

দেওয়া আমাদের ইচ্ছা। অপর্ণাকে প্রশ্ন আমি সবই ক'রেছি, তোমাকেও করা দরকার। আমাকে তোমার নিজের মা ব'লে মনে ক'রো, কোনো লজ্জা ক'রো না—

অমল চুপ করিয়া রহিল। কি বলিবে, বুঝিয়া পাইল না। এমনিভাবে অকস্মাৎ সে যে জীবনের বৃহত্তম পরীক্ষার সমীপবর্ত্তী হইবে তাহা ভাবে নাই। অমল জানালার ফাঁকে দূরের শীর্ণ নারিকেল গাছটির দিকে চাহিয়া চুপ করিয়াই ছিল—একটা দুর্জ্জয় অস্বস্তি ও অস্থিরতা সমস্ত অন্তর ও বাক্‌শক্তিকে অকর্ম্মণ্য করিয়া দিয়াছে।

মাতা বলিলেন—লজ্জা ক'রো না অমল। অপর্ণার বিয়ে যদি গৌরীদান অনুসারে ক'রতাম তবে এসব কথার কোন প্রয়োজন ছিল না। তোমরা বড় হ'য়েছ, এখন তোমাদের ভালমন্দ বিচারশক্তি হ'য়েছে—তাই জিজ্ঞাসা করা দরকার, এবং তোমাদেরও সমস্ত জানানো দরকার, বৃথা লজ্জায় জীবনে ভুল করা ঠিক হবে না—

অমল ব্যর্থতার অস্বস্তিকর বিড়ম্বনাকে আর যেন বহন করিতে পারিতেছিল না। আজ মরিয়া হইয়া সে সমস্তই বলিবে স্থির করিয়া ফেলিল। তাই কিছুমাত্র ইতস্ততঃ না করিয়া কহিল—আপনার অনুমান সত্য, অন্ততঃ আংশিকরূপে—আমার দিক থেকে। অপর্ণার মনের কথা সম্পূর্ণ জানি না তবে সেও সম্ভবতঃ আমাকে একটু ভালবাসে। তবে বিবাহের দিক থেকে আমার মতামত সম্পূর্ণ অবান্তর—কারণ, আপনারা কি জানেন জানি না—তবে আমি গরীব। বাড়ীতে সামান্য জমিজমা পৈতৃক সম্পত্তি আছে তাতে মায়ের একবেলার হবিষ্যান্ন চলে, আমি ছেলে পড়িয়ে এখানে পড়াশুনো করি। অপর্ণা এ কথা বহুদিনই জানে, কিন্তু আপনাকে জানাতে বারণ ক'রেছিল। এর পরে, সম্ভবতঃ আমার আর কিছু ব'লতে হবে না। এখন অপর্ণা তার নিজের বিচারবুদ্ধিতে যা বোঝে তাই সে ক'রতে পারে এবং আপনাদের পক্ষেও—

অত্যন্ত উত্তেজনায় অমলের কণ্ঠ কাঁপিতেছিল—সে কথা কয়টিকে যেমন সুষ্ঠুভাবে বলিতে চাহিয়াছিল, তেমনিভাবে পারিল না বলিয়া, অকস্মাৎ থামিয়া গেল। অপর্ণার মায়ের মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহার মনের অবস্থা দেখিবার সাহস তাহার হইল না, তাই চেষ্টা করিয়া বাহিরের দিকে চাহিল। নারিকেল গাছের ডালে একটা ভিজা কাক ক্লান্তভাবে বসিয়া আছে ঘন মেঘবালুপ্ত আকাশের সামনে—মূর্ত্তিমান ক্লান্তির ছবির মত।

মাতা কহিলেন—এ সব কথা আমি শুনেছি—কাল—অপর্ণারই মুখে, তাই তোমাকে ডেকেছি। অবশ্য অপর্ণা, এখন বড় হ'য়েছে সে যদি সমস্ত জেনে-শুনেও তোমাকেই বিয়ে ক'রতে চায় তবে আমরা বাধা দেব না। যে ধরণের প্রাচীন লোকেরা এগুলোকে অত্যন্ত মূল্যহীন মনে করে আমরা ঠিক সে শ্রেণীর নয়। তবে তোমার দিক দিয়েও ভাববার আছে। তোমাদের মন আজ যা—পরে তা থাক্‌বে না, তা তোমরা এখন না বুঝলেও পরে বুঝ্‌বে। তখন মনের সঙ্গে সঙ্গে জগতের আরও অনেক কিছু দরকার হয়। অপর্ণা যে ভাবে, যে সংসারে গড়ে উঠেছে সে ঠিক তেমনটি না হ'লে তৃপ্তি পাবে না, তুমিও হয়ত দেখ্‌বে সংসারের দৈন্যই সবচেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে, জীবনে তার সঙ্গে সঙ্গে আসবে অশান্তি-অতৃপ্তি। গৃহকে তারা ছিন্নভিন্ন করে দেবে। এসব কথা ভেবে দেখেছ—

অমল শঙ্কাহীন কণ্ঠে জবাব দিল—প্রয়োজন হয়নি এবং আমার দিক থেকে প্রয়োজন নেইও। একথা বরং অপর্ণারই ভেবে দেখবার কথা। দারিদ্র্যকে আমি জন্মাবধি চিনি, কিন্তু যে চেনে না তারই ভেবে দেখা দরকার।

কিন্তু সে যদি ভুল করে—যদি—

অমল একটু হাসিয়া কহিল—মানুষ জীবনে ভুল করেই। কারণ কোন্‌টা ভুল, কোন্‌টা ঠিক, তা আগেই বোঝা যায় না। যা ঠিক হবে

ভাবি—তাই ত আমরা করি, তবুও ভবিষ্যতে পেঁাছে দেখি সেইটেই হাস্যকর একটা ভুলে পরিণত হ'য়েছে—

অমল চুপ করিয়া গেল। মাতা ক্ষণিক কি চিন্তা করিয়া কহিলেন—তুমি ভেবে দেখো, সেই জন্যেই তোমাকে ডেকেছি। পরীক্ষার পরে ত আবার দেখা হবে!

মাতা উঠিয়া দাঁড়াইলেন, কি যেন একটা বলিতে যাইয়া ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে কহিলেন—ব'সো, যেও না—চা না খেয়ে যেও না কিন্তু—

মাতা চলিয়া গেলেন। এতদিনকার অনির্দ্দিষ্ট ভবিষ্যতের অস্বস্তিকর বোঝা নামাইয়া দিয়া অমল একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিল। এখন যাহা কিছু করিবার, যাহা কিছু বলিবার সমস্তই অপর্ণার—সে আজ মুক্ত, মুক্তির আনন্দে তাহার মন খুশীতে ভরিয়া গেল, কিন্তু তবুও যেন অস্বস্তিকর এই বিড়ম্বনার অন্ত নাই।

চা লইয়া আসিল অপর্ণা। চা ও সামান্য কিছু খাবার নামাইয়া রাখিয়া সে নিঃশব্দে বসিয়া রহিল। অমল চাহিয়া দেখিল—রুক্ষ এক বোঝা চুলের মাঝে দীপ্তিহীন পাংশু মুখে অপর্ণা বসিয়া আছে। ম্লান দৃষ্টিতে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে, তাহার মুখের পানে চাহিবারও সাহস যেন আজ তাহার নাই। আজ অপর্ণাকে দেখিলে করুণা হয়। তাহাকে পীড়া দেওয়া আজ সম্ভব নয়।

অমল খাবার ও চা দ্রুত গলাধঃকরণ করিয়া যাইতেছিল। রুদ্ধ কণ্ঠ দিয়া তাহা যেন নামিতে চাহে না, অপর্ণা তেমনিভাবে স্তূপাকার জড়পদার্থের মতই বসিয়া আছে। রুমালে হাতটা মুছিয়া ফেলিয়া অমল অত্যন্ত অবান্তর প্রশ্ন করিল—পড়াশুনা কেমন হ'ল?

অপর্ণাও বিমনাভাবে প্রশ্ন করিল—তোমার কেমন হ'ল?

—আমার ত কিছুই হয়নি তা জানো।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া অমলের মুখের পানে গভীর সংযত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া কহিল—তুমি কি এই জিজ্ঞাসা ক'রবার জন্যই এতদূর এসেছ ?

অমল হাসিয়া উঠিল—এই অপ্রাকৃত মুমূর্ষুর হাসি দেখিয়া অপর্ণা বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিল। স্বপ্নাবিষ্টের মত বসিয়া শুনিল—অমল বলিতেছে—আমি কিছু জিজ্ঞাসা করতে আসিনি, তুমি চিঠি লিখেছিলে তাই এসেছিলাম। তোমার মা যা ব'লেছেন তা বোধ হয় তুমি জানো—কাজেই অকারণ—

—কি ব'ললে ?

—আমি কিছুই গোপন করিনি। এই অস্বস্তি ও নৈরাশ্যময় বৃথা চেষ্টার বোঝা নামিয়ে রেখে গেলাম। তোমাকে আমি এখনও বুঝিনি, আর বোঝবার চেষ্টা ক'রবো না। তোমার জীবনের ছায়াতলে বসে শ্রান্ত পথিকের মত ক্ষণকাল যে স্নিগ্ধতার স্বাদ গ্রহণ ক'রে গেলাম তা মনে থাকবে—উত্তপ্ত খর রৌদ্রতপ্ত দারিদ্র্যনিপীড়িত ধূসর মাঠ দিয়ে আবার চলবো—আশ্রয়হীন—

অমল উত্তেজনায়, কম্পিত কণ্ঠে কথাটা শেষ করিতে না পারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল, কিন্তু চোখ দুইটি তার ঝাপসা হইয়া আসিয়াছে, কথা বলিবার, চলিবার কোন শক্তি নাই, তাই সে কেবল দাঁড়াইয়াই রহিল—নিরুদ্ধ একটা যাতনা, একটা করুণ আর্ত্তনাদ, একটা তীব্র অভিমানকে দাঁতের মাঝে চাপিয়া রাখিয়া।

অপর্ণা তাহার মুখের পানে প্রশান্ত দৃষ্টি হানিয়া কি যেন বলিতে চাহিল কিন্তু অমলের কঠোর পাংশু বেদনার্ত্ত নিষ্প্রভ মুখের পানে চাহিয়া কিছুই বলিতে পারিল না। একটা শঙ্কা ও দ্বিধায় সান্ত্বনার কথাটা বা কোনও অনুরোধ হয়ত, কণ্ঠের নীচে বুকের তলায় মিলাইয়া গেল।

অমল একটু দাঁড়াইয়া থাকিয়া অসংযত পদক্ষেপে বাহির হইয়া আসিল। একবার পিছন ফিরিয়া চাহিয়া দেখে, অপর্ণা ঠিক তেমনি ভাবে চাহিয়া আছে। এক বোঝা রুক্ষচুল বাতাসে উড়িয়া তাহার ম্লানমুখের উপর আসিয়া পড়িতেছে। জড়ের মত সে বসিয়াই রহিল কোন কথা বলিল না—কোন বিদায় সম্ভাষণ জানাইল না।

চৌদ্দ

কিছুদিন পরে—

শেষ পেপার পরীক্ষা দিয়া অপর্ণা ও অমল দারভাঙ্গার লিফ্‌টের সাম্‌নে আসিয়া দাঁড়াইল। অপর্ণাই প্রথম কথা কহিল—চল হাঁট্‌তে হাঁট্‌তেই যাই। তোমার কেমন হ'ল?

—ভাল না, ভাল হওয়ার কথাও নয়। সেকেণ্ড ক্লাসের তলার দিকে কোনমতে নাম্‌টা থাক্‌তে পারে। কিন্তু সে দুর্ভাগ্যকে আমি নির্ব্বিচারেই গ্রহণ ক'রবো—তোমর ফার্ষ্টক্লাস থাক্‌বে ত?

অপর্ণা একটু বিনয় সহকারে বলিল—একেবারে নিরাশ হইনি। তবে আশাও খুব বেশী নেই।

—যা হোক্‌, তোমার পরীক্ষাটা যে খারাপ হয়নি এ সান্ত্বনা আমার থাকবে।

কথা বলিতে বলিতে অপেক্ষাকৃত জনহীনস্থানে আসিয়া অপর্ণা কহিল—এখন কি বাড়ী যাবে?

—হ্যাঁ, সেই মায়ের স্নেহাঞ্চল ছাড়া এখন আর কোন সান্ত্বনাই নেই।

—কবে যাবে?

—তিন চার দিনের মাঝেই—একটু থামিয়া কহিল—আজই সম্ভবতঃ তোমার সঙ্গে শেষ দেখা।

অপর্ণা অমলের মুখের উপর সোজা দৃষ্টি রাখিয়া কহিল—না। পরশু আমাদের ওখানে যাবে, সন্ধ্যার পরে তারপর বাড়ী যাবে।

—এখনও কি যাবার প্রয়োজন আছে?

—আছে, প্রয়োজন শেষ আমি এখনও ক'রতে পারিনি। চলো, আজ একটু বেড়িয়ে আসি।

—চল, আপত্তির কোন কারণই নেই।

—দু'জনে চা খাইয়া আবার ময়দানের সেই গাছটির ছায়ায় গিয়া বসিল—যেখানে একদিন তাহারা ঝরাপাতার মত জীবনের বৃন্ত হইতে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া বাতাসের মাঝে ভাসিয়া যাইতে চাহিয়াছিল। অমল আজ যেন কেমন একটা অনুদার ঔদাস্য বোধ করিতেছিল—যেন তাহার যাহা কিছু বলিবার যাহা কিছু করিবার সবই শেষ হইয়া গিয়াছে। আজ অপর্ণাই তাহার পদপ্রান্তে শরাহত পক্ষীশাবকের মত রক্তাক্ত দেহে সাহায্যের আবেদন করিবে।

অপর্ণা অকস্মাৎ প্রশ্ন করিল—তুমি সেদিন মাকে যা বলে এসেছ সবই শুনেছি। মার মত কি তা তোমার বুঝতে বাকি নেই, কিন্তু আমি আজ কি ক'রবো?

—আমার কাছে যুক্তি চাও? কি করা উচিত?

—হ্যাঁ, আমি আজ তোমার কাছে কিছুই বলতে বাকি রাখবো না। যা ব'লতে চাই তা তুমি জানো। আমাকে যদি আজ বাপ-মা সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে ভাসতে হবে—

একটা অপ্রকাশ্য বেদনায় অপর্ণার চক্ষু ভারাক্রান্ত হইয়া আসিয়াছিল, সে ভাষা হারাইয়া চুপ করিল। অমল ধীরে মধুর কণ্ঠে কহিল—দেখ অপর্ণা দারিদ্র্য কি তা তুমি জানো না, সে যে কি

দুর্বিসহ লাঞ্ছনা তাও তুমি জানো না। তোমাদের ওখানেই, তোমার মার সামনে এই দারিদ্র্যের ক্ষত যেন আমাকে কুৎসিত ব্যধিগ্রস্তের মত লজ্জায় ম্রিয়মান ক'রে দিয়েছে। তুমি উপন্যাসে হয়ত পড়েছ কিন্তু সত্যিকার অভিজ্ঞতা তোমার নেই। জগতের সমগ্র শক্তির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমাকে গ্রহণ করবার মত বুকের বল যদি তোমার থাকে—এবং সেই ভুলের জন্য জীবনে কখনও অনুশোচনা ক'রতে হবে না এমনি শক্তি যদি থাকে—নেমে এস, দু'জনে ভাসি—আর যদি তা না থাকে তবে ফিরে যাও। মনকে ব্যসনের প্রলেপে সুরভিত ক'রে রেখো—সব ভুলে যাবে—

আজিকার এই কথা অমলের অভিমানপ্রসূত, না তিরস্কার, না সত্য কথা—তাহা অপর্ণা বুঝিতে পারিল না, অসহায় দৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়া রহিল।

অমল পুনরায় কহিল—তোমার মংগলাকাঙ্ক্ষীরূপে যদি আমাকে ব'লতে হয় তবে তোমার মা-বাবার সংগে আমাকে একমত হ'তে হয়। তোমার মাঝে সে শক্তি নেই—যে শক্তি থাকলে জগতের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে মানুষে সংগ্রাম করতে পারে।

অপর্ণা দ্বিধাতুর কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—তুমি সুখী হবে না ?

—আমার সুখদুঃখের প্রশ্ন ওঠে না, ব্যাপারটা তোমার। আমাকে সুখী ক'রতে তোমাকে ঐশ্বর্য্য ছেড়ে ধূলায় নেমে আসতে বলা যায় না। আমার জন্যে সে ত্যাগ ক'রতে পারো কিনা সে তোমার বিচার্য্য, আমার নয়।

অপর্ণা আর্দ্র চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—তবে কি এইখানেই শেষ ?

—না, শেষ এখানে হবে না। সারাজীবন অন্ধকার কারাকক্ষে বন্দী র'য়ে আমরা আজকার হারানো মণিকে খুঁজবো—কিন্তু কখনই

পাবো না—সেই না পাওয়ার অতৃপ্তি আমাদের গৃহকে, মনকে, কর্ম্মকে আচ্ছন্ন করে আমাদের জীবনকে শুষ্ক কঠোর ক'রে রাখবে। আমার বিশ্বাস আজ যদি তুমি সমস্ত ছেড়ে আমার পিছু পিছু নেমে এসো তাহ'লেও সেই অতৃপ্তি সমানে চ'লবে। মানুষ যাকে ভালবাসে তাকে পায় না কখনও, অন্তত এই পৃথিবীর ধূলায়—কাজেই তুমি থাকো। আমার মানসী-প্রিয়ার স্থান আমাকে পূর্ণ ক'রতে হবে অন্য উপায়ে। তুমি রবে আমার জীবনে না-পাওয়া, তাই সমগ্র বিশ্বের মাঝে তোমাকে পাবো একান্ত আপনার ক'রে, একান্ত প্রিয় বলে—তোমার জীবন তুমি আনন্দে, ব্যসনে পূর্ণ ক'রে ধন্য হও—আমি নিষ্ফলের দলে রবো তাতে আমার অভিমান নেই, দুঃখ নেই; আজ যেন আমি সব কিছুরই অতীত।

অমল থামিল। অপর্ণাও কিছু বলিল না। মাটির পরে দৃষ্টি রাখিয়া আনমনে অপর্ণা দূর্ব্বা ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া স্তূপীকৃত করিয়া রাখিল। ক্ষণকাল পরে অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আমাকে আশ্রয় দেওয়ার সাহসও কি তোমার নেই।

অমল ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—না, তোমার নিজে এসে অধিকার ক'রবার শক্তি যদি না থাকে তবে আমার সে সাহস নেই। আমি জানি সেকেণ্ড ক্লাস পেলে কি হবে, হয় স্কুলমাষ্টারী না হয় সদাগরী অফিসে কেরাণীগিরি। সেই অস্বচ্ছল গৃহে তোমার স্থান নেই, যদি না তুমি সমস্ত ত্যাগ ক'রে আপনি এসে আশ্রয় নাও। তুমি জানো না—

অমল অকস্মাৎ রুদ্ধকণ্ঠে চুপ করিয়া গেল। অপর্ণা চাহিয়া দেখে অমলের চোখ দুইটি তাহার মতই আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছে। অপর্ণা অমলের এই আকস্মিক পরিবর্ত্তনে ব্যথিত হইল কিন্তু এমনি উত্তেজিত ভাব-তরঙ্গের সম্মুখে তাহার অসহায় ভাষা আর একবার প্রতারণা করিয়া গেল।

অমল অপর্ণার হাতখানিকে দৃঢ়মুষ্টিতে চাপিয়া ধরিয়া কি যেন বলিতে গেল—ওষ্ঠ কয়েকবার কাঁপিয়া কাঁপিয়া থামিয়া গেল। অমল অব্যক্ত একটা বেদনাকে দৃঢ়মুষ্টিতে নিষ্পেষিত করিয়া দিয়া যেন উঠিয়া দাঁড়াইল এবং কিছু না বলিয়াই দ্রুত পদক্ষেপে চলিয়া গেল।

অপর্ণা বিস্তীর্ণ মাঠের মাঝে একাকী অসহায়ভাবে বসিয়া থাকিয়া দেখিল—অমল চলিয়া গেল, একবার ফিরিয়াও চাহিল না। তবুও সে নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়াই রহিল।

সমগ্র রাত্রি একটা অনির্দ্দিষ্ট তিক্ত বেদনায় কাটিয়া গিয়াছে—ঘুমাইতে চেষ্টা করিয়াও ঘুম আসে নাই। অমল অপ্রসন্ন মনেই সকাল ৮টায় জাগিল এবং ক্লান্ত ও অবসন্ন অন্তরে আজকার কর্ত্তব্যের কথা মনে হইল। আর একটি স্থানেও শেষ বিদায় লইয়া আসিতে হইবে। খোকাকে পড়ান ছাড়িতে হইয়াছে, সেখানে মাহিনা বুঝিয়া আনিতে হইবে এবং হয়ত রমলাকে বলিয়া আসিতে হইবে—এই অকিঞ্চিৎকর পরিচয়কে ভুলিয়া যাইও, যদি আমাকে একটুও ভালবাসিয়া থাকো তবে তাহাও ভুলিও।

রমলাদের বাড়ীতে সে যখন আসিয়া উপস্থিত হইল তখন বেলা প্রায় দশটা। তাহার বাবা অফিসে গিয়াছেন, খোকা স্কুলে যাইতেছে, তাহার মাতা পিতার সঙ্গে পিত্রালয়ে গিয়াছেন। রমলা বাড়ীতে অন্যান্য ভাই-বোনদের সঙ্গে রহিয়াছে—সে কলেজে যাইবে না।

পড়িবার ঘরে রমলা চা ও প্রচুর খাবার লইয়া প্রবেশ করিল। অমল হাসিয়া বলিল—এত খাবার কি একজনে খেতে পারে ?

—কষ্ট করেই না হয় খেলেন। আর কবে—সম্ভবতঃ আর দেখাই হবে না। রমলা আঁচলের খুঁট হইতে দু'খানা নোট খুলিয়া টেবিলের উপর রাখিল। পুনরায় বলিল—বাবা দিয়ে গেছেন—

অমল চা খাইয়া শেষ করিলে, রমলা বলিল—আপনি ত আমাদের কথা ভুলে যাবেন, কিন্তু আমি এখানে আপনার লেখা কবিতা গল্প কাগজে পড়ে কত কথা স্মরণ ক'রবো। মনে মনে হয়ত ভাববো—এর মাঝে অতীতের কোন্ প্রশ্ন আছে কে তা জানে !

অমল টাকাটা পকেটে রাখিয়া কহিল—ভগবান করুন আপনারা যেন আমাকে মনে রাখতে পারেন। এ অভাগ্যকে কেউ ত মনে রাখবে না।

—আপনার সঙ্গে যার এতটুকুও পরিচয় আছে, সে আপনাকে ভুল্‌তে পারবে না।

—শুনেও তৃপ্তি।

রমলা কি যেন একটা প্রসঙ্গ তুলিবে স্থির করিয়াছিল, কিন্তু তুলিতে পারিতেছিল না। তাই নেহাৎ আকস্মিকভাবেই প্রশ্ন করিল - এইখানেই কি আমাদের পরিচয়ের শেষ ?

অমল কাল বৈকালে যেমন করিয়া এই প্রশ্নের জবাব দিয়াছিল আজও ঠিক তেমনি করিয়াই মুখস্থ কবিতার মত সেই কয়েকটি কথা বলিয়া গেল। রমলা সোৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া শুনিতে লাগিল। পরিশেষে অবনত মুখের কণ্ঠস্বর ঈষৎ কাঁপাইয়া প্রশ্ন করিল—আমাকে ভুল বুঝেছেন কিনা জানি না, তবে আপনার কি কিছুই ব'লবার নেই আজ ?

—যা ব'লবার ছিল তা না বলাই ভাল। যখন যেতেই হবে তখন সংশয়ের বোঝাকে ফেলে রেখে যাওয়া অত্যন্ত কাপুরুষতা হবে। দুঃখের সঙ্গেও সংশয় জীবনকে হয়ত কিছু সান্ত্বনা দেবে।

—আমি কি এখানে এমনি ক'রেই রবো ?

অমল ধৈর্য্য হারাইয়াছিল—কলিকাতার এই ঐশ্বর্য্যকে ছাড়িয়া ফিরিয়া যাইতে সে অত্যন্ত উৎসুকভাবে নির্দ্দিষ্ট ট্রেণের সময়ের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল তাই বলিল—মিস্ মিত্র আজ সত্য কথা ব'ল্‌তে আপত্তি নেই।

মনটা আমার এমন একটা অবস্থায় পৌঁচেছে যেখানে সেটা যে কোন মুহূর্ত্তেই ভেঙেগ পড়তে পারে। আমি কি ক'রতে পারি, আমার মত অভাগা আপনার কোন্ সাহায্য ক'রতে পারে? আমাকে যদি ভালবেসে থাকেন তবে সেই স্মৃতিকে পুণ্যস্মৃতি মনে করে সারাজীবন সগৌরবে বহন করা যেতে পারে, সে করুণাকে স্মরণ ক'রে আনন্দ করা চলে কিন্তু আপনার মত, যারা ফুলের শ্রী-সৌন্দর্য্য-কোমলতা নিয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে তাদের মত মেয়েকে কেমন ক'রে আমার জীর্ণ কুটীরে অশেষ দৈন্য দুঃখের মধ্যে আহ্বান করি? সেখানে সেই বিবস্ত্র নিগ্রহ যে আমাকে ক্রমাগত বৃশ্চিকের মত দংশন ক'রে ফিরবে।

রমলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—কিন্তু সে নিগ্রহকে আমি যে আপনার জন্যে সাগ্রহে সানন্দে সহ্য ক'রতে পারি এ কথাটা কোন দিন জানাতে পারি নি। সমাজ সংসার সকলের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে সংগ্রাম ক'রবার শক্তি আমার আছে। এ বিশ্বাস আপনার না থাক্‌লেও আমার আছে।

—আর সে মন-বল চিরদিন সমান ভাবেই থাক্‌বে?

—থাক্‌বে—না থাক্‌লেও তার জন্যে অভিযোগ করা যাবে না।

অমল মুখ তুলিয়া চাহিল—রমলাকে এমন ভাবে কথা বলিতে সে কোন দিন দেখে নাই। তাহার কণ্ঠের দৃঢ়তা, তাহার নিষ্পলক চক্ষুর শ্রান্ত দৃষ্টি অমলকে মুগ্ধ করিয়া দিল। এই মেয়েটির অন্তরে এমন শক্তি ছিল, এমন করিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবার শক্তি ছিল তাহা সে পূর্ব্বে কখনও কল্পনা করে নাই। এই হৃদয়োচ্ছ্বাসের সম্মুখে দাঁড়াইতে তাহার সাহস হইতেছিল না। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—দারিদ্র্য কি, কি তার জ্বালা তা গল্প উপন্যাসে বোঝা যায় না মিস্ মিত্র, সেখানে সমস্ত মানব-মন, ভালবাসা প্রীতি শ্রদ্ধা সবার উপর একটি সত্য জেগে রয়—সেটা অপার লজ্জা, অপার একটা ঘৃণা। সব পারলেও মানুষ সেটা সহ্য ক'রতে পারে না।

রমলা উঠিয়া দাঁড়াইয়া আরক্তমুখে কম্পিতকণ্ঠে কহিল—তবে আমার অন্তরের কি কোনও মূল্য নাই আপনার কাছে? এই নির্লজ্জ আত্মপ্রকাশ, এই ভালবাসা……এই কি শেষ বিদায়? তীব্র অভিমানে তীব্রতর দুঃখে, হতাশায় রমলা ঝর ঝর করিয়া কাঁদিয়া ফেলিল!

অমল অকস্মাৎ রমলার এই চোখের জলে বিব্রত হইয়া পড়িল। রমলার কাঁধের উপর হাত রাখিয়া মৃদু আকর্ষণে বুকের অতি সন্নিকটে আকর্ষণ করিয়া কহিল—আমাকে ভুলে যান, আমি যতই নিষ্ঠুর হই, যতই নির্ম্মম হই আপনাকে আমার সঙ্গে সঙ্গে দুর্ভাগ্যের গভীরতম প্রদেশে নিয়ে যেতে পারবো না। আমাকে ক্ষমা ক'রবেন—যে অযোগ্য সে অযোগ্যই, তার দুর্ভাগ্যকে মার্জ্জনা ক'রবেন—

অমল রমলাকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া, দরজা ঠেলিয়া দ্রুতপদে রাস্তায় আসিয়া নামিল। আপনার অবাধ্য চোখ দুইটিকে পরিষ্কার করিয়া আবার চলিতে লাগিল—

উপর্য্যুপরি উত্তেজনাপূর্ণ ঘটনার মাঝে অমলের সমস্ত অন্তর দুঃখে বেদনায়, আপনার প্রতি, অদৃষ্টের প্রতি, দারিদ্র্যের প্রতি ধিক্কারে মরিয়া হইয়া উঠিয়াছিল। এই পরিবেশকে ত্যাগ করিবার দুর্জ্জয় বাসনাকে সে কিছুতেই দমন করিতে পারিতেছিল না, তাই আজই রাত্রে জন্ম-পল্লীর স্নেহাঞ্চলে ফিরিয়া যাইবে স্থির করিল এবং সেই ঝোঁকে অযত্ন বিন্যস্ত রুক্ষ একরাশ চুল ও আধময়লা একটি সার্ট গায়ে দিয়াই সে অপর্ণার বাড়ীতে যাইয়া উঠিল।

তখন সবে সন্ধ্যা হইয়াছে, শ্রাবণের সমস্ত আকাশ ঘন মেঘে অবলুপ্ত হইয়া পৃথিবীর উপরে কালো যবনিকার মত আলোকের পথ রোধ করিয়া বিধবার অবগুণ্ঠনের মত বেদনার্ত্ত ভঙ্গিতে চাহিয়া আছে। অমল সহজ

সরল পদক্ষেপে সামনের কক্ষে প্রবেশ করিয়া দেখিল—আলোকোজ্জ্বল কক্ষে, অপর্ণা, করুণা ও তাহাদের মাতা বসিয়া আছেন।

মাতা অভ্যর্থনা করিলেন—এস অমল, কবে বাড়ী যাবে?

অমল সামনের চেয়ারটায় বসিয়া কহিল—আজই।

—আজই? কেন?

—হ্যাঁ, বৃথা অপেক্ষা ক'রে লাভ কি?

অপর্ণা অমলের চেহারা দেখিয়া শঙ্কিত ভাবে প্রশ্ন করিল—চেহারা অমন হ'য়েছে কেন?

—পরীক্ষার পড়া পড়তে পড়তে।

অপর্ণা জানে একথা কত বড় মিথ্যা। পরীক্ষার জন্য সে আদৌ চিন্তা করে নাই, তাহা হইলে নিশ্চিত সেকেণ্ড ক্লাসকে সে এমন করিয়া মানিয়া লইতে পারিত না।

অবান্তর কথার মাঝে চা ও খাবার আসিল। অমল খাবারটা ঠেলিয়া রাখিয়া চা খাইয়া ফেলিল। অপর্ণা প্রশ্ন করিল—এটা খেলে না যে!

—ইচ্ছে নেই।

অমলের শুষ্ক কঠোর কণ্ঠস্বর ও কোটরগত চক্ষুর তীব্র দৃষ্টিতে অপর্ণা শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাই অবনত মস্তকে সে টেবিলটির উপরে কি যেন দেখিতেছিল।

মাতা বলিলেন—শুনে বোধ হয় সুখী হবে, শ্রাবণের শেষেই অপর্ণার বিবাহের দিন স্থির ক'রেছি অজিতের সঙ্গেই। তোমার বুদ্ধি ও উদারতার প্রশংসা শত মুখে ক'রবো। তোমার কথা আমি ভুলতে পারবো না—মনে যে ইচ্ছা ছিল তা ত হ'ল না।

অমল কহিল—আনন্দেরই ত কথা। আনন্দিত হব না কেন?

—সে পর্য্যন্ত ত তুমি থাকলে না, আবার কি আসতে পারবে?

—এ শুভকার্য্যে যোগদান ক'রবার ইচ্ছে রইল—আশা করি এসে পড়তে পারবো--

—বেশ বেশ, খুব চেষ্টা ক'রো। অপর্ণাও আজ যখন এ বিয়েতে মত দিয়েছে তখন আর দেরী করা সঙ্গত বোধ ক'রলাম না। না হ'লে অগ্রাণে হ'তে পারতো—

অমল দুঃখে লাঞ্ছনায় নিরুত্তর হইয়া গেল। বাড়ীতে যক্ষ্মারোগী তিলে তিলে নিশ্চিত মৃত্যুর সম্মুখীন হইতেছে জানিয়াও যেমন চরম মুহূর্ত্তে আত্মীয় পরিজন হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠে; শেষ কথা কয়েকটির সঙ্গে সঙ্গে অমলের অন্তরও তেমনি অসহ্য বেদনায় মোচড় খাইয়া হা হা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। অকস্মাৎ বুকের মাঝে একেবারে খালি হইয়া গিয়াছে এমনি একটি শূন্যতার আঘাতে সে বসিয়াই রহিল কোন জবাব দিল না, অপর্ণার পানেও চাহিল না।

মাতা ধীরে ধীরে উঠিয়া চলিয়া গেলেন। আলোকোজ্জ্বল কক্ষের মাঝে অপর্ণা ও অমল মুখোমুখি চুপ করিয়া বসিয়া রহিল—অনেকক্ষণ। তীব্র ভৎর্সনায় অপর্ণাকে বিদীর্ণ করিয়া দিয়া যাইবে মনে করিয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু কেমন করিয়া কথায় সে তাহার তীব্র হৃদয়াবেগ প্রকাশ করিবে বুঝিয়া পাইল না—যদি আজ ডাকিয়া আনিয়াছিলে এই কথাই শুনাইতে, তবে এ ডাকার অর্থ কি? এমন করিয়া নিষ্ঠুর করাল ছুরিকাঘাতে তাহার হৃদয়কে কেন মুহূর্ত্তে রক্তাক্ত করিয়া দিলে? কিন্তু অমল কিছুই বলিতে পারিল না। দাঁড়াইয়াই রহিল—

অপর্ণা ধীরে ধীরে আনমিত আঁখির দৃষ্টি তুলিয়া অমলের মুখের উপর রাখিল। আয়ত বেদনার্ত্ত দুই চক্ষু হইতে দুই ফোঁটা অশ্রু মুক্তার মত গড়াইয়া আসিয়া গণ্ডে থামিল। অস্পষ্ট বিচ্ছিন্ন কণ্ঠে সে কহিল—এখনই যাবে?

অমল প্রবল চেষ্টায় আত্মদমন করিয়া, উৎসারিত অশ্রুবিন্দুর কণ্ঠ রোধ করিয়া কহিল—হুঁ এবং সঙ্গে সঙ্গে দ্রুত পদে সিঁড়ি পার হইয়া রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইল। চোখের ঝাপসা দৃষ্টির সাহায্যে পথ চলা যায় না—ঘনান্ধকার আকাশের গায়ে অপর্ণাদের আলোকোজ্জ্বল বাড়ীখানা তাহারই অশ্রুর প্রলেপে সিক্ত হইয়া উঠিয়াছে, তাহারই হৃদয় শোণিতে রক্তাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। জীবনের মত তাহা অন্ধকারে আপনাকে হারাইতে চলিয়াছে। অন্ধ দৃষ্টিতে লোহার গেটটা ধরিয়া অমল দাঁড়াইয়া রহিল, পুঞ্জীভূত অভিমান ও বেদনা কণ্ঠের মধ্যে উন্মত্ত কোলাহলে তাহাকে মূক করিয়া দিয়াছে। মনে মনে সে কহিল—অপর্ণা তুমি জানো না, তোমারই জন্যে আজ তোমাকে ত্যাগ করিয়া গেলাম—জীবনের সমস্ত সঞ্চয় উষ্ণ রক্তাপ্লুত ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের মত পথপ্রান্তে ফেলিয়া রাখিয়া গেলাম—তুমি জানিলে না, জানিবে না।—জীবনের চরমতম বিদায় মুহূর্ত্ত আজ মৌনবেদনায় কতখানি দুর্ব্বিসহ।

ঝম্ ঝম্ করিয়া বৃষ্টি নামিয়া পড়িল—ধীরে ধীরে ঘন বৃষ্টির অন্তরালে অপর্ণাদের আলোকোজ্জ্বল জানালা একটি একটি করিয়া আকাশের পটে নিভিয়া গেল। অমল ভিজিতে ভিজিতে গাঢ়তম দীর্ঘশ্বাসে বিদায়ক্ষণ ঘোষণা করিয়া একাকী, অত্যন্ত একাকী—সহরের একক জনারণ্যে আপনাকে মিলাইয়া দিল।

পনের

অমল আজ কয়েকদিন বাড়ী আসিয়াছে, কিন্তু মায়ের চোখে তাহার মানসিক ও সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক পরিবর্ত্তন আত্মগোপন করিতে পারে নাই। অমল পলাইয়া পলাইয়া সংগোপনে একটা অব্যক্ত অপ্রকাশ্য বেদনার দহনে ক্ষয়িষ্ণু শিলার মত ধীরে ধীরে যে শুকাইয়া যাইতেছে সে কথা মা বুঝিয়াছেন, কিন্তু কিছুই করিতে পারেন নাই। অমল কোথা হইতে বুকে কাঁটা বিঁধাইয়া রক্তাক্ত দেহে তাঁহার কাছে ফিরিয়া আসিয়াছে তাহা তিনি বুঝেন নাই বটে, কিন্তু সে ক্ষতে শীতল জননী-স্নেহের-প্রলেপ দিয়া আরোগ্য করিতে চাহিয়াছেন; কিন্তু অমল কেবলই লুকাইয়া বেড়ায়, তাঁহার সামনে ধরা দেয় না।

অমল দ্বিপ্রহরে শুইয়াছিল—শ্রাবণের আকাশ মেঘ-মেদুর। পুরাতন দালানের স্বল্পালোকে গৃহ আরও অন্ধকার হইয়া উঠিয়াছে। মাতা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া গায়ে হাত বুলাইতে বুলাইতে কহিলেন—তোর কি হয়েছে বল ত—

অমল মিথ্যা কথা কহিল—কিছুই ত হয়নি মা।

একটু হাসিয়া মা কহিলেন—তোকে এত বড় করলুম, আর আজ তোর মনকে তুই আমার কাছে গোপন করবি, এ কি সম্ভব? কি হয়েছে বল—

—পরীক্ষা ভাল হয়নি তাই। সেকেণ্ড ক্লাস হ'লে ত ভাল হবে না মা—

—ভাগ্যকে কেউ রোধ ক'রতে পারে না বাবা। পড়ার খরচ ওরা দিতে চেয়েছিল, যদি হ'ত, তবে হয়ত এমন খারাপ হ'ত না—কিন্তু

ভাগ্য বলবান। সেজন্যে দুঃখ করিস্ নে। ভগবান দিলে সেদিন সমস্ত একসংগে সুদে আসলে উঠে আস্‌বে—

অমল কোন সান্ত্বনাই পাইল না। সে আর একটি প্রস্তাবের জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। মা তাহাই বলিলেন—ভাল হোক্ মন্দ হোক্ পরীক্ষা ত হ'য়ে গেল, এখন গৌরীর মাকে কি ব'লবো। আমার কথায় তারা অন্য সমস্ত সম্বন্ধ ছেড়ে দিয়েছে—আর গৌরীকে ঘরে না আন্‌লে আমারও যেন শান্তি নেই, ওর স্থান আর কেউ পূরণ ক'রতে পারবে না—

অমল জবাব দিল না। কি হাস্যকর তাহার জীবন? আজ মায়ের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি কি তাহার মধ্যে অবশিষ্ট আছে? জীবনের যত সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে সে ফেলিয়া আসিয়াছে বর্ণমুখর সেই সন্ধ্যায়—সে আর ফিরিবে না; কিন্তু মার এই ইচ্ছাকে, এই সস্নেহ বাসনাকে সে কেমন করিয়া ফিরাইয়া দিবে?

মা ধীরে ধীরে কহিলেন—গৌরীকে তুই চিনিস্ না। আমি চিনি—তার অন্তরের কথা আমার কাছে গোপন নেই—তার অন্তর জলের মত স্বচ্ছ হ'য়ে আছে আমার কাছে। যেদিন তাকে ব'ললাম, আমার ঘরে বোধ হয় তোকে আনতে পারলাম না গৌরী, তখন তার মুখে যে বেদনা ভেসে উঠেছিল তা'ত আমার সবই জানা। জীবনে কোনদিন সুখ যাকে বলে তা ভোগ করিনি, তোর মুখের পানে চেয়ে দিনের পর দিন কত লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য ক'রেছি, কিন্তু প্রতিবাদ করিনি। তোকে আমি জোর ক'রবো না, তবে—

মা আর বলিতে পারিলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল। নীরবে দুই বিন্দু অশ্রু মুক্ত করিয়া দিয়া তেমনি ভাবে বসিয়া রহিলেন।

অমল দ্রুত ভাবিয়া যাইতে লাগিল—জীবনে সে ত কাহাকেও সুখী করিবার পক্ষে একান্তই অযোগ্য। মায়ের ইচ্ছা ও অনুরোধকে

এখুনি মুহূর্ত্তে ধূলিসাৎ করিয়া দিতে পারে—যেমন করিয়া অপর্ণার মা একটি কথায় তাহার তাসের ঘর উড়াইয়া দিয়াছিল—কিন্তু তাহাতে কি আসে যায়। নিজের জীবনের প্রতি একটা চরম ধিক্কারে তাহার অন্তর বিষাক্ত হইয়াছিল তাই ভাবিল—যদি পরের জন্য সে আজ অকিঞ্চিৎকর জীবনের বাসনাকে ত্যাগ করে তবে তাহাতেই বা কি ক্ষতি? মাতা পার্শ্বে বসিয়াই অশ্রুমোচন করিতেছেন—গৌরী তাহারই জন্য মুখ ভার করিয়া বিষাদার্ত্ত চিত্তে দিন গণিতেছে।

অমল কহিল—আজ চাকুরী নেই। গৃহে অন্নের সংস্থান নেই, এই বুভুক্ষু গৃহের মাঝে আর একজনকে নিমন্ত্রণ ক'রে কি খেতে দেবে মা?

মা হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিলেন—তোর জ্ঞানবুদ্ধি হবার আগে যে তোর ভাবনা ভেবেছে সেই আজ গৌরীর ভাবনা ভাববে। যেদিন হামাগুড়ি দিয়ে এই উঠানে ঘুরে বেড়াতিস্ সেদিন তোর ভাবনা কে ভেবেছিল? আজ তুই নতুন ক'রে আমার ভাবনা ভাবছিস্—তাই না?

অমল চুপ করিয়া রহিল, এ প্রশ্নের বিরুদ্ধে যুক্তি থাকিতে পারে কিন্তু জবাব নাই। স্নেহের গভীরতম প্রকাশের জবাব নাই, তাই অমল চুপ করিয়াই রহিল।

মা আবার বলিলেন—জোর ক'রে কখনই আমি তোকে বিয়ে দেব না। তবে আমার জীবনের ইচ্ছা তোকে জানালাম, তোর যেমন ইচ্ছা করিস্। আমার জীবনের আজ শেষ, তোর আরম্ভ—কাজেই আমার ইচ্ছার আজ কোন মূল্য নাই—

অমল বিচলিত হইয়াছিল। সে প্রশ্ন কহিল—গৌরীকে বিয়ে ক'রলে তুমি কি সত্যিই সুখী হবে মা?

মা বলিলেন—হ্যাঁ। পরকালে যেয়েও এ শান্তিকে আমি ভুলবো

না। তোকে কেবলমাত্র গৌরীর হাতে দিয়েই নির্ভাবনা হ'তে পারি, অন্য কোথায়ও রেখে আমার শান্তি নেই।

অমল মরিয়া হইয়া, কোন চিন্তা না করিয়া জবাব দিল—তবে তাই হোক্। তোমার ইচ্ছাকে পরিপূর্ণ করাই আমার তৃপ্তি। আমার কাছে এর চেয়ে বড় দেবার আর কিছুই নাই—

শ্রাবণের শেষে এক শুক্লা রজনীর কর্ম্ম-কোলাহল-মুখরিত নিশীথে অমলের সহিত গৌরীর শুভবিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে—প্রচুর অর্থ ও বস্তুর অপচয় এবং অকারণ আড়ম্বরের মাঝে।

আজ ফুলশয্যার রাত্রি। ভিজা গাছের ফাঁকে শুভ্র জোছনা উঠানে, গৃহে, অমলের ফুল-সুরভিত শয্যায় আসিয়া পড়িয়াছে। বাগানের ভিজা পাতা হইতে একটা প্রথম যৌবনের মত চাপা উত্তপ্ত তৃষ্ণা যেন রহিয়া রহিয়া বাতাসে দীর্ঘশ্বাস নিষ্ক্রান্ত করিয়া দিতেছে। আকাশের গায়ে শুভ্র, ধূসর কালো নানা অবয়বের মেঘমালা পাল তুলিয়া চলিয়াছে—দূরের পানে।

উৎসব বাড়ীতে কর্ম্মকোলাহল প্রায় থামিয়া আসিয়াছে। পাড়ার এয়োস্ত্রীগণ মাঙগলিক আচার শেষ করিয়া বর-বধূকে ফুলশয্যায় রাখিয়া গিয়াছে। চারি পাশে গভীর নিশীথের একটা স্তব্ধতা রহিয়া রহিয়া শঙ্কিত শব্দে যেন ধরিত্রীর হৃদ্‌কম্পন অনুভব করিতেছে—

অমল শয়নগৃহে এক চেয়ারে বসিয়া, আলোটা সাম্‌নে রাখিয়া অনির্দ্দিষ্ট, বিচ্ছিন্ন কতকগুলি ভাবনার মাঝে সমাহিত হইয়া ছিল। পার্শ্বের শুভ্র মাল্যে শোভিত শয্যায় এক রঙীণ কাপড় পরিয়া অবগুন্ঠিত গৌরী নির্জ্জীব জড় পদার্থের মত স্পন্দনহীন দেহ এলাইয়া শুইয়া আছে। অমল সেদিকে চাহিয়া দেখে নাই।

মাতা উঠান হইতে আদেশ করিলেন—অমল, ক'দিন ঘুমোস্ নি। আলো নিবিয়ে শুয়ে পড়। শরীর খারাপ ক'রবে।

অমল আলো নিভাইয়া শুইয়া পড়িল—অবগুণ্ঠিতা গৌরীর পাশেই। পূবের জানালা দিয়া মেঘাবগুণ্ঠিতা চাঁদের ম্লান আলো বিছানার উপর আসিয়া পড়িয়াছে। প্রতিফলিত আলোকে গৌরীকে দেখা যায় আত্মীয় পরিজনহীন বাড়ীখানি নীরব—

অমল ভাবিতেছিল—অপর্ণাকে লইয়া বালিগঞ্জের একখানা বাগান বেষ্টিত বাড়ীতে গৃহ রচনা করিবে কিন্তু আজ সে কোথায়? আজকার দিনে সেও হয়ত এমনি স্বামী পার্শ্বে শয়ন করিয়া তাহারই কথা ভাবিয়া চলিয়াছে—না হয় পিতৃগৃহে একাকী শয্যায় পড়িয়া অতীতের সঞ্চিত স্মৃতি গণিয়া গণিয়া মনের নিভৃত কোণে সঞ্চয় করিতেছে। সে যেমন আজ জীবনের ঘনিষ্ঠতম, নিকটতম, প্রিয়তম সঙ্গীর সঙ্গে বৃহত্তর আত্ম-প্রবঞ্চনা করিতে চলিয়াছে, সেও হয়ত তেমনি করিবে—হয়ত করিবে না। হয়ত দু'দিনের ব্যসন বিলাসকে ভুলিয়া জীবনের সঙ্গে নূতন উদ্যমে চলিবে—

...আর গৌরী! শয্যার একাংশ অধিকার করিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে হয়ত তাহারই সম্বোধনের জন্য, দুর্ব্বলতম আহ্বানের জন্য অধীর প্রতীক্ষা করিতেছে। ও জগতে সম্পূর্ণ নিরপরাধা, বৎসরাধিক নীরব করুণ চাহনিতে কি চাহিয়াছে তাহা সেই জানে—হৃদয়ের মাঝে নিভৃত কোণে হয়ত তাহারই মন্দির রচনা করিয়াছে। ওই কোমল, সুন্দর পবিত্র সহিষ্ণু নারীকে অসুখী করিবার মাঝে, তাহাকে বঞ্চিত করিবার মাঝে কোনো পৌরুষ নাই, কোন বীরত্ব নাই।

গৌরীর হাতের সোনার চুড়িগুলি জ্যোৎস্নালোকে ঝিক্‌মিক্ করিতেছিল। সে হাতখানাকে ধরিয়া মৃদু আকর্ষণ করিয়া কহিল—গৌরী এদিকে এসো—

গৌরী নড়িল না। অমলের হাতখানার মাঝে গৌরীর কোমল শুভ্র হাতখানি থর থর করিয়া কাঁপিতেছে—সেখানাকে ছিনাইয়া লইবার

শক্তি তাহার নাই। অমল মৃদু আকর্ষণে গৌরীকে বুকের অতি সন্নিকটে টানিয়া আনিল—তাহার বুকের মাঝে গৌরীর ভীরু অন্তরের দুরু দুরু শব্দ প্রতিধ্বনিত হইতেছে—উন্মোচিত অবগুণ্ঠন, গৌরীর অনাবৃত অসাড় মুখখানি জ্যোৎস্নালোকে অস্পষ্ট দেখা যাইতেছে—

অমল ভাবিতেছিল—বালিগঞ্জের পার্কে জ্যোৎস্নালোকিত অপর্ণার সেই মুখখানির কথা—সে অতুল সৌন্দর্য্য তাহার অন্তরকে কি দুর্নিবার আকর্ষণেই না টানিতেছিল—কিন্তু তাহার উপরে ওষ্ঠ সংস্থাপিত করিয়া হৃদয়ের সুধা নিঃশেষে পান করিবার তৃষ্ণা তাহার মিটে নাই। সে পিপাসা বুকে লইয়া ফিরিয়াছে আজ নূতন লোকে আপনার তৃষ্ণা নিবারণ কল্পে। অমল ধীরে নিঃশব্দে সেই জ্যোৎস্না-বিধৌত মুখখানাকে একটি চুমায় আরক্ত করিয়া দিল।

কম্পমান চকিত গৌরী জানিল না আজ সে যে চুম্বন তাহার দেহে লাভ করিয়াছে তাহা অন্তরের প্রান্ত দিয়া লুকাইয়া বালিগঞ্জ পার্কের জ্যোৎস্না-স্নাত আর একটি ওষ্ঠের উপর পড়িয়া তাহাকে কত বড় প্রবঞ্চনা করিয়াছে!

অমল অকস্মাৎ থামিয়া গেল—জীবনের প্রথম ব্যভিচারের অনুশোচনায়, আপনার নীচতায়, প্রবঞ্চনায়, একটি অপরিসীম লজ্জায় সে সংকুচিত হইয়া গেল—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ক্ষরিত উত্তপ্ত অশ্রু উৎসারিত করিয়া মনে মনে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল—এই মানব হৃদয়! এই প্রেম! এই জীবন! আজ এমনি করিয়া অপর্ণা তাহার পার্শ্বে থাকিলে হয়ত তাহার ব্যভিচারী অন্তর গৌরীর ওষ্ঠ বারবার গোপন চুম্বনে রাঙাইয়া তুলিত। সমগ্র জীবনে এই ব্যভিচারের অভিশাপ বহ্নিশিখার মত পরিব্যাপ্ত হইয়া মানুষের অন্তরকে অতৃপ্তির অনলে পোড়াইয়া আংগার করিয়া তুলিয়াছে। তার অহংকার নিষ্ফল—একেবারেই নিষ্ফল।

দ্বিতীয় অঙ্ক

ষোল

প্রায় সাত বৎসর পরের কথা।

অপর্ণা ফার্স্ট ক্লাস পাইয়াছিল, কিন্তু অমল পায় নাই; সুতরাং প্রফেসারী চাকুরী তাহার জুটে নাই। বর্তমানে এক সওদাগরী আফিসে সে চাকুরী করে, বেতন আশি টাকা। অজিতবাবুর সহিত অপর্ণার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং সেই সঙ্গে অমল ও তাহার জীবনের যোগসূত্রও ছিঁড়িয়া গিয়াছে। গৌরী আজ অমলের গৃহবধূ—তাহাদের একটি ছেলে—বয়স বছর চারেক হইবে। নাম সাধারণ—খোকা। অমল কবিতা লেখা ছাড়িয়া মাঝে মাঝে গল্প লিখে, কারণ তাহাতেই কিছু পাওয়া যায়। তাহার মা আজিও বাঁচিয়া আছেন—গৌরীর হাতে নিজ পুত্রকে দিয়া প্রস্থান করিতে পারেন নাই।

কয়েকদিন মাত্র হইল অমল নতুন বাসায় উঠিয়া আসিয়াছে—বাসা ভাল বলিয়া নয়, ভাড়া কম বলিয়া।

বড় একটা বাড়ীর ছায়ায়, কলিকাতা শহরের একটি নগণ্য গলিতে অমলের বাসা। দু'খানি ঘর একতলায়, বাড়ীটি একতলা তাই আলো বাতাস কিছু আছে, একটু বাঁধানো উঠান—তাহার এক পাশে একখানা ছোট টালির চালায় রান্নাঘর—পাশে কল, চৌবাচ্চা। অমলের কবি-মন নিরস উঠানের এক কোণে টবে করিয়া কয়েকটি ফুলগাছ করিয়াছে—

তাহার পাশেই পাশের বড় বাড়ীখানার ভাংগা কাঁচকণ্টকিত বিরাট প্রাচীর, তার পরে ওই বাড়ী, আকাশ পর্য্যন্ত উঠিয়া ছোট বাড়ীখানার শ্বাসরুদ্ধ করিয়া দিয়াছে। ও বাড়ীর ঝুল বারান্দায় দাঁড়াইলে, এ বাড়ীর ভিতরে প্রায় সবই দেখা যায়, কিন্তু এ বাড়ী থেকে ও বাড়ীর ওই বারান্দা আর রঙীন পর্দ্দার ঝটপটি ছাড়া কিছুই দেখা যায় না। এক ঘরে মা ও তাঁহার পূজার সরঞ্জাম প্রভৃতি থাকে, অন্য ঘর অমলের বাসগৃহ। ঘরের সামনের বারান্দাটা খোকার ক্রীড়াংগন, ভাংগা ঘোড়া, লাঠি, ছেঁড়া ন্যাকড়া, পুরাতন পাঁজি প্রভৃতি নানা মহার্ঘ্য বস্তু সেথায় ক্রমাগতই সঞ্চিত হইয়া উঠে। খোকা কখনও নগ্ন অবস্থায় কখনও ইজের পরিয়া সমস্ত উঠান পরিক্রমা করিয়া বেড়ায় এবং ফাঁক পাইলে সদর দরজা পার হইয়া রাস্তায় চলিয়া যায় এবং বিস্মিত কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়া যাহা কিছু দেখে তাহাতেই অপূর্ব্ব আনন্দ প্রকাশ করে।

সেদিন শনিবার। কার্ত্তিকের মাঝামাঝি, কলিকাতায় তখনও শীত পড়ে নাই। কিন্তু উত্তরের বাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। অমলের ফিরিবার সময় হইয়াছে তাই গৌরী সদর দরজায় কান রাখিয়া কি যেন একটা সেলাই করিতেছিল। ঘন ঘন কড়া নাড়ার শব্দ হইতেই সে উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিল—অমলের কড়া নাড়িবার সুর তাহার কাছে পরিচিত—

অমল বাজার হইতে কিছু ফুলকফি প্রভৃতি তরকারী ও মাংস কিনিয়াছিল—বড় রুমালের পোঁটলাটা নাটকীয় ভঙ্গিতে গৌরীর মুখের নিকটে তুলিয়া ধরিয়া অমল আধুনিক সিনেমা-সংগীতের সুরে মৃদু কণ্ঠে গাহিয়া উঠিল—তোমার তরে এনেছি বহি হিয়া, তুমি নিলে না প্রিয়া—

গৌরী ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—তোমার লজ্জা সরম হ'ল না? মা শুনলে কি ভাববেন বল ত? ছেলেটাও ত রয়েছে—

।খোকা মায়ের পিছনে দাঁড়াইয়া এমন ভাবে হাসিতেছিল যেন সেও পিতার রসিকতাটা বেশ উপভোগ করিয়াছে। গৌরী তাহাকে সাম্‌নে আনিয়া কহিল—তোমার কাণ্ড দেখে খোকাও হাসছে—

—তোমার ছেলে ত, একটু অকালেই রসবোধ জন্মেছে—

গৌরী জবাব দিল—পৈতৃক ধারা ত পাওয়া চাই।

মাতা কহিলেন—অমল নাকি রে?

অমল দ্রুত সংযত হইয়া কহিল—হ্যাঁ মা। ফুলকফি আর মাংস এনেছি মা!

—বেশ, কিন্তু এত দেরী ক'রলি কেন?

—ওই বাজারেই একটু দেরী হল। তোমার সাধের বৌমা যা মাংস রাঁধেন তা'ত খাওয়াই যায় না—আজ মাংস রেঁধে একবার দেখিয়ে দিতে হবে—

মাতা কথা কহিলেন না—এ দাম্পত্য কলহকে মনে মনে তিনি উপভোগ করিতেন। কিন্তু গৌরী তাহাকে ফিস্‌ ফিস্‌ করিয়া কহিল—রাঁধুক মা আজ, আপনি কিন্তু দেখিয়ে দিতে পারবেন না।

মা হাসিয়া কহিলেন—আচ্ছা।

অমল যথেষ্ট বীরত্ব সহকারে বারান্দায় মাংস রাঁধিতে আরম্ভ করিয়াছে।

গৌরী তাহার আজ্ঞাবহ হইয়া ফাই-ফরমাজ খাটিতেছে—মসলা বাটা, তরকারী কুটিয়া দেওয়া, তোলা উনুনে আঁচ দেওয়া প্রভৃতি এবং পুত্র খোকা সঙ্গে সঙ্গে বিচরণ করিয়া কখনও শিল হইতে পেষা মসলা চুরী করিয়া তাহার নারিকেলের মালায় সঞ্চিত করিতেছে, কখনও মাতার চুল ধরিয়া টানিয়া তাহাকে ব্যতিব্যস্ত করিতেছে এবং

গৌরীর ধমক খাইয়া শান্ত চিত্তে ভাঙ্গা ঘোড়াকে জোড়া দিতে মনোযোগ দিতেছে।

গৌরী কার্য্যান্তরে গিয়াছে, অমল মাংস সিদ্ধ হইতে দিয়া হয়ত একটু ঘরে যাইবে তাই, খোকাকে বলিল—এ দিকে আসিস্ নে খোকা, ওখানে বসে খেলা কর—

অমল চলিয়া গেল, খোকা হৃষ্ট মনে উঠিয়া দাঁড়াইয়া দেখে কেহ কোথাও নাই, কেবল দূরের বড় বাড়ীটার বারান্দায় কে যেন বসিয়া বই পড়িতেছে। খোকা উনুনের নিকটে দাঁড়াইয়া দেখিল টগ্‌বগ্ করিয়া ফুটিতেছে। গম্ভীর ভাবে কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া সে ভাবিল, কিরূপে শ্রদ্ধেয় পিতাকে সে সাহায্য করিতে পারে। বুদ্ধির অভাব ছিল না, কিছুক্ষণ পূর্ব্বে পিতাকে সে ঘটি হইতে জল ঢালিয়া দিতে দেখিয়াছিল, সে সংক্ষেপে এবং সত্বর বাকী জলটুকু কড়াইতে ঢালিয়া দিয়া তাহা পরিপূর্ণ করিয়া দিল। চাহিয়া দেখিল কেহ কোথাও নাই—দূরের সেই লোকটি তাহার দিকে চাহিয়া কেবল হাসিতেছে। সেও সগর্ব্বে নিজ কর্ম্মের পৌরুষে একটু হাসিয়া দিয়া ফিরিয়া আসিল।

অমল ফিরিয়া দেখে ঝোল ত আদৌ কমে নাই বরং কড়াই পরিপূর্ণ হইয়া ফুটন্ত ঝোল নীরব হইয়াছে। অমল ডাকিল—মা এ দিকে এস, শীগ্‌গির—

মাতা আসিলেন। অমল অভিযোগ করিল—এই দ্যাখো, আড়ি করে কত জল দিয়ে গেছে তোমার বৌমা।

মাতা অবিশ্বাস করিয়া কহিলেন—গৌরী ত পাগল নয় যে, জল ঢেলে দেবে।

—না, তোমার বৌএর কি আর দোষ হতে পারে?

গৌরী আসিয়া দেখিল, আশ্চর্য্যও হইল—কিন্তু অমলের গাম্ভীর্য্য

ও বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল। অমল কহিল—দেখ, আবার হাস্‌ছে—

মা তবুও অবিশ্বাস করিলেন। অমল পুত্রকে প্রশ্ন করিল—খোকা তোর মা জল দিয়েছে কড়াইতে—না ?

খোকা গম্ভীরভাবে কহিল—হ্যাঁ।

মাতা হাসিয়া প্রশ্ন করিলেন—খোকা, ঘটি নিয়েছিলি ?

হুঁ।

—এর ভেতরের জল কি হ'ল ?

—জল ? খোকা উঠিয়া আসিয়া কড়াইটা দেখাইয়া কহিল—এখানে দিলুম।

গৌরী হাসিয়া উঠিল। মা হাসিলেন, অমলও হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—বংশ পরম্পরায় আমার কল্যাণে লেগেছ—ও মাংস কি আর খাওয়া যাবে ?

গৌরী টিপ্পনি করিল—উঠান বাঁকা কিনা !

সতের

আহারাদির পরে অমল কি একটা পড়িতে পড়িতে গৌরীর আগমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। গৌরী মাতার জলযোগের বন্দোবস্ত করিতেছে।

গৌরী ঘরে ফিরিয়া আসিল খোকার দুধ লইয়া। খোকাকে তুলিতে যাইবে এমন সময় অমল বলিল—দাঁড়াও, ও উঠ্‌লে খাওয়াবে। সে অংকগুলো হয়েছে তোমার ? এবার পরীক্ষা তোমায় দিতেই হবে…

গৌরী জনান্তিকে একটু হাসিয়া কহিল—তাই, এবার দিতেই হবে। কিন্তু অঙ্ক যে সব ভুল—

—ভুল ? কখনই না, চেষ্টা করেছিলে।

—হুঁ।

অমল বই বাহির করিয়া নিবিষ্টমনে কি যেন পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল—এত সোজা ফ্যাক্টর। এ প্লাস বি ইনটু এ মাইনস বি ফরমুলার —এই দ্যাখো—

গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিতে হাসিতে অমলের মুখের পানে চাহিয়া আছে—খাতার সাদা পৃষ্ঠায় কি লেখা হইতেছে সেদিকে তাহার মন ও চোখের কোনটাই নাই।

অমল আগ্রহে বুঝাইতেছে—এই দ্যাখো, টোয়াইস এক্সকে যদি এ ধরি, তবে—

গৌরী অমলের শুষ্ক চুলগুলির ভিতরে আঙুল পুরিয়া দিয়া কহিল—রাম, তোমার ত চুল পেকে গেছে, এই যে পাকা চুল—

অমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—রাখো এখন পাকা চুল, এ ফ্যাক্টরটা বুঝলে ?

গৌরী গভীর অভিনিবেশ সহকারে দেখিয়া কহিল—কিছুই বুঝিনি !

—যা বলেছি, শুনেছ—

—কানে ত তুলো দিয়ে নেই যে শুনবো না—

—তবে, বুঝলে না কেন ?

—বা রে ! তুমি বুঝোতে পারলে না, তার আমি কি ক'রবো—

গৌরী হাসিতেছে দেখিয়া অমল ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল—এত ছেলেকে বুঝোতে পারলুম আর তোমাকে পারলুম না ?

—ঐ রকমই বুঝিয়েছ—নিজে না পেরে শেষে কেবল ধমক আর বকুনি—গৌরী এইবার হাসিয়া ফেলিল !

অমল খাতার উপর পেন্সিল রাখিয়া একান্ত হতাশায় চুপ করিয়া গেল। গৌরী বুঝিল, অমল সত্যই অত্যন্ত দুঃখিত হইয়াছে তাই কহিল—ও অঙ্ক এখন হবে না—ইতিহাস পড়ি, কেমন ?

অমল উৎসাহিত হইয়া বলিল—পড়, আচ্ছা কাল যা শিখেছ ব'ল ত—ব'ল কলম্বস কে ?

গৌরী গম্ভীরভাবে ক্ষণিক চিন্তা করিয়া কহিল—মহম্মদ তোগলকের বেয়াই—

অমল রাগে ক্ষোভে বই ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া বলিল - যাও, তোমার কিছু হবে না। আমি আর কিছু বলব না, তোমার যা ইচ্ছে হয় কর—

গৌরী পিছন ফিরিয়া কেবল হাসিতেছে, অমল ক্রোধে গম্ভীর মুখখানা মলিন করিয়া বসিয়া আছে। গৌরী আড়চোখে চাহিয়া চাহিয়া অমলের ক্রোধ উপভোগ করিতেছিল। বইখানা কুড়াইয়া লইয়া কহিল—ইস্ আমার বইখানা ছিঁড়ে দিলে ত? মার কাছে বলে দেব—উঠিয়া দাঁড়াইয়া সম্ভবতঃ একটু করুণা বোধ করিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল—আচ্ছা, তুমি রাগ ক'রলে ?

—না রাগ ক'রবে না। এতে রাগ হয় না কার ?

—আচ্ছা, কলম্বসের মেয়ের সঙ্গে তোগলকের ছেলের বিয়ে কি কিছুতেই হ'তে পারে না ?

অমল চুপ করিয়া রহিল।

গৌরী কৃত্রিম গাম্ভীর্য্যে মুখখানা বিরস করিয়া বলিল—আচ্ছা, এমনও ত হ'তে পারে যে, গোপনে বিয়ে হ'য়েছিল, গন্ধর্ব্ব মতে। ওই ইতিহাস যাঁর লেখা, তিনি জানেন না।

অমলের ক্রোধ উবিয়া গিয়াছিল, সে বলিল—তোমার লেখাপড়া হবে না !

—লেখাপড়া আমার দরকার নেই।

—দরকার নেই ? ব'ল কি ? এই বিরাট পৃথিবীতে কত কি

আছে, সভ্যতার কি উন্নতি হ'ল, এ সমস্ত জানবারও কি ইচ্ছে হয় না তোমার ?

—তুমি জানো, ওই ত আমার হ'ল। ধোপার খাতা লিখ্‌তে পারি, চিঠি লিখ্‌তে পারি, বাজার খরচ ও দুধের হিসাব রাখতে পারি, আবার কত পড়বো ?

—হ্যাঁ—বিদ্যে একেবারে গজ্ গজ্ করছে, আর কি জান্‌বে ? ছেলেমেয়ে কি ক'রে মানুষ কর'তে হয়, সে সব না জান্‌লে তারা ত মারা যাবে—

—তুমি ত এত পড়েছ, সে সব জানো ?

—জানি বৈ কি ?

—তবেই ত আমা.. জানা হ'ল, তুমি যেমনটি ব'লে দেবে, আমি ঠিক তেমনটি ক'রবো, তাহ'লেই ত হবে।

আর আমি ম'রে গেলে—তখন ?

গৌরী চেয়ার হইতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল—ছিঃ, তুমি অমন কথা ব'ললে—যাও তোমার সঙ্গে আর আমার কথা বলার দরকার নেই, খুব হ'য়েছে—হাসি ঠাট্টার মধ্যে—

গৌরী একেবারে মর্ম্মাহত হইয়াছে এমনি অভিমান স্ফীত মুখ লইয়া চলিয়া যাইতেছিল। অমল তাহার হাতখানা ধরিয়া ফেলিয়া বলিল—ওটা কথার কথা, আচ্ছা ব'সো, একটা মজার কথা বলি শোনো—খুব মজার কথা—

গৌরী অত্যন্ত গম্ভীরভাবে চেয়ারটায় বসিলে সে বলিল—আচ্ছা, এমন দেশ আছে জানো, মানুষে মানুষ খায়, মানুষের মাংস খেতে ভালবাসে—

—ও সব গাল-গল্প, আমি বিশ্বাস করিনে। তোমার যত সব আজগুবি কথা !

—বিশ্বাস কর আর নাই কর, আছে। এ জান্‌তে তোমার কৌতূহল হয় না।

—খুব।

—তবে না পড়লে জান্‌বে কি ক'রে?

—তুমি গল্প কর, আমি শুনি, তাহ'লেই হবে। খোকা যে বিরক্ত করে, পড়বো কখন?

অমল পরাজিত হইয়া বিষয়ান্তরে মন-সংযোগ করিল—আচ্ছা এমন দেশ আছে জানো, যেখানে বিয়ে নেই; মেয়ে পুরুষ সব স্বেচ্ছাচারী।

গৌরী তাহার ডাগর চোখ দুইটি মেলিয়া ধরিয়া বলিল—ও তুমি সেই দেশে যাবে বুঝি? সেই জন্যেই এই সব খুঁজে খুঁজে বের ক'রছো—

অমল হাসিয়া কহিল—সেই তোমার উচিত শাস্তি, আমাকে তুমি অবহেলা কর। হিন্দুর যদি তালাক দেওয়া থাকতো, তবে তোমাকে এমন জব্দ ক'রতুম—

গৌরী হাসিয়া কহিল—আবার বিয়ে করতে?

—ক'রতুম বৈ কি।

—কাকে? অপর্ণাকে না?

অমল চমকাইয়া উঠিল। বিবাহের পরে এই সাত বৎসরের মাঝে এই প্রথম গৌরীর মুখে অপর্ণার নাম সে শুনিল। মনের কোণে অপর্ণা আজ মৃত নয়, তাই গৌরীর মাঝে সে অপর্ণার সম্পূর্ণতাকে চাহিয়া চাহিয়া নিরাশ হয়। অমল জবাব দিল না, অত্যন্ত কাতর দৃষ্টিতে সে গৌরীর পানে চাহিয়া রহিল। গৌরী বুঝিল না তাই বলিল—অপর্ণার মত লেখাপড়া কি আমি শিখতে পারি? শুধু শুধু পরিশ্রম কর কেন?

অমল নিঃশব্দে উঠিয়া বিছানায় শুইয়া পড়িল। একটি কথায় সমস্ত আলোচনা বন্ধ করিয়া দিল—আমার ভুল হ'য়েছে ক্ষমা ক'রো—

শাশুড়ী, স্বামী, ঠাকুর, গণ্ডাখানেক চাকর, একজোড়া ঝি, দারোয়ান, টেলিফোন, মোটর, রেডিও, লাইব্রেরী, প্রচুর মাসিক পত্রিকা—এই লইয়া অপর্ণার সংসার। একটি সন্তান তাহার হইয়াছিল কিন্তু চারিদিন মাত্র জীবিত থাকিয়াই মারা গিয়াছে। কাজ-কর্ম্ম নাই, প্রচুর অর্থ, অলস সময় কখনও গান করিয়া কখনও বই পড়িয়া সে অতিবাহিত করে। কখনও দোতলায় ঝুলবারান্দায় বসিয়া বই পড়ে, নীচের ফুল বাগান হইতে মাঝে মাঝে একটা মৃদু সৌরভ ভাসিয়া আসে। বাগানের পার্শ্বেই একটা প্রাচীর, তারপর একটা একতলা ছোটো বস্তী। কয়েক হাত প্রশস্ত একটা বাঁধানো উঠান, টালির চালায় রান্নাঘর। এখানে একটি বধূ আর তাহার দরিদ্র স্বামী বাস করে। উহাদের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা লক্ষ্য করা এবং উপভোগ করা তাহার একটা কাজ।

বেলা এগারটা। অজিত কোর্টে গিয়াছে। অপর্ণা ইজিচেয়ারে শুইয়া, বুকের উপর একখানা ইংরাজি উপন্যাস খুলিয়া, অদূরে ঐ বধূটির কাজ অনিচ্ছাকৃত ভাবেই দেখিতেছিল। সে ভাবিতেছিল—তাহার জীবন ওই দম্পতির নিবিড়তায় ভরিয়া উঠে না কেন? এই সাত বৎসরে তাহাদের মধ্যে একটা নৈকট্য গড়িয়া না উঠিয়াছে এমন ত নয়, তবুও একটা অস্বচ্ছ পর্দ্দার মত তাহাদের দুইটি মনের মাঝে কিসের যেন একটা ব্যবধান রহিয়া গিয়াছে—সবই আছে কিন্তু পরিপূর্ণতা নাই, একটা একাকীত্ব অজ্ঞাত অস্বস্তির গোপন কাঁটার মত অন্তরকে ক্ষত বিক্ষত করিয়া দেয়। ভাবে—এই পৃথিবীর জনারণ্যের মাঝে সে অমল কোথায় অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। বিদায় দিনে অমলের সেই বিষণ্ণ মলিন

ছলছল মুখখানি আজ প্রাচুর্য্যের প্রলেপে প্রায় অদৃশ্য, তবুও দেহাতীত একটা বাসনা-শঙ্কিত আঁখি মেলিয়া জাগিয়া আছে—অদূরে নীচে ওই বধূটি একখানা নীল বাগেরহাটের শাড়ী পরিয়া কলতলায় বসিয়া জামা কাপড়ে সাবান দিতেছে। স্বামীর পাঞ্জাবী, গেঞ্জি, বালিশের অড়, একবার ধুইয়া রৌদ্রে দিল, কিন্তু নীল বেশী হইয়াছে মনে করিয়া পাঞ্জাবীটায় আবার সাবান দিতে আরম্ভ করিল। পরিশেষে স্নান করিয়া, ভিজাচুল পিঠের উপর ছড়াইয়া দিয়া ঘরে গেল—

একটি শিশু মাঝে মাঝে উঠানে বারান্দায় খেলা করিয়া বেড়ায়—অপর্ণা তাহার সুদৃঢ় পদক্ষেপ ও চলিবার ভঙ্গিটি চিনে। সে কোথা হইতে ছুটিয়া আসিয়া এক টুকরা সাবান পাইয়া পুলকিত হইয়া উঠিল। এক বালতি রান্নার জল আলাদা তোলা ছিল, সেই জলে সাবান গুলিয়া সে সমগ্র পেটে মাখিয়াছে, যতই ফেনা হইতেছে ততই সে আনন্দে আত্মহারা হইয়া আপন মনে হাসিতেছে—উল্লাসে মাঝে মাঝে কিছু ফেনা মাথাতেও তুলিয়া দিতেছে। একবার তাহার দিকে চাহিয়া হয়ত তাহার এই অভাবনীয় কর্ম্মপটুতা দেখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করিল—

আনন্দের আতিশয্যে অবশেষে সে বালতির মধ্যে বসিয়াই সাবান সহ জলক্রীড়া আরম্ভ করিল। জল ছিটাইয়া, মাথায় দিয়া আপন মনেই হাসিতেছিল। যেমন করিয়াই হোক, সাবানের ফেনা বোধ হয় কিছু চোখে গিয়াছে—জ্বালা করায় হঠাৎ তারস্বরে কাঁদিতে আরম্ভ করিল। অভিমন্যুর মত বালতি-ব্যূহের প্রবেশ পথ তাহার জানা ছিল, কিন্তু বাহির হইবার পথ তাহার জানা ছিল না।—অপর্ণা আপন মনে হাসিয়া উঠিল।

বধূটি হন্ত-দন্ত হইয়া ছুটিয়া আসিয়া পুত্রের এই দুর্গতি দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল! অপর্ণার দিকেও চাহিয়া দেখিল, সেও হাসিতেছে।

সম্ভবতঃ কহিল—যেমন দুষ্টু! ক্ষোভও হইবার কথা। রান্নার জলটুকু সে নষ্ট করিয়াছে—

পুত্রকে বালতি-মুক্ত করিতে করিতে আর একবার সে দ্বিতলের ঝুলবারান্দার পানে চাহিল। সুন্দর শান্ত তাহার মুখখানি—কপালে সিন্দুর বিন্দু চিক্ চিক্ করিতেছে। এই মুখখানিতে সিন্দুরের ফোঁটা যেমন মানায়, তেমন বোধ হয় আর কারও নয়—

নিশীথ গভীর রাত্রি—

কলিকাতার কোলাহল থামিয়া গিয়াছে—রাস্তা জনশূন্য। ক্বচিৎ রিক্সার ঠন্ ঠন্ শব্দও নাই। আকাশের গায়ে একখানি চাঁদ ম্লানা জ্যোৎস্নায় পৃথিবীকে স্বপ্নাচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অমল একাকী টেবিলের সামনে বসিয়া আছে—সম্ভবতঃ একটা কবিতা লিখিবার উদ্যোগ করিয়াছে—পাশের খাটেই গৌরী পুত্রকে বুকের মাঝে জড়াইয়া শুইয়া আছে।

কবিতার মাত্র একটি লাইন লেখা হইয়াছে—জগতের জনারণ্যে আজি আমি একান্তই একা—

অমল ভাবে—সত্যই ত সে একা। আজিকার এই উদাস মন নিরাশ্রয়ের মত যেন কাহাকে চাহিতেছে—কিন্তু সে কে, কি তাহ বোঝা যায় না। আজ সে যেমন করিয়া তাহার একাকীত্বকে অনুভব করিতেছে, যেমন ভাবে বেদনা পাইতেছে, গৌরী ত তাহা পাইতেছে না। নিবিড় বাহুবন্ধনের মাঝে তাহাকে গ্রহণ করিয়া তাহার বেদনাকে দূর করিতেছে না। জীবনে যাহাদের সঙ্গ সে পায় নাই, মন বার বার সেই না-পাওয়াকে পাইতে চাহিতেছে। কোথায় অপর্ণা, কোথায় রমলা—তাহাদের অতীত স্মৃতি আজ দূরাগত বীণাধ্বনির মত তাহাকে নিষ্ঠুর আকর্ষণে লইয়া চলিয়াছে—গৌরীর মাঝে সে মানসীকে পাওয়া

যাইবে না—মনের এ ব্যভিচারের নিবৃত্তি নাই। গৌরীর বুকে মুখ লুকাইয়া জীবনস্বপ্ন সজল চোখে দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দেয়।

অমল মনে মনে ঠিক করে—গৌরীকে পরীক্ষা দেওয়ার তাগিদ দিয়া লাভ নাই। সে পাশ করিলেও সে তাহাকে যেমন করিয়া চাহিয়াছে গৌরীর মাঝে তাহাকে পাওয়া যাইবে না—বৃথা তাহার এই অত্যাচার। বুকের মাঝে গৌরীকে লইয়া সে বারবার কেবল প্রবঞ্চনাই করিয়াছে—

অমল গৌরীর মুখের পানে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া আছে। মুখে তাহার একটা অপ্রকাশ্য বেদনার অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিয়াছে।

গৌরী হয়ত আলো দেখিয়াই সহসা জাগিয়া উঠিয়া বসিল ; অমল ধীরে ধীরে বলিল—গৌরী, তুমি ঘুমিয়েছিলে—না ?

—হ্যাঁ, ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

চারিপাশে এই নিস্তব্ধতা, আজ আমার মন উন্মাদ কল্পনায় তোমাকে নিঃশেষে পান করতে চায়। আকাশের জোছনার মত আমার অন্তর তোমার সমস্ত অঙ্গে পরিব্যাপ্ত হয়ে পড়েছে। তোমার কি ইচ্ছে করে না, এমনি ক'রে সমস্ত অন্তর দিয়ে আমাকে ঘিরে রাখতে ?

গৌরী কিছু বুঝিল না, অপ্রাসঙ্গিক জবাব দিল—ঘুমিয়ে পড়েছি বলে রাগ ক'রেছো ?

অমল হাসিল, কিন্তু সে হাসি কান্নারই রূপান্তর মাত্র। তাহার সমস্ত অন্তর সহসা যেন কঠিন বাস্তবের প্রাচীরে প্রহত হইয়া ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। সে বলিল—না তুমি ঘুমোও—

—তুমি শোবে না ?

—হ্যাঁ, শোবো বৈ কি ?

গৌরী পুনরায় শয্যাশ্রয় করিল। অমল তেমনি করিয়াই বসিয়া

রহিল—সে যেমন করিয়া, যে পথে গৌরীকে চায়, তেমনি করিয়া সে ত তাহাকে পায় না—তাহার অন্তরের সুখ দুঃখের সাথী ত সে নয়। যে রাজ্যে মানুষের মন একা—সেথা গৌরীও যেমন অবান্তর, অপর্ণাও তেমনি। অপর্ণার বধির অন্তরও তাহাকে এমনি করিয়া ফিরাইয়া দিয়াছে। মানুষের চাওয়া পাওয়ার রূপ, পরিকল্পনা বিভিন্ন, তাহাদের সুখ দুঃখ বিভিন্ন, এ জগতে কি তাহারা একজন আর একজনকে পাইতে পারে? তাহা একান্তই অসম্ভব, তাই মানুষ না-পাওয়ার বেদনায় আপন অশ্রু উৎসারিত করিয়া দিয়া আপনাকে অশ্রু সমুদ্রের মাঝে চির একাকী করিয়া রাখিয়াছে। যাহারা চাহে নাই তাহারা পাইয়াছে, যাহারা চাহিয়াছে তাহারা পায় নাই। ভালবাসা লইয়া এ জগতে সুখী হওয়া চলে না—ভাল না বাসিলে সুখী হওয়া হয়ত সম্ভব হইতে পারে—

অমল ধীরে নিঃশব্দে আসিয়া গৌরীর শয্যা পার্শ্বেই শুইয়া পড়িল, কিন্তু মনে মনে হাসিয়া বলিল—তবুও কত ব্যবধান।

অকাশে থালার মত উজ্জ্বল চাঁদ উঠিয়াছে—

অপর্ণার ঘরের সম্মুখে ঝুলবারান্দায় একরাশ শুভ্র আলো আসিয়া পড়িয়াছে। একখানা ইজিচেয়ার টানিয়া সে বসিয়াছিল। তাহার স্বামী এখনও শুইতে আসে নাই, হয়ত কোনো কাজে বৈঠকখানায় আছে। দূরের শীর্ণ কালো নারিকেল গাছের উপরে, একখানা শুভ্র মেঘের পাশে চাঁদ স্থির হইয়া রহিয়াছে। নারিকেল গাছের হিম-সিক্ত পাতা জোছনায় চিক্ চিক্ করিতেছে—

অপর্ণা ভাবিতেছে কত অবান্তর কথা—এমনি এক জ্যোৎস্নাপ্লাবিত রজনীতে বালীগঞ্জ পার্কে অমল কম্পিত হস্তে তাহার হাতখানিকে আকর্ষণ করিয়াছিল, কিন্তু সে কোথায়, কত দূরে? সে ইচ্ছা করিলে

তাহাকে সুখী করিতে পারিত, কিন্তু অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে মাত্র দুই ফোঁটা চোখের জলে বিদায় করিয়াছে। তাহার মন আজ সেই হারানো মানুষটিকেই অজিতের মাঝে খুঁজে, কিন্তু অজিত অজিতই, তাহার মাঝে অমলের হৃদয় স্পন্দন নাই।

বিবাহিত জীবনের মাঝে অমলও কি এমনি ব্যভিচার করিয়া চলিয়াছে? অজিতের বক্ষস্পন্দনে সে যেমন করিয়া অমলের স্পন্দন অনুভব করিতে চায় সেও কি তেমনি অপর্ণাকে অন্য দেহের মাঝে চাহিয়া অতৃপ্তির দীর্ঘশ্বাস ফেলিতেছে—মানুষের মন কি এমনি চিরন্তন ব্যভিচার-লিপ্ত?

কে যেন ঐ ছোট বাড়ীখানির উঠানে একাকী পদচারণা করিতেছে। সম্ভবতঃ ঐ বধূটির স্বামী, ঐ দুরন্ত ছেলেটির পিতা। কিন্তু আপনার এই আনন্দময় গৃহ হইতে নিজেকে ছিনাইয়া লইয়া ও কেন এমন একাকী ঘুরিয়া বেড়াইতেছে?—মানুষ কি সর্ব্বত্রই একা?

অপর্ণা ভাবিয়া পায় না—

অজিত আসিয়া প্রশ্ন করিল—অপর্ণা শোও নি?—এখানে ব'সে কি ক'রছো—

—ব'সো, কেমন সুন্দর জোছ্না উঠেছে, দেখেছ?

হ্যাঁ, সত্যিই। অজিত আর একখানা চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিল। প্রশ্ন করিল—তুমি এখানে ব'সে কি এত দ্যাখো বল তো?

—কি সুন্দর জোছনা।

—জোছনা ত এখন, অন্য সময় কি দ্যাখো?

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—তোমাকে একদিন দেখাবো। ওই বাড়ীর ছোট্ট দুরন্ত একটি ছেলে, একটি দুষ্ট বৌ আর তার স্বামী থাকে, তাদের জীবনযাত্রা দেখলে তোমারও হাসি পাবে—

অপর্ণা শিশুটির সাবান ও বালতি ব্যূহে প্রবেশের কাহিনীটি বর্ণনা

করিলে, অজিত হাসিয়া কহিল—ও তাই নাকি? আচ্ছা, একদিন দেখবো—

অপর্ণা একটু ইতস্ততঃ করিয়া কহিল—দ্যাখ স্বামীটি এখন কেমন পায়চারি ক'রছে। এত আনন্দের মাঝেও ও যেন একা—না?

অজিত বিশেষ কিছু বুঝিল না—সংক্ষেপে জবাব দিল, হুঁ।

ক্ষণিক পরে অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আমাকে বিয়ে করে তুমি কি সত্যই সুখী হ'য়েছ?

—হ্যাঁ, আমার না পাওয়া ত কিছুই নেই। তোমাকে না পেলে এ প্রশ্ন হয়ত উঠ্‌তো—

—তুমিই সুখী।

কেন? তুমি সুখী হও নি?

অপর্ণা জবাব দিল না। অজিত কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া কহিল—কি জবাব দিলে না যে!

—আমি বল্‌ছিলুম যে কম চায় সেই সুখী হয়, যে বিরাট কিছু চায় সে সুখী হ'তে পারে না। যারা সত্যিকার ভালবাসে, তারা তাই চিরদিনই তাদের মনে একা—

অজিত সম্ভবতঃ কিছু বুঝিল না তাই বলিল—তোমাদের ফিলজফি কিছু বুঝি না, তবে তোমার কথায় সন্দেহ হ'চ্ছে তুমি হয়ত সুখী হও নি।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—বিয়ের সাত বৎসর পরে অকস্মাৎ এই সন্দেহ তোমার হ'য়েছে—যা হোক্।

অজিত অপর্ণার হাতখানা নিজের বুকের উপর টানিয়া লইয়া কহিল—না না, তোমার মনে যদি কোনও দুঃখ থাকে, তাই ঐ কথা ব'ল্‌লুম।

অপর্ণা কিছুই বলিল না, চুপ করিয়া অদূরে পাণ্ডুর নিষ্প্রভ চাঁদের

পানে চাহিয়া রহিল। অজিত সযত্নে তাহার দেহ নিজের বুকের সন্নিকটে টানিয়া আনিয়া ধীরে ধীরে নিজের মুখখানি অবনত করিতেছিল—অপর্ণা চক্ষু মুদিয়া সেই স্পর্শটুকুর অপেক্ষা করিতেছিল—এমনি করিয়া পার্কে বসিয়া জ্যোৎস্নাস্নাত অমলের মুখখানিও নামিয়া আসিবার প্রতীক্ষা সে করিয়াছিল। তাহার মাঝে সেই মুখখানিই ভাসিয়া উঠে—সে তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া শিহরিয়া উঠে। এ কি নিষ্ঠুর ব্যভিচারবৃত্তি!

সেদিন রবিবার।

অপরাহ্নে সমস্ত উঠানে ছায়া পড়িয়াছে। অপর্ণা ঘুম হইতে উঠিয়া আসিয়া বারান্দায় বসিল—একখানা বই তাহার হাতে ছিল, কিন্তু সেটাকে না খুলিয়াই সে ছোট ছেলেটিকে ঐ বাড়ীর উঠানে খুঁজিতেছিল। এমনি সময়ে বারান্দায় কোণে বসিয়া সে সাধারণতঃই নানারূপ ইঞ্জিনিয়ারিং কার্য্যে ব্যস্ত থাকে, কখনও দুইপায়ের ভিতরে একখানা লাঠি দিয়া দ্রুতবেগে সমস্ত উঠানে অশ্বারোহণ করে। চুরি করিয়া মাঝে মাঝে কিছু জল লইয়া যাইয়া তদ্বারা নানারূপ প্রক্রিয়া করে—

অপরাহ্নের ছায়া ওদের বারন্দাটায় যেন ঘনীভূত হইয়া উঠিয়াছে, সেখানে বসিয়া স্বামী-স্ত্রী দুইজনে ক্যারম খেলিতেছে এবং খোকাটি অত্যন্ত শান্ত ভাবে তাহা দর্শন করিতেছে—ঘুঁটি পড়িলে উবু হইয়া তাহা কুড়াইয়া কুড়াইয়া জমা করিতেছে, মাঝে মাঝে বোর্ড হইতেও দুই একটা চুরি করিয়া লইতেছে। স্বামীটি পিছন ফিরিয়া বসিয়া—কেবল তাহার দীর্ঘ দেহ ও কোঁকড়া চুলগুলি দেখা যায়।

অজিত অপর্ণার পাশে আসিয়া বসিল। কহিল—কি প'ড়ছো?

অপর্ণা কোন জবাব দিল না, কেবল ইঙ্গিতে ক্রীড়ানিরত দম্পতীকে দেখাইয়া দিল।

অমল ক্যারম খেলিতেছিল—রবিবার অপরাহ্ণে অমনি একটু খেলা করা তাহার অভ্যাস—কারণ এটা অন্যান্য নাগরিক আমোদ-প্রমোদের মত ব্যয়সাপেক্ষ নয়।

বোর্ডের ঘুঁটি প্রায় নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছিল, অমল একটা ঘুঁটিকে দেখাইয়া দিয়া কহিল—এই যে এটা রয়েছে—

গৌরী প্রতিবাদ করিল—কখ্‌খনও না, এখানে থাকতেই পারে না। ঘুঁটি তুমি তুলেছ—আচ্ছা চোর ত।

—ছিলো, বহুক্ষণ আছে। নেকামি ক'রো না।

খোকা নিবিষ্ট মনে খেলা দেখিতেছিল, সে মাতার পক্ষ অবলম্বন করিয়া বাবাকে আঙুলে দেখাইয়া কহিল—চোর।

অমল ধমক দিল—ধ্যেৎ, পাজি ছেলে। চুপ কর্‌—

খোকা ধমক খাইয়া উঠিয়া গেল এবং কার্য্যান্তরে মনোনিবেশ করিল। গৌরী কহিল—আর কত খেলবে, রাঁধতে হবে না? সব কাজ পড়ে রইল—

অমল তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল—থাক্‌গে, রবিবার একটু না হয় রাত্তির হ'ল—

গেম শেষ হইয়া আসিতে প্রায় সন্ধ্যা হইয়া আসিল। গৌরী মাঝে মাঝে ঘুঁটি চুরি করিয়াও অনিবার্য্য পরাজয় হইবে বুঝিয়াছিল। খোকা আবার আসিয়া মায়ের কার্য্যকলাপ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বেশ উৎসাহিত হইয়া উঠিয়াছিল এবং মায়ের সাহায্যার্থে দুই একটা ঘুঁটি মাঝে মাঝে যেখানে সেখানে বসাইয়াও দিতেছিল।

ঐরূপ একটি ঘুঁটি সন্নিবেশকালে খোকা ধরা পড়িয়া গেল এবং আর

একবার ধমক খাইয়া আসিয়া নিজকর্ম্মে মন দিল। গৌরী কহিল—খোকাকে বক্‌লে কেন ?

—ঘুঁটি চোর—তোমার দেখাদেখি—

—তুমি চোর, তুমি ত ঠেঁটামি কচ্ছ।

—তুমি যে ঘুঁটি চুরি ক'রলে—

বেশ তোমার মত ঠেঁটার সঙ্গে খেল্‌বো না। গৌরী সমস্ত ঘুঁটি ভণ্ডুল করিয়া দিয়া ছুটিয়া পলাইল।

অমল কহিল—দাঁড়াও—সে পিছন পিছন ছুটিয়া আসিয়া উঠানের মাঝখানে গৌরীকে ধরিয়া ফেলিল। অমলের সবল বাহু বেষ্টনীর মাঝে গৌরী অসহায়ের মত কিছুক্ষণ ছট্‌ফট্‌ করিয়া কহিল—ছাড়ো, ছাড়ো, খোকা রয়েছে যে—

অমল শাস্তি দিবার জন্যে ওষ্ঠ আনত করিতেছিল, গৌরী কহিল—ছিঃ ছিঃ ছাড়ো, ওই দ্যাখো বারান্দায় কারা—

অমল সন্ধ্যার অস্পষ্ট আলোকে অদূরের বড় বাড়ীর ঝুলবারান্দায় দুইটি লোকের অবস্থিতি বুঝিতে পারিয়া গৌরীকে ছাড়িয়া দিল।

পুত্র উঠানের প্রান্ত হইতে তাহার মায়ের প্রতি এই ঘোর অত্যাচার প্রত্যক্ষ করিয়া উদ্যত লাঠি হস্তে পিতাকে শাসন করিবার মানসে ছুটিয়া আসিতেছিল, কিন্তু লাঠির ভারে পড়িয়া গিয়া তারস্বরে কাঁদিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে গৃহ হইতে ঠাকুমা সন্ধ্যা আহ্নিক ফেলিয়া আসিয়া কহিলেন—কি হ'ল বৌমা।

অমল হাত দুলাইয়া কহিল—ধরিত্রী তুমি দ্বিধা হও—

এবং নিঃশব্দে সে গৃহে ফিরিয়া গেল, অদূরের ঝুলবারান্দায় বসিয়া কাহারা যেন হাসিতেছে মনে হইল।

গৌরী ছুটিয়া আসিয়া কানে কানে কহিয়া গেল—কেমন জব্দ ?

আঠারো

সেদিনও তেমনি জোছনা উঠিয়াছিল—

অপর্ণা জোছনায় বসিয়া কি যেন সব ভাবিয়া যাইতেছিল, অজিত আসিয়া পাশে বসিয়া প্রশ্ন করিল—কি দেখছো—

—আজ ওদের কেমন দেখলে ?

—সুন্দর, বেশ আছে। কিন্তু ছেলেটাই সব চেয়ে বেশী দুষ্ট—লাঠি নিয়ে যে ছুটে এসেছে।

অপর্ণা একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া প্রশ্ন করিল—ওরা খুব সুখী বলে মনে হয় না ?

—নিশ্চয়ই, এমন সুন্দর গৃহ যার, তার অভাব কি ?

অপর্ণা কহিল—এর মাঝে ও নেহাৎই হয়ত একা, তাই প্রসুপ্ত পরিবারকে ফেলে একাকী ও বসে আছে—আপনার দুঃখকে স্মরণ ক'রতে—

অজিত কহিল—তুমিও কি এমনি একা একা বসে থাকো ঐ জন্যেই ?

—তুমি থাকো না ?

—কদাচিৎ, কিন্তু আমার প্রশ্নের ত উত্তর হ'ল না ওটা। তুমি কেন এমনি একা বসে থাকো—

অপর্ণা বলিল—বল্‌লে বুঝবে না, কারণ বোঝান শক্ত, আর যা ব'লবো তা হয়ত বিশ্বাস ক'রবে না—

—বুঝতে হয়ত পারবো না, কিন্তু বিশ্বাস অবশ্যই ক'রবো—

অপর্ণা ধীরে ধীরে বলিল—আমার মনে হয় মানুষের বাসনা এই দেহেই শেষ নয়, এর উর্দ্ধে দেহাতীত একটা বাসনা আছে, চাওয়া আছে।

সেই বাসনা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা এই পৃথিবীতে অতৃপ্ত—তাই মানুষ পরম পরিতৃপ্তি, পূর্ণ আনন্দ থেকেও নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে আপনাকে একান্ত একাকী পেতে চায়। এই দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষার হাত থেকে মানুষের মুক্তি নাই, তাই সে চির-ব্যভিচারী।

অজিত ক্ষণিক কি চিন্তা করিয়া কহিল—তুমি কি আমাকে ভালবাসতে পারো নি ?

—এই রকম প্রশ্ন করবার ভয়েই তোমাকে এ কথা ব'লতে চাই নি। ভাল না বাসতে পারলে তোমাকে বিয়ে ক'রতে পারতুম না, কিন্তু তুমি আমাকে অবিশ্বাস করো কেন ?

—অবিশ্বাস ? না, তবে আমাকে ঠিক ভালবাসো না বলে সংশয় জেগে ওঠে—

—আমারও যদি তাই মনে হয় তবে তুমি কি উত্তর দেবে ?

—তার উত্তর নেই।

অপর্ণা একটু বিরক্তির সঙ্গে বলিল—তবে এ সব কথা তুলে অকারণ অসচ্ছন্দতা ডেকে এনে লাভ নেই, আমি যা ব'লতে চেয়েছি তা হয়ত ব'লতে পারিনি নয়, তুমি ঠিক বুঝতে পারোনি।

—তোমার মত একাকী বসে থাকতে তো আমার ইচ্ছা হয় না—কেন ?

—তুমিই সুখী। আপনার মনকে যদি ভাল ক'রে দেখতে একদিন তবে হয়ত বুঝতে—তুমিও ঠিক আর সকলের মত একা, কারণ তোমার অফুরন্ত চাওয়ায় পরিতৃপ্তি যেমন আমার দেওয়ার ক্ষমতা নেই তেমনি—অন্য কোনো মেয়েরই নেই। পক্ষান্তরে কোনো পুরুষেরও নেই।

অজিত সম্ভবতঃ কিছু বুঝিল না, দেহের উর্দ্ধে মনের অস্তিত্বকে সে হয়ত জীবনে উপলব্ধি করে নাই, তাই অপর্ণাকে অত্যন্ত রহস্যময়ী বলিয়া সে মনে মনে আপনার দুর্ভাগ্যকে ধিক্কার দিল মাত্র। অপর্ণা চাহিয়া

দেখে ওই দুঃস্থ পরিবারের কর্ত্তাটি তখনও একাকী উঠানেই বসিয়া আছে—

অপর্ণা কহিল—চল ঘরে যাই। কথায় কথা বাড়ে।

খোকা মায়ের কোলের মধ্যে চোখ বুজিয়াই শুইয়া ছিল, মা একটু নড়িয়া চড়িয়া উঠিতেই মিটমিট করিয়া তাকাইতে আরম্ভ করিল—

গৌরী আবার শুইয়া পড়িল—দুষ্ট এখনও ঘুমোস্ নি, তোর বাবার ফিরবার সময় হ'ল যে! তাকে ভাত জল দিতে হবে না?

খোকা মাকে জড়াইয়া ধরিয়া কহিল—তার পর কি মা?

গৌরী বলিতে আরম্ভ করিল—রাজপুত্তুর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়ে চ'ল্লেন। কত দেশ, কত নদী, কত পর্ব্বত পার হ'য়ে, মেঘের রাজ্য পার হ'য়ে শেষে এক দেশে উপস্থিত হ'লেন। পক্ষীরাজ ঘোড়াকে এক গাছে বেঁধে রেখে তিনি একটু এগিয়ে দেখেন এক প্রকাণ্ড রাজপুরী বাইরের সিংদরজায় সেপাই পাহারা দিচ্ছে, কিন্তু সে ঘুমন্ত। আশে-পাশে আরও কত সেপাই-শান্ত্রী অস্ত্র-শস্ত্র নিয়ে ঘুমিয়ে আছে। রাজপুত্তুর ভিতরে গিয়ে দেখেন, গরু বিচালি খেতে খেতে ঘুমিয়ে পড়েছে, মুখে বিচালি ঝুল্‌ছে, ময়ূর নাচ্‌তে নাচতে ঘুমিয়ে পড়েছে...... এই ঘুমন্ত রাজপুরীর সব জায়গা রাজপুত্তুর তন্ন তন্ন ক'রে দেখলেন। এরা কেন ঘুমিয়েছে, কখন জাগবে কিছুই জানলেন না। শেষে দেখেন এক ঘরে এক রাজকন্যা সোনার পালঙ্কে শুয়ে আছে। চুলগুলো ঝুলে পড়েছে মেঝেয়—

—পালঙ্ক কি মা?

—এই খাটের মতই, কিন্তু নক্সা করা, খুব দামী। এ রকম করলে ঘুমোবি কখন?

পাশের বাড়ীর পেটা ঘড়িতে নয়টা বাজিয়া গেল।

খোকা প্রশ্ন করিল—ও কি মা ?

—ঘড়িতে ন'টা বাজলো, রাজবাড়ীতে। কখন ঘুমুবি ?

—তার পর কি মা ?

গৌরী পুনরায় আরম্ভ করিল—রাজকন্যার মেঘবরণ চুল, কুঁচবরণ রূপ। সমস্ত ঘর তার রূপে আলো হ'য়ে আছে, রাজকন্যার চুল পালঙ্ক ছাড়িয়ে মেঝেতে এসে পড়েছে—

—সে তো তোমারও পড়ে মা, তুমি রাজকন্যা ?

—না, শোন তার পর, মাথার শিয়রে একটা সোনার কাঠি, একটা রূপার কাঠি। রাজপুত্তুর তাই নিয়ে খেলা ক'রতে ক'রতে সোনার কাঠিটা হাত থেকে রাজকন্যার কপালের উপর পড়লো—দেখতে দেখতে সব জেগে উঠলো। হাতীশালে হাতী ডাক্‌লো, ঘোড়াশালে ঘোড়া··· রাজপুত্তুর শেষে একদিন রাজকন্যাকে নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় উঠে ফিরে এলেন—

—রাজকন্যাকে আনলে কেন ?

—খেলা ক'রবে বলে। এখনও ঘুমোলি নে ?

খোকা ক্ষণিক চুপ করিয়া থাকিয়া কহিল—ওই রাজবাড়ীতে পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে ?

সদর দরজায় কড়ার শব্দ হইল, গৌরী তাড়াতাড়ি উঠিয়া বিরক্তির সঙ্গে কহিল—জানিনে, তোর বাবা এসেছে, যেমন ছেলে, এখন একা একা থাকো—

খোকা চোখ বুজিয়া ভাবিতে লাগিল—সে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিয়াছে। বৈকালে আকাশের গায়ে যে সোনালী আর কালো মেঘগুলি দেখিয়াছিল, তাহার ভিতর দিয়া সে চলিয়াছে। সোনালী মেঘের প্রাচীর সে তরোয়াল দিয়া কাটিয়া রাস্তা করিয়া চলিয়াছে, পক্ষীরাজ ঘোড়া ছুটিয়াছে। বহুদূরে কালো মেঘের ও-পারে গিয়া দেখে সেই

ঘুমন্ত রাজপুরীর চূড়া। রাক্ষসী আসিয়া পথ আটকাইল। বাবা যেন কি বলিতেছেন—

খোকা ঘুমের ঘোরে জড়িত চোখ মেলিয়া আবার চোখ বুজিল। কখন ঘুমাইয়া পড়িয়াছে জানে না।

পরদিন সকালে খোকা বারান্দায় সুতা ও ঘুড়ির একটা অকিঞ্চিৎকর সংস্করণ লইয়া খেলা করিতেছিল। ঘুড়ির কাগজের অবশিষ্ট কিছুই নাই, কিন্তু খোকা নিবিষ্ট মনে তাহাই উড়াইতে চেষ্টা করিতেছে।

গৌরী আসিয়া কহিল—কোথাও যাস্ নে খোকা।

—না। এই ত ঘুড়ি ওড়াচ্ছি।

কর্ম্মব্যস্ত মা চলিয়া গেলে, খোকা আকাশের পানে চাহিয়া দেখে তেমনি মেঘ। কালো কালো, তাহার পাশে পেঁজা তুলার মত শাদা মেঘ স্তূপীকৃত হইয়া আছে। খোকা রেলিং ধরিয়া ভাবিল, ওই মেঘরাজ্যের পরেই সেই ঘুমন্ত রাজপুরী, সেখানে চুল এলাইয়া কতকাল ধরিয়া ঘুমাইয়া আছে রাজকন্যা, দাসী চামর হাতে দাঁড়াইয়া আছে।

পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া যেদিন রাজকন্যাকে সে লইয়া আসিবে, মা সেদিন বলিবেন—কোথায় ছিলি খোকা?

সে রাজকন্যাকে লুকাইয়া রাখিয়া বলিবে—ব'ল ত কোথায়?

মা আশ্চর্য্য হইবেন, সে রাজকন্যাকে পকেট হইতে বাহির করিয়া দিয়া কেবল হাসিবে—রাক্ষসীর হত্যার গল্পটি সে সবিস্তারে বলিবে।

হাতের ঘুড়িখানা বাতাসে ফাৎ ফাৎ করিয়া উঠিল। খোকা চাহিয়া চাহিয়া আবার ভাবিল, রাজকন্যা যদি আজই সে আনিতে পারিত তবে দুইজনে মিলিয়া ঘুড়ি উড়াইত—রাজকন্যা ঘুড়ি উড়াইয়া দিত, সে সুতা ধরিয়া দৌড়াইত।

দুপুরে গৌরী ক্লান্তদেহে ঘরে আসিয়া দেখে খোকা পাঁজি খুলিয়া নিবিষ্টমনে ছবি দেখিতেছে। রাঁধিয়া স্বামীকে খাওয়াইয়া অনেকক্ষণ আগেই সে তাহাকে আফিসে পাঠাইয়াছে। তাহার পর একরাশ কাপড় ওয়াড় কাচিতে সে সত্যই ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। গৌরী কহিল—খোকা এদিকে আয় শুয়ে থাকবি—

—না মা, আমি ছবি দেখছি।

—না, যে রোদ পড়েছে, এদিকে আয়।

খোকা মিনতি করিয়া কহিল—কোথাও যাবো না মা, ছবি দেখে পরে শোবা।

গৌরী ক্লান্তদেহে শুইতেই ঘুমাইয়া পড়িল।

খোকা ছবি দেখিতে দেখিতে মাথা তুলিয়া দেখে মা ঘুমাইতেছে। ভিজাচুল মেঝেয় ছড়াইয়া পড়িয়াছে রাজকন্যার মত।

নিস্তব্ধ দুপুর। চারিপাশে কোন সাড়া শব্দ নাই—গাছের পাতাও নড়িতেছে না। খোকা এদিকে ওদিকে চাহিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। কিছুদূর আসিয়া দেখে সদর দরজাটাও খোলা আছে—অসাবধানবশতঃ দেওয়া হয় নাই। খোকা একবার পিছন ফিরিয়া দেখিয়া বাহির হইয়া পড়িল। সম্মুখেই বিস্তীর্ণ রাস্তা, কদাচিৎ দুই একখানা গাড়ী চলিতেছে—খোকা অজ্ঞাত, অনির্দ্দিষ্ট, অপ্রাপ্য রাজকন্যাকে আনিতে রওনা দিল—

রাস্তার পাশে গাছের ছায়ায় একটা কুকুর কুণ্ডলী পাকাইয়া ঘুমাইয়া আছে, তাহার কান ধরিয়া টানিবার দুর্দ্দমনীয় প্রলোভন ত্যাগ করিয়া সে আর একটু অগ্রসর হইল।

মনে মনে একবার ভাবিল, তাহার ত তরোয়াল নাই, যদি রাক্ষসী আসিয়া পড়ে সে কি করিবে। বাড়ীর সামনে দেবদারু গাছের তলায়

সে ভীত হইয়া ঘুমন্ত কুকুরটির পাশে দাঁড়াইয়া রহিল। সামনে চাহিয়া দেখে আকাশে তেমন মেঘ নাই, রাস্তাটা যথাসম্ভব পরিষ্কার আছে। মা তাহার রাণী নয়, তাই পক্ষীরাজ ঘোড়া দিতে পারে নাই। যাহা হউক, আজ তাহার মা ঘুমাইয়া উঠিবার পূর্ব্বেই সে সেই স্বপ্নপুরীর ঘুমন্ত রাজকন্যাকে আনিয়া হাজির করিবে।

এক বৃদ্ধা ভিখারিণী, ভিক্ষা করিয়া উত্তপ্ত রাস্তা দিয়া লাঠি ঠক্ ঠক্ করিতে করিতে চলিয়াছে। খোকা চুপ করিয়া ভীত দৃষ্টিতে দেখিতেছি —এই সেই রাক্ষসী কিন্তু তাহার হাতে ত কিছু নাই, একেবারে নিরস্ত্র। সে গাছটির আড়ালে আসিয়া দাঁড়াইল। বুড়ী ধীরে ধীরে চলিয়া ; খোকাও স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া অগ্রসর হইল।

চ করিয়া দুইটা বাজিল।

কা তাকাইয়া দেখে—ওইত সেই রাজপুরী। মা বলিয়াছে, রাজবাড়ীতে পেটা ঘড়ি বাজে। খোকা হৃষ্টমনে চলিতে লাগিল।

সিংদরজায় সেপাই বন্দুক ঘাড়ে করিয়া একখানা টুলের উপর বসিয়া বসিয়া ঘুমাইতেছে! চোখের দিকে চাহিয়া দেখিল সে সত্যই ঘুমাইতেছে —মেঘের রাজ্য পার না হইয়াই সে তাহা হইলে ঘুমন্ত রাজপুরীতে আসিয়া পেঁছিয়াছে।

পাশের খাঁচায় ময়ূর ঘুমাইতেছে, সামনের জলটুকুতে পাতিহাঁস এক পায়ে ভর দিয়া, পৃষ্ঠের পালকে মুখ লুকাইয়া ঘুমাইতেছে। সেই ঘুমন্তপুরী, খোকা সামনের চত্বর পার হইয়া দালানের সিঁড়িতে উপস্থিত হইল।

ইজেরটা খুলিয়া যাইতেছিল, সেটাকে তুলিয়া দিয়া দ্বিতলের সিঁড়ি দিয়া উঠিতে যাইবে—কিন্তু একটা কুকুর চোখ মেলিয়া চাহিয়া আছে— ঘুমন্ত রাজপুরী, সেই জীবন্ত কুকুরটির অস্তিত্ব বিশ্বাস করিবার প্রবৃত্তি

খোকার ছিল না—সে উপরে উঠিয়া গেল, একবার চাহিল, কুকুরটি চোখ বুজিয়াছে—

দরজার পাশে দাঁড়াইয়া খোকা দেখে—তেমনি ঘর, শ্বেত পাথরে বাঁধানো, ইহাই হয়ত পালঙ্ক। ঘরে ঢুকিয়া দেখে সত্যই এক রাজকন্যা ঘুমাইতেছে। মেঝে পর্যন্ত এলাইয়া পড়িয়াছে তাহার মেঘবরণ চুল, বালিশে মাথা রাখিয়া কুঁচবরণ কন্যা ঘুমাইতেছে। বুকের উপর একখানা খোলা বই নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে কাঁপিতেছে।

খোকা সমস্ত ঘর খুঁজিতে আরম্ভ করিল—সোনার কাঠি, রুপার কাঠি, কোথায় থাকিতে পারে? পালঙ্কের নীচে খুঁজিল, তাহার মা সাধারণতঃ এইরূপ স্থানেই মিছরির কৌটা লুকাইয়া রাখেন। কোথাও সোনার কাঠি রুপার কাঠি নাই। বাহির হইয়া আসিবে, হঠাৎ দেখে মেঘবরণ চুলে তাহার পথ বন্ধ। তাহাকে সরাইয়া দিয়া সে বাহির হইয়া আসিল—

আশ্চর্য—রাজকন্যা জাগিয়াছে। খোকা তাহার নিকটবর্তী হইয়া প্রশ্ন করিল—তুমি রাজকন্যা?

রাজকন্যা কহিল—হ্যাঁ। তুমি কে?

—আমি খোকা।

রাজকন্যা বিস্মিত হইয়া চাহিয়া রহিল। খোকা আবার শুধাইল—তোমাদের পক্ষীরাজ ঘোড়া আছে?

রাজকন্যা হাসিয়া বলিল—হুঁ, তুমি নেবে?

—হুঁ।

—কি করবে?

—দেশ জয় ক'রতে যাবো।

—তারপর?

—রাজকন্যাকে নিয়ে মাকে দেব।

—রাজকন্যাকে নিয়ে কি ক'রবে ?

খোকা চিন্তা করিয়া কহিল—খেলব।

—কি খেলবে ?

—ঘুড়ি ওড়াবো।

—তোমাদের বাড়ী কোনদিকে ?

খোকা অনেকটা উদাসভাবে যা হয় একটা দিক দেখাইয়া দিয়া বলিল —এই দিকে ?

—কেমন ক'রে এলে ?

—হেঁটে হেঁটে—

—কেন ?

খোকা ব্যথিত-কণ্ঠে কহিল— মা'র ত পক্ষীরাজ ঘোড়া নাই।

রাজকন্যা আবার একটু হাসিয়া উঠিল।

অপর্ণা দাসীকে ডাকিয়া কহিল—এ পাশের ওই বাড়ীর খোকা। কেমন ক'রে এখানে এল ? একে দিয়ে এসো, ওর মা হয়ত ব্যস্ত হয়েছে।

দাসী খোকাকে কোলে করিয়া লইয়া কহিল—বাড়ী যাবে ?

খোকা ঘাড় নাড়াইয়া জানাইল, যাইবে। কিন্তু রাজকন্যা ত তাহার সহিত গেল না। সে কহিল—তুমি যাবে না ?

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—আমাকে নিয়ে কি ক'রবে ?

খেলবো। তুমি ঘুড়ি উড়িয়ে দেবে।

আর ?

মা'র কাছে নিয়ে যাবো।

অপর্ণা হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আর একদিন যাবো। এসো, কেমন ?

খোকার ডাগর চোখ দুইটি জলে ভরিয়া উঠিল—কই রাজকন্যা ত আসিল না! ব্যথিতভাবে সে দাসীর কাঁধের উপর অত্যন্ত ক্লান্তের মত মাথাটা ন্যস্ত করিয়া দিল। দাসী চলিয়া গেল—

খোকার জলে-ভরা চোখ দুইটির অপ্রকাশ্য বেদনা অপর্ণার মনকে ব্যথিত করিয়া তুলিল। সে আপনমনে ভাবিল, এই খোকার জীবনে প্রথম সে রাজকন্যার সন্ধানে বাহির হইয়াছে, সারা জীবন উন্মুক্ত বিশ্বের বুকে সে তাহাকে খুঁজিয়া বেড়াইবে কিন্তু আজকার মত রাজকন্যা আসিবে না। বার বার দেখা দিয়া ইন্দ্রধনুর মত মিলাইয়া যাইবে। আশা নাই, তবুও খোঁজার অভ্যাস সে ছাড়িতে পারিবে না……এমনি করিয়া অমল একদিন রাজকন্যা খুঁজিতে তাহারই দ্বারে আসিয়াছিল, এই খোকার মত অশ্রুভরাক্রান্ত নেত্রে আপনার হৃদয়ের উন্মত্ত বেদনায় কণ্ঠরোধ করিয়া দিয়া রিক্তহস্তে ফিরিয়া গিয়াছে।……তাহার দ্বারের সম্মুখ দিয়া বিপুল গৌরবে রাজপুত্রও চলিয়া গিয়াছে, জীবনের স্বপ্ন-সঞ্চিত মালাটিকে ছিঁড়িয়া পথের ধূলায় ফেলিয়া দিয়া গিয়াছে—খোকার জল-ভরা ডাগর চোখ দুইটি কানের কাছে যেন ক্রমাগত আর্ত্তনাদ করিয়া ফিরিতেছে—আসিল না, আর আসিবে না।

উনিশ

অজিত ফিরিয়া আসিলে অপর্ণা তাহাকে এই ক্ষুদ্র রাজপুত্রের কাহিনী বলিয়া হাসিতেছিল। অজিতও উপভোগ করিয়াছিল, তাই প্রশ্ন করিল—কোন ছেলেটি?

—ওই বাড়ীর সেই খোকা। ভেবেছিলুম—কিছুক্ষণ রেখে দেব—কিন্তু বৌটা ভেবে সারা হবে তাই।

অজিত কৃত্রিম একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যা হোক, রাজকন্যা যে

রাজপুত্তুরের সঙ্গে সঙ্গে চলে যায় নি সেই আমার ভাগ্য। রাজপুত্তুর দেশজয় ক'রতেন সত্য, তবে আর একজনের বিবাহিত পত্নী হরণ করা হ'ত ?

অপর্ণা কহিল—আমি যাবো না শুনে তার বড় বড় চোখ দুটো দেখতে দেখতে জলে ভরে উঠ্‌লো, তা দেখলে সত্যিই মায়া হয়।

—যাক্, বুঝেছি, রাজপুত্তুরের সঙ্গেই যাওয়ার ইচ্ছে, তা যেও। আমার ভাগ্যে যা আছে হবে।

—সত্যিই ওদের বাড়ী গেলে তুমি কিছু মনে ক'রবে না ?

—না, মনে করবো কেন ?

—আবার রাজকন্যা খুঁজতে এলে রাজকন্যা রাজপুত্তুরকে ছাড়বে না। কিন্তু রাজার সঙ্গে দেখা হ'লে—

—ও, রাজপুত্তুরের বাবা ! আলাপ করে আস্‌বে—কিন্তু রাজপুত্তুর কি আর দরজা খোলা পাবে ?

হাস্য-পরিহাসের মাঝে খোকার প্রসঙ্গটা ক্রমেই গুরুত্ব লাভ করিল। খোকাটির ছোট হাত দুইখানি অপর্ণাকে যে এত প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে পারে তাহা সে কখনও ভাবিতে পারে নাই।

ঝুল বারান্দায় বসিয়া খাইতে খাইতে দুইজনেই খোকাকে অন্বেষণ করিতেছিল, কিন্তু খোকাও তাহার পরিচিত বারান্দার কোণটিতে নাই। কোথায় সে ? অপর্ণার একটু ভয় হইল—কি জানি ঝি তাহাকে ঠিক ঠিক পেঁছাইয়া দিতে পারিয়াছে কিনা !

কিছুক্ষণ বাদেই খোকা আসিল, কিন্তু অত্যন্ত বিরস বদনে, হয়ত মা তাহাকে খুব বকিয়াছে—না হয় উত্তম-মধ্যমের ব্যবস্থাও হইয়াছে। বারান্দায় পা ঝুলাইয়া বসিয়া উদাস নয়নে কি যেন দেখিতেছে, ঐ আকাশের নীল বুকে। মাতা রান্নার জোগাড় করিতেছেন—

কয়েক দিন চলিয়া গেল, কিন্তু রাজপুত্র আসিল না। অপর্ণা কয়েক দিন অপেক্ষা করিতেছিল, কিন্তু এখন সে বিশ্বাস করিয়াছে যে খোকার পক্ষে দুর্লঙ্ঘ্য দরজা ভেদ করা সোজা নয়; কিন্তু তবুও সে প্রতীক্ষা করে, ওই খোকা হয়ত একদিন আসিবে—

সেদিন সকালে বসিয়া অপর্ণা ওই খোকাটির বিচিত্র কার্য্যাবলী দেখিতেছিল। দরিদ্র স্বামী বাজার করিয়া নিয়া আসিয়াছে, অফিসের জন্য প্রস্তুত হইতেছে। বধূটি তাড়াতাড়ি মাছ কুটিয়া রান্নার জোগাড় করিতেছে; খোকা সম্ভবতঃ একটি ধাবমান মৎস্যের পিছনে পিছনে ছুটিয়াছে এবং তারস্বরে চিৎকার করিয়া মাতার উদ্দেশ্যে পলায়নপর মৎস্যের গতিবিধি নির্দ্দেশ করিতেছে—কিন্তু ধরিতে সাহস হইতেছে না।

খোকার কার্য্যাবলী একদিন তাহাকে আনন্দ দিয়াছে, কিন্তু আজ ব্যথিত করিয়া তুলিল। তাহার সন্তানটি বাঁচিয়া থাকিলে এত বড়ই হইত—হয়ত জীবনের মাঝে যে একাকীত্বটা আজ এমন প্রবলভাবে আত্ম-প্রকাশ করিয়াছে তাহা করিত না। অজিতের কোন দোষ নাই, তথাপি তাহার হৃদয়োত্তাপে তাহার হৃদয় উত্তপ্ত হয় না—অস্বস্তিকর একটা শীতলতা মনটাকে যেন ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় করিয়া দিতেছে—

সেদিন দ্বিপ্রহরেও অপর্ণা শুইয়াছিল কিন্তু কেন যেন ঘুমায় নাই। নিস্তব্ধ দ্বিপ্রহর, কোথাও এতটুকু শব্দ নাই, পাশের বাড়ীটাও নিঝুম। শান্ত দীর্ঘ গাছগুলির মাথা নীল আকাশের গায়ে আঁকা ছবির মত নিষ্প্রাণ। অপর্ণার হাতের বইখানা অত্যন্ত নীরস বোধ হইতেছিল—পড়ার অযোগ্য।

খুট্ করিয়া একটি শব্দ হইল। অপর্ণা ফিরিয়া দেখে খোকা ফিরিয়া দাঁড়াইয়া রেলিং-এ রজ্জুবদ্ধ কুকুরটির দিকে ভীতভাবে চাহিয়া

আছে। ডাকিবার একটা অদম্য ইচ্ছাকে চাপিয়া অপর্ণা খোকাকে দেখিতে লাগিল—কেমন করিয়া সে তাহার সহিত প্রথম পরিচয় করে।

খোকা ফিরিয়া চাহিয়া জাগরিত রাজকন্যাকে বিছানার উপর বসিয়া থাকিতে দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছিল—ঘুমন্ত রাজপুরীতে একা রাজকন্যা কেন জাগিয়া থাকিবে? আস্তে আস্তে সে আগাইয়া আসিয়া কহিল—তুমি রাজকন্যা?

—হ্যাঁ, পক্ষীরাজ ঘোড়া নিতে এসেছ? এস—

খোকা অত্যন্ত খুসীর সঙ্গে আর একটু আগাইয়া আসিয়া কহিল—দেবে? যেন অপর্ণার প্রতিশ্রুতিকে সে সম্পূর্ণ বিশ্বাস করে নাই।

—তুমি কেমন ক'রে এলে?

খোকা অত্যন্ত উদাসীন ভাবে জবাব দিল—হেঁটে হেঁটে? ঘোড়া কোথায়?

—আছে ঐ দিকে!

খোকার অঙ্গ আজ যথেষ্ট পরিষ্কার নয়, ইজের ও দেহ সবই ধূলাবলুপ্ত—পথে যে একবার অন্ততঃ পতন হইয়াছে এ বিষয়ে সংশয় নাই। অপর্ণা তাহার ইজেরটা এবং গায়ের ধূলা ঝাড়িয়া দিয়া বিছানার উপর তুলিয়া লইল। জিজ্ঞাসা করিল—কি নেবে?

—পাখী দেবে?

ঘোড়ার প্রতি আকর্ষণ কমিয়া অকস্মাৎ পক্ষীপ্রীতি বাড়িয়া উঠিয়াছে দেখিয়া অপর্ণা হাসিল। কহিল—কোনটা। খোকা পক্ষীর উচ্চতা দেখাইয়া কহিল—এত বড়।

নীচের পোষা ময়ূরটি যে আজ খোকাকে প্রলুব্ধ করিয়াছে তাহা অপর্ণা বুঝিয়াছিল তাই বলিল—ময়ূর নেবে?

—হেঁ!

—কি ক'রবে?

—চড়বো।

অপর্ণা আবার হাসিল, কহিল—আর কি নেবে?

—রাজকন্যে।

—কি ক'রবে?

—মাকে দেব।

—আমাকে নিয়ে যেতে পারবে?

—হুঁ—তুমি রাজকন্যে? জাগরিত এই রাজকন্যাই যে তাহার বাঞ্ছিত ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা একথা যেন তাহার বিশ্বাস হইতেছে না, তাই বারবার সংশয় প্রকাশ করিতেছে। অপর্ণা মনে মনে কহিল—রাজকন্যা যখন জাগে তখন এমনি করিয়াই সে রাজপুত্রের জীবনে একান্তই অবান্তর হইয়া যায়। রাজপুত্র যেদিন আসে, সেদিন রাজপুত্র হয় সাধারণ মানুষমাত্র। অপর্ণা তাই কহিল—আমাকে নিয়ে যাবে না তাহ'লে?

খোকা তাহার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—হুঁ। তুমি রাজকন্যে?

—হ্যাঁ, আমাকে নিয়ে যাবে?

—হুঁ চল। খোকা পালঙ্ক হইতে নামিতে নামিতে কহিল—এসো।

অপর্ণা ঝিকে ডাকিয়া কহিল—দ্যাখ্ সেই খোকাটি আবার এসেছে। সেদিন ওর মাকে কি বলে ছিলি?—ও যে আবার এসেছে।

ঝি কহিল—সদর দরজায় দাঁড়িয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে খুঁজছিল, খোকাকে দেখেই ব'ললে—কোথায় ছিলি?

আমি সব তাকে ব'লল্ুম। আমাকে কত আদর যত্ন ক'রলে— বুড়ীশাশুড়ী বৌকে ত এই গালাগাল—

অপর্ণা কহিল—চল, ওর মাকে জিজ্ঞাসা ক'রে আসি, খোকা কেমন ক'রে আসে এখানে ?

ঝি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করিল—আপনি যাবেন বৌরাণী ?

—হ্যাঁ যাবো। চল্—

দরজা খোলা ছিল—

ঢুকিতে ঢুকিতে অপর্ণা শুনিল, বধূ অত্যন্ত অপরাধিণীর মত শাশুড়ীকে বলিতেছে—মা খোকাকে ত পাচ্ছি না।

শাশুড়ী কহিলেন—না, দস্যি ছেলের সঙ্গে আর পারা যায় না, দেখো ত সদর খোলা না কি ?

বধূটি আসিতেছিল—খোকা তাড়াতাড়ি কোল হইতে নামিয়া তারস্বরে কহিল—মা, মা, রাজকন্যা এনেছি—

তিনজনকে এমনিভাবে আসিতে দেখিয়া গৌরী হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। অপর্ণা হাসিয়া কহিল—আপনার খোকা ত রাজকন্যাকে না এনে ছাড়বে না। কিন্তু খোকা রোজ রোজ পালিয়ে যায় কি ক'রে ?

গৌরী একটু হাসিয়া কহিল—আসুন।

অপর্ণা ঝিকে কহিল—তুই যা, গোটা চারেকের সময় এসে আমায় নিয়ে যাস্। চলুন—খোকা, খোকা, রাজকন্যাকে দিয়ে কি ক'রবে বলেছিলে ?

—মাকে দেব।

অপর্ণা পুনরায় হাসিয়া কহিল—নিন, ছেলেকে পাঠিয়ে রাজকন্যাকে ঘরে আন্‌লেন, এখন কি ক'রবেন তাই বলুন।

গৌরী অপর্ণাকে নিজ-কক্ষে বিছানার উপর বসাইয়া কহিল—আপনাকে বস্‌তে দেওয়ার মতও ত কিছু নেই—যদি অনুগ্রহ ক'রে এসেছেন তবে—

অপর্ণা কহিল—আমি কে, জানেন ?

—জানি, আপনি ঐ রাজবাড়ীর ঝুলবারান্দায় ব'সে বই পড়েন, না ?

—হ্যাঁ, আমি সেই।

গৌরীর মুখখানি সহসা লজ্জায় আরক্তিম হইয়া উঠিল। অপর্ণা তাহা লক্ষ্য করিয়া কহিল—হঠাৎ এত লজ্জিত হচ্ছেন কেন ?

গৌরী অবনত মুখেই কহিল—না।

—কিন্তু অমনি ক'রে ক্যারমের ঘুঁটি চুরি করা কি ভালো ?

—গৌরী হাসিয়া উঠিয়া কহিল—আপনি বুঝি ওই দেখেন ?

—হ্যাঁ, খোকাও ত আপনাকেই সাহায্য করে।

গৌরী আবার হাসিল। কহিল—কি ক'রবো, খেলে যে কেবলই হেরে যাই।

—আমি ত দেখি, আপনি কেবলই জিতে যান, আর সে বেচারী অন্যায়ভাবে হেরে যায়।

গৌরী একটু হাসিয়া অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল—কতকটা গর্ব্বে কতকটা ঐ বড়লোকের বাড়ীর বধূটির অকুণ্ঠ সহৃদয়তায়।

অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আপনার নামটি কি ?

—গৌরী। আপনার নাম ?

—অপর্ণা। উনি কি করেন ?

গৌরী একটু ব্যথিতভাবে জবাব দিল—কেরাণী। আপনার—

—ব্যারিষ্টার, তবে সে নামমাত্র।

আলাপ প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা হইল—অপর্ণা এম্‌-এ পাশ এবং গৌরী কোন পাশই নয়—তাহাও দুইজনে জানিয়া লইল। অমলের

মা আসিয়াও কিছু কিছু প্রশ্ন করিলেন এবং খোকার নানা দৌরাত্ম্যর কথা বিবৃত করিয়া কহিলেন—আপনাকে যেয়ে হয়ত কত জ্বালা দিয়েছে—ও ছেলের সঙ্গে পারবার যো নেই। এতদিন ত সদর দরজা খুলতে পারতো না. আজ একটা চৌকি নিয়ে তার উপর দাঁড়িয়ে হুড়কো খুলেছে। রাস্তায় কবে গাড়ী চাপা পড়বে, ও ছেলে—

—না না, ভয় ক'রবেন না অত। ছেলেরা ত একটু দুরন্ত হয়ই। প্রথমদিন ও কি ক'রলে জানেন? ঘুমিয়ে ছিলুম, হঠাৎ দেখি কে যেন চুল ধরে টান্‌ছে খাটের নীচে থেকে—কিছুক্ষণ পরে খোকা উঠে এসে বল্‌লে—তুমি রাজকন্যা? আমি হেসে বল্‌লুম—হুঁ।

গৌরী কহিল—ওই রাজকন্যার গল্প শোনে, তাই ভেবেছে বুঝি আপনি সেই—সেত মিথ্যে নয়।

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ, প্রায়ই রাজকন্যা, তবে বরণটা মেঘের মত, চুলটা কুঁচের মত—

মাতা কহিলেন—না না, সে কি কথা। আপনার মত রূপ ত রাজার ঘরেও মেলে না—

অপর্ণা এই অতিরঞ্জিত প্রশংসাবাদ শুনিয়া লজ্জিত হইয়া কহিল—কি যে বলেন। আমাকে আর আপনি বলেন কেন?

মাতা প্রতিবাদ করিলেন—না না, আপনাদের মত লোককে কি তুমি বলা যায়?

অপর্ণা প্রসঙ্গান্তরে প্রশ্ন করিল—কি কচ্ছিলেন?

বিছানার উপর একটা হাত ছেঁড়া সিল্কের পাঞ্জাবী, আর তার উপর একটা ব্লাউজ পড়িয়াছিল। গৌরী তাহাই দেখাইয়া কহিল—ওঁর পাঞ্জাবী ছিঁড়ে গেছে তাই দেখেছিলাম ব্লাউজ হয় কি না! সেই ফাঁকে খোকা পালিয়ে গেছে—

খোকা একমুঠা চাল চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছিল, মাতা কহিলেন —রাখ, রাখ, অত চাল দিয়ে কি ক'রবি—

খোকা পলাইতে চেষ্টা করিয়া কহিল—পাখী—পাখী খাবে—

মাতা ধরিয়া ফেলিয়া কহিলেন—কম ক'রে নিয়ে যা।

—না, না—নিও না। খোকা জোর করিয়া নিজেকে ছাড়াইয়া পলাইয়া গেল—

বাহিরে কয়েকটি চড়ুই আসিয়াছে—খোকা চাল ছিটাইয়া দিয়া ডাকিতেছে—আয় আয়—

মাতা কহিলেন—দিবারাত্র এমনি এত অশান্ত! সব জিনিষ ওর লাগবে—

অদূরে ছোট একটি সুসজ্জিত টেবিলের উপর ছোট একটা টাইমপিস্ অনিয়মিত সময় জ্ঞাপন করিত। গৌরী সেদিকে চাহিয়া দেখে চারটা বাজে। সে কহিল—যদি কিছু মনে না করেন, একটু চা তৈরী ক'রে দি।

— জলখাবার তৈরী ক'রবেন ত? সে আমি জানি—

গৌরী আশ্চর্য্য হইয়া কহিল—তাও বটে; কিন্তু তার আগে আপনাকে একটু চা ক'রে দি, তাই ভাবছিলুম। আমাদের মত লোকের বাড়ীতে যদি অনুগ্রহ করে এসেছেনই তবে—

—না, চা এখন আমি খাই না, আপনি খাবার তৈরী করুন, আমি বরং সাহায্য করি।

গৌরী হাসিয়া ফেলিয়া কহিল—আপনি আবার কি সাহায্য করবেন?

—যা ভাবছেন তা নয়, কিছু তৈরী ক'রতে আমরাও পারি। অন্ততঃ মাংসটা ওঁর চেয়ে ভালই পারি—

গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিল। অপর্ণা পুনরায় কহিল—অবশ্য খোকা যদি সাহায্য না করে—

গৌরী এবার খিল খিল করিয়া হাসিয়া কহিল—ও রকম সাহায্য ফাঁক পেলেই সে করে।

— ঝি আসিয়া জানাইল—চারিটা বাজিয়াছে। অপর্ণা কহিল— আচ্ছা, আজ তবে আসি, কাল আস্‌বো—

গৌরী বিনয় প্রকাশ করিয়া কহিল—আস্‌তে বলার সাহস নেই, তবে যদি আসেন অনুগ্রহ করে, তবে মনে মনে আপনার প্রশংসা ক'রবো—

—অত বিনয়ে কি হবে—ভাই? আস্‌বো—

অপর্ণা চলিয়া গেল।

অমল বৈকালে ফিরিলে জলখাবার ও চা দিয়া গৌরী কহিল—আজ খুব মজা হ'য়েছে, জানো?

অমল হাসিয়া কহিল—দুপুরবেলা তোমরা বসে বসে মজা ক'রলে আমি জানবো কি ক'রে? বলো—

—ওই যে রাজবাড়ী, ওর ঝুলবারান্দায় বসে একটি বউ প্রায়ই বই পড়ে দেখেছ?

—না, পরস্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকা আমার স্বভাব নয়! তার পর?

—সাধু পুরুষ কিনা? খোকা একদিন পালিয়ে···গৌরী খোকার রাজকন্যা আনিবার কাহিনী আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা করিয়া কহিল—বউটির কিন্তু এতটুকু দেমাক নেই। তবে চা খেতে ব'ললাম, খেলে না।

অমল কাহিনীর মাঝে কোথাও 'মজা' খুঁজিয়া পাইল না বলিয়াই মনে হয় এবং বড়লোকের বাড়ীর সহিত ঘনিষ্ঠতা খুব শুভ মনে না করিয়া জবাব দিল—ওরা তোমার মত লোকের বাড়ীতে সাধারণতই খায় না ·

—না খায় না। ও তরকারী কুটে দিতে চাইল পর্য্যন্ত।

—হ্যাঁ, তরকারী কুটতে হাত কাটুক, আর শেষে ফৌজদারী এক নম্বর হোক আমার নামে। যাই কর, তুমি কিন্তু ওখানে বেড়াতে যেও না, অপমানের একশেষ হ'য়ে ফিরবে—

– বড়লোক হ'লে তারা বুঝি কেবল মানুষকে অপমানই করে?

আভিজাত্যের প্রতি একটা ক্রোধ ও ঈর্ষা অমলের মনে সঞ্চিত হইয়া ছিল, কারণ তাহার দারিদ্র্য কেবল তাহাকে অপমানিত ও লাঞ্ছিতই করিয়াছে, সে তাই বলিল—অপমান করে না তবে হ'য়ে যায়! যে আজ খুব বীরত্বের সঙ্গে এখানে এসেছে, কাল তাদের সগোত্র দুচার জনের বিদ্রূপ শুনে সে আপনার কৃতকর্ম্মের জন্যে অনুশোচনা ক'রবে—

গৌরী কথাটা পছন্দ করিল না। কহিল বউটি এম্‌-এ পাশ তা জানো? অথচ আমাদের সঙ্গে কেমন ঘর-কন্নার কথা ব'লে গেল। খোকাকে খুব ভালবাসে—কাল আবার আসবে।

অমল মুখ মুছিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—ভাল! মহানুভবতার তুলনা নেই। কাজ আছে এখনি বেরুতে হবে।

গৌরী অভিমানের সুরে কহিল—বাড়ীর উপরে যে দাঁড়াতে ইচ্ছে করে না, এত সকালে কোথায় যাবে? ছেলে পড়াতে যাওয়ার ত দেরী আছে।

—একটা কাগজের আফিসে টাকা আন্‌তে যাবো; সেখানে আর একটু কথাও আছে।

গৌরী তাড়াতাড়ি কহিল—কাল যদি উনি আসেনই তবে কিছু ফল আর ছানা নিয়ে এসো, শুধু চা ত আর দেওয়া যায় না।

অমল জামা গায় দিতে দিতে কহিল—আন্‌বো যা পারি, কিন্তু এটা মাসের ২৫শে—

কুড়ি

অপর্ণা গৌরীর নিকট হইতে ফিরিয়া দেখে অজিত কোর্ট হইতে সকালেই ফিরিয়াছে। অজিত জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিতেই অপর্ণা কহিল—ও বাড়ীতে গেছলুম, আলাপ ক'রে এলাম।

—ভাল, রাজার দেখা মিল্‌লো ?

—না, রাজা আফিসে। রাজার দর্শনে ত যাইনি, রাজমাতা ও রাণীর সঙ্গে আলাপ হ'ল ?

—কেমন জম্‌লো ?

—তা কি একদিনেই জমে ? বড়লোক বলে একটু আড়ষ্ট হ'য়ে ত থাক্‌বেই, তারপর তাড়াতাড়িতে একটু ভুল ক'রলাম—

—কি ?

—চা দিতে চেয়েছিল, কিন্তু না খেয়ে এসে ভাল হয় নি। আভিজাত্য তথা গর্ব্ব মনে ক'রতে পারে।

— পারে। তা রাজপুত্র ?

—রাজকন্যাকে নিয়ে গিয়েই একেবারে ডিস্‌ইন্‌টারেষ্টেড, তখন চড়ুই পাখীকে চাল খাওয়ানো হ'ল। সত্যিই অমন দস্যি ছেলে নিয়ে পারাও দায়। আজ নিজে দরজা খুলে পালিয়েছে।

—কেমন ক'রে গেলে ?

—পেছনের দরজা দিয়ে ঝিকে নিয়ে গিয়েছিলাম। কেন ? তোমার আপত্তি থাক্‌লে স্পষ্ট ক'রে বলো—

অজিত বলিল—না, তুমি ত আর এমন অসূর্য্যম্পশ্যা নও ; একা একা ত ক'লকাতা ঘুরে বেড়িয়েছো। তবে আমি ঠিক আমার এ মন নিয়ে হয়ত ওদের সঙ্গে সমান ভাবে মিশ্‌তে পারতুম না। তোমার মনটা একটু ডিমোক্রেটিক।

—অপর্ণা কহিল জানি না কেন, ওই ছেলেটা আর ওর মাকে জানবার একটা অদম্য কৌতূহল আমার মনে আছে। ওদের এই শান্তিময় জীবনযাত্রার মাঝে ওরা কতখানি সুখী।

—কি দেখ্‌লে ?

—একদিনেই কি দেখা হয় ? ছেঁড়া পাঞ্জাবী দিয়ে রুমাল কি ব্লাউজ করবে তাই ভাবছিল। এই যে অনটন, এর মাঝে একটা ত্যাগের প্রতিযোগিতা চলেছে হয়ত—

অজিত হাসিয়া কহিল—তবে প্রাচুর্য্যই কি ভালবাসার অন্তরায় ! যাক্ আজ একটু ড্রাইভ ক'রতে যাবো, তুমি যাবে সঙ্গে ?

—যাবো। আমাকে ড্রাইভ ক'রতে দিতে হবে কিন্তু।

—হ্যাঁ। তোমার যখন লাইসেন্স রয়েছে তখন বারণ ক'রলেই বা শুন্‌বে কেন ? তবে বেচারা দু'চারজনকে চাপা দিও না।

অপর্ণা ব্রীড়াভঙ্গি করিয়া কহিল—তোমার মত র্যাস্ ত আমি্ নয়।

—গরুর গাড়ী চালালে বিপদ কম।

মাসের ২৫শে হইলেও অমল কিছু ফল ও ছানা লইয়া ফিরিয়াছিল—

পরদিন দুপুরে গৌরী অমলেরই একটা গল্প পড়িতে পড়িতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। খোকা সদর দরজার অলিন্দে বসিয়া নানারূপ ক্রীড়ায় ব্যস্ত ছিল এমনি সময়ে কড়ায় মৃদু শব্দ হইল। খোকা নানারূপ চেষ্টা করিয়াও দরজা খুলিতে পারিল না, তাই মাকে আসিয়া ডাকিল।

কে আসিবে তাহা জানা ছিল, অতএব গৌরী উঠিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিয়া বলিল—আসুন।

অপর্ণা নমস্কার করিয়া একটু অগ্রসর হইতে হইতে দেখিল, মায়ের

পিছন দিকে দাঁড়াইয়া খোকা কৌতূহলী দৃষ্টি দিয়া তাহাকে পর্য্যবেক্ষণ করিতেছে। অপর্ণা কহিল—খোকা, আমি কে?

খোকা একটু থতমত খাইয়া কোন জবাব দিল না। পুনরায় প্রশ্ন করিলে স্মিতহাস্যে বলিল—রাজকন্যা।

অপর্ণা হাসিয়া উঠিল, গৌরীও হাসিল। অপর্ণা ঝিকে বলিল—তুই যা, ঘণ্টা দুয়েক পরে এসে আমাকে নিয়ে যাবি। আর বাবু যদি বাড়ীতে আগেই আসে ত খবর দিস্।

ঝি চলিয়া গেল।

গৌরীর গৃহে একটি শয্যা, একটি টেবিল ও চেয়ার এবং একটি আলমারী ছাড়া কোন আসবাবপত্র নাই। বসিতে হইলে হয় শয্যায়, না হয় চেয়ারে। অপর্ণা বিছানায় বসিয়া খোলা মাসিকখানা টানিয়া লইয়া প্রশ্ন করিল—কি পড়ছিলেন?

গৌরী লজ্জিতভাবে বলিল—পড়া নয়, ছবি দেখছিলাম। অপর্ণা পৃষ্ঠা উল্টাইয়া দেখিল, জনৈক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা গল্প। কতদিন এই লেখকের গল্প পড়িয়া সে ভাবিয়াছে এই কি সেই অমল? সেকেণ্ড ক্লাস পাইয়া সে হয়ত কোন স্কুলে, না হয় সওদাগরী আফিসে চাকুরী করে; তাহার মাঝে আজও কি কাব্যপ্রতিভা বাঁচিয়া আছে? তাহার লেখার মাঝে আপনাকে খুঁজিয়াছে কিন্তু পায় নাই—

অপর্ণা ক্ষণিক পরে প্রশ্ন করিল—গল্পটা কেমন পড়লেন?

—ছাই।

গল্পটা অপর্ণার পড়া ছিল, সে কহিল—আপনি ত ছাই বলবেনই —আপনাদের ত আর এমন নয়। এ লেখকের যেন স্ত্রীর সঙ্গে বনিবনাও নেই, না? আপনার কাছে তাই ভাল লাগেনি—

—কেন?

—দূর থেকে যা দেখেছি তাতেই ব'লতে পারি। যে রকম

ক্যারম খেলা, আর তার পরে উঠানের মাঝে—অপর্ণা অর্থব্যঞ্জক দৃষ্টিতে চাহিল।

গৌরী লজ্জারক্তিম মুখখানি নীচু করিয়া কহিল—ওই ত ওর দোষ। আমি লেখাপড়া জানি না বলে ওর কি রাগ—দিবারাত্রি তাই ঝগড়া করে—

অপর্ণা তাহাকে বিশ্বাস করে নাই এমনিভাবে হাসিয়া উঠিল—এ যেন অভিমান।

গৌরী তাই বলিল—সত্যিই, ম্যাট্রিক পরীক্ষা দেওয়ার জন্যে পড়াতে সুরু ক'রলে কিন্তু কি করি—ওই দুরন্ত ছেলে নিয়ে কি পড়া হয়। তার পরে রান্না করা—সংসারের কাজ—

অপর্ণা ঠাট্টা করিয়া কহিল—পড়তে পড়তে ঝগড়া হয়নি? ধরুণ কলম্বস মহম্মদ তোগলকের বেয়াই কিনা—এই নিয়ে যেমন এই গল্প হ'য়েছে—

গৌরী হাসিয়া মুখ নীচু করিল, কোন জবাব দিল না। অপর্ণা ভাবিল ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের এই সংঘাত চলিয়াছে চিরদিন। একের পাওয়ার সহিত আর একজনের দেওয়ার বিভেদ কত দূরপ্রসারী। অপর্ণা প্রশ্ন করিল—আপনি তাহ'লে তাকে ভালবাসেন না?

গৌরী প্রতিবাদ করিল—তা কেন? ওই ত অমনি। একা একা রাত্রে কি করে, কিন্তু আমি কি জেগে থাকতে পারি ওর সঙ্গে?

—কি করেন?

—ছাইভস্ম লেখে, আর মাঝে মাঝে এমন এক একটা কথা বলে—শুনলে হাসি পায়, কিন্তু হাসলে বিপদ?

—কেন?

—সে সব কি কাব্য-কথা, অত শত আমি ত বুঝি না। চাঁদ উঠলে

একরকম হবে, বিষ্টি হ'লে হয়ত কাঁদতে হবে—রোদ উঠ্‌লে হয়ত গান ক'রতে হবে। গৌরী মুখ টিপিয়া হাসিল, অপর্ণা বুঝিল এই ব্যঙ্গের মাঝে গৌরীর গর্ব্ব ও আনন্দ প্রস্রবণের ধারায় ব্যক্ত হইয়া পড়িয়াছে। অপর্ণা তাই কহিল—সেজন্যে মনে মনে ত বেশ খুসী, আর কেবল দুষ্টুমী করা হয় না? আপনার ওঁর নাম কি?

গৌরী জবাব দিল—নাম সে করে না; সহসা সে ছুটিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। খোকা টবের মধ্যে নামিয়া জলকেলি আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। নিজদেহ দিয়া খোকাকে টানিতে টানিতে লইয়া আসিয়া প্রসঙ্গান্তরে কহিল—দেখেছেন, দু'দণ্ড কি সুস্থভাবে কথা বলারই উপায় আছে?

খোকা মাতার সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া চীৎকার করিতেছে—যাবো, আমি যাবো—

অপর্ণা কহিল—খোকন, এস, আর যায় না।

খোকা সেকথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহার রুচিমত চীৎকার করিতেছিল, অপর্ণা কহিল—না, একখানা ঘুড়ি দেব, কেমন উড়বে।

খোকা একটু চিন্তা করিল—দাও।

—কাল দেব। কেমন?

খোকা অপ্রসন্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—কাল?

কড়ায় শব্দ হইল। খোকা কহিল—দরজা খুলি মা?

গৌরী জিহ্বায় একটু কামড় দিয়া কহিল—ইস্‌, আজ ত শনিবার, তাই সকালেই ফিরেছে—

—কি করে বুঝলেন?

—ওই কড়ার শব্দে, আচ্ছা ওকে মার ঘরে পাঠিয়ে দেব, কেমন?

অপর্ণা কহিল—দরকার কি? আমি না হয় আলাপই ক'রলাম; অসূর্য্যম্পশ্যা ত নয়—

অকস্মাৎ অমল আসিয়া একেবারে ঘরের মেঝেয় দাঁড়াইয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে অপর্ণার মুখের পানে চাহিয়া অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল —অপর্ণা !

অপর্ণাও সঙ্গে সঙ্গে কহিল—অমল ? কি ভাগ্যচক্র, শেষে তোমার বৌ'এর সঙ্গে আলাপ ক'রতেই ছুটে এসেছি এখানে ?

গৌরীর মুখখানা দেখিতে দেখিতে শাদা হইয়া গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া সে মাথার কাপড়টা টানিয়া দিল। অমল চেয়ারটার উপর বিবশ দেহটাকে কোনমতে বসাইয়া দিয়া কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিল। অকস্মাৎ কহিল—হ্যাঁ, ভাগ্যচক্রেই বলতে হবে, নইলে খোকা রাজকন্যা খুঁজতে তোমার ওখানেই যাবে কেন ? এসেছ ভালই হ'য়েছে, একটু চা খেয়ে নাও। তোমাকে আজ আপনি বলাই হয়ত সংগত ছিল কিন্তু সম্ভব নয়। গৌরী একটু চা' করে দাও।

গৌরীর খাবার প্রস্তুত ছিল, সে ষ্টোভ জ্বালিবার জন্য স্পিরিটও ঢালিয়াছিল। অমল আফিসের জুতা খুলিতে খুলিতে কহিল—রাজকন্যা খোকাও পায় নি—খোকার বাবাও খুঁজে খুঁজে পরশ পাথরের সন্ন্যাসীর মত ঘুরছে—পুরাতন দীর্ঘপথ মৃতবৎ পড়ে আছে সামনে দিগন্ত বিস্তৃত। অমলের মা আসিয়া কহিলেন—অমল এলি রে ?

অমল কহিল—হ্যাঁ মা। ইনি কে চিনেছ ? কলেজে পড়বার সময় তোমার অসুখ হ'লে একজন তোমার কুশল সংবাদ পাওয়ার জন্যে পত্র দিয়েছিলেন মনে আছে ?

মা বলিলেন—হ্যাঁ।

—এই সেই অপর্ণা।

অপর্ণা মায়ের উদ্দেশ্যে কহিল—সেই সামান্য ঘটনাটা এতদিনেও মনে ক'রে রেখেছেন ?

জবাব দিল অমল—কারণ, ওঁর কুশল প্রশ্ন এক আমি ছাড়া দ্বিতীয়

কেউ করেনি কোনদিন। আমরা একসঙ্গে এম্-এ পড়েছি মা, আমি সেকেণ্ড ক্লাস - উনি ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছিলেন।

অপর্ণা লজ্জিত হইয়াছিল, কহিল—সেকথা তুলে কি হবে? তোমার নোট পড়েই ফার্ষ্ট ক্লাস পেয়েছি।

মাতা কহিলেন—বহুদিন পরে ত তোমাদের দেখা না? ভালই হ'ল পাশাপাশি বাড়ী।

অমল অপর্ণাকে কটাক্ষ করিয়া কহিল—কিন্তু ব্যবধান অনেক।

—কিন্তু এটা তোমার বাড়ী তা ঠিক না পেয়েই এসেছিলাম।

মাতা বাহির হইয়া ধাবমান খোকার অনর্থ নিবারণে মনোযোগ দিলেন। অমল অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন পাইয়া কহিল—কেন? তোমাদের মত বড়লোকের বাড়ীর বৌ'রা সাধারণতঃই আসে না। তাদের অন্য সমাজ, অন্য ব্যবস্থা।

অপর্ণা একটু থামিয়া কহিল—অসাধারণ কিছুকিছুও মাঝে মাঝে ঘটে, তার জন্যে প্রস্তুত থাকাই ভাল। তোমার বৌএর সঙ্গে আলাপ ক'রবার একটা দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছে ছিল—তোমাদের ক্যারম খেলা, মাংস রাঁধা ব্যাপার দেখে। সুযোগ ছিল না, খোকার ভুল সে সুযোগ এনে দিল।

—ইচ্ছেটা দুর্দ্দমনীয় হ'ল কেন?

- মনে হ'ল তোমরা খুব সুখী দম্পতী তাই।

—কেন, তোমরা?

—আলোচনা ক'রে লাভ নেই, অন্ততঃ আজ।

অমল হাসিয়া বলিল—ও আলোচনা না হয় থাক্, কিন্তু আমরা খুব সুখী এ ধারণার মূলেও ত কোন হেতু নেই। তবে অকারণ কাউকে কোন দিন দুঃখ আমি দেই নি—

গৌরীর চা হইয়া গিয়াছিল। অমল বলিল—আমাদের দু'জনকেই

দাও, এক সঙ্গে আমরা খেয়েছি বহুদিন। গৌরী খাবার ও চা দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যাইতেছিল—সম্ভবতঃ অভিমানে, না হয় অশুভের আশঙ্কা করিয়া। অপর্ণা ও অমলের এই সাক্ষাৎকে মনে মনে সে কিছুতেই সরলভাবে গ্রহণ করিতে পারিতেছিল না।

অমল ডাকিল—গৌরী। অপর্ণা তোমার কাছেই এসেছে সেকথা ভুলো না—

গৌরী 'আসছি' বলিয়া চলিয়া গেল।

অমল কহিল—আমার এ অস্বচ্ছল গৃহের মাঝে তুমি অতিথি হ'য়ে আসবে একথা ছিল স্বপ্নাতীত—আজ ভাগ্যচক্রে যদি তাই ঘটেছে তবে আমাদের সৌজন্যকে গ্রহণ ক'রে ধন্য ক'রো।

অপর্ণা অত্যন্ত কাতরদৃষ্টিতে অমলের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া কহিল—এতদিন পরেও কি আমাকে ব্যঙ্গ ক'রে, আঘাত ক'রে তুমি আনন্দ পেতে চাও? আমাকে বেদনা দিয়ে তোমার লাভ?

—লাভ নেই। তুমি আজ আমার আঘাতের অনেক উপরে, তাই কেবলমাত্র সৌজন্যই প্রকাশ ক'রতে চেয়েছি।

অপর্ণা চা'য়ে চুমুক দিয়া সজল চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—ভাল। ভুল ক'রেছি জানি, কিন্তু আজ ত সে ভুল শোধরাবার কোন উপায় নেই—তা কি ক্ষমার বাইরে?

—ক্ষমা! তুমি হাসালে, তুমি কোন ভুল ক'রনি। আমার অন্যায় স্পর্দ্ধাকে আজ আমি তিরস্কার করি।

—সেকেণ্ড ক্লাস না হ'লে হয়ত আজ—অপর্ণা বলিতে পারিল না, সহসা থামিয়া গেল।

অমল সমবেদনার কণ্ঠে কহিল—সেজন্যে আর যাই হোক, তোমাকে দায়ী ক'রবো না। আমার মনটাই তখন বাঁধনের বাইরে চলে গিয়েছিল তাই, নইলে হয়ত হ'তে পারত—

দুইজনই অকস্মাৎ চুপ করিয়া গেল। অপর্ণা তাড়াতাড়ি আঙুর কয়েকটা মুখে ফেলিয়া দিয়া কি যেন ভাবিল। অমল বাইরের পানে চাহিয়াছিল। অপর্ণা কহিল—অমল, তুমি যে একান্ত একাকী নিশীথ রাত্রে উঠানে ঘুরে বেড়াও সেকথা আমি জানি—আমিও একান্ত একা ঝুলবারান্দায় বসে দেখি। আমার কাছে তোমার কিছুই গোপন নেই, সম্ভবতঃ এই জন্যই তোমার ছেলে তার কচি হাতে এমনিভাবে উঁচু থেকে টেনে নামিয়ে এনেছে, কিন্তু আজ কেমন ক'রে তোমায় আমি সমস্ত বল্‌বো?

অমল কাতরকণ্ঠে কহিল—লাভ নেই, অপর্ণা। আমাদের চাওয়ার ত কোন শেষ নেই, আজ বিবাহিত জীবনে বুঝেছি যে মানুষ একা একান্তই একা। নইলে গৌরীর কোন ত্রুটি নেই, তবুও আমি কেন তৃপ্তিহীন জীবন-যাপন করি? আমার দেহাতীত মনের ব্যসন তুমি, তোমাকে আপনার ক'রে পেলেও মনের সে ব্যসনবৃত্তি যেতো না।

—জানি, তবুও তোমার সে বিদায়ের দিনটি নিরন্তর আমাকে যেন সাপের মত দংশন করে—

গৌরী আসিয়া পড়িল—যে আলোচনা চলিতেছিল তাহা আর চলিতে পারে না। অপর্ণা একটু হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—কবিতা ছেড়ে, গল্প লিখতে সুরু ক'রেছ কতদিন? তোমার লেখাই যে পড়ি, তা'ত এতদিন জানতুম না।

— আজ জান্‌লে, এখন মনোযোগ দিয়ে প'ড়ো।

গৌরীকে ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিয়া অপর্ণা কহিল—ওর সমস্ত গোপন কথা লিখে ফেলেছ যে?

গৌরী হাসিয়া কহিল—আমার কেন?

অমল একটু ব্যঙ্গের সুরে কহিল—গোপনটা আমার—

গৌরী গ্রীবা বাঁকাইয়া কহিল—ইস্—

একুশ

রাত্রি গভীর হইয়া আসিয়াছিল কিন্তু অমল তবুও কেন যেন একটু অস্বস্তিবোধ করিতেছিল। বাহিরে একটু শীত পড়িয়াছে অমল তবুও উঠানে একটা ডেকচেয়ারে বসিয়াছিল—গৌরী ঘুমাইয়া আছে মনে করিয়া সে দেরী করিতেছিল। এতদিন লক্ষ্য করে নাই আজ উপরের ঝুলবারান্দাটা সে লক্ষ্য করিল—দুইটি লোক জ্যোৎস্নায় বসিয়া আছে। সম্ভবতঃ অজিত ও অপর্ণা।

অতীতের বিস্মৃতপ্রায় স্মৃতি আজ অকস্মাৎ সুপ্তোথিত হইয়া প্রবল শক্তিতে অমলের মনটাকে আলোড়িত করিয়া দিয়াছে। বিদায় দিনের সেই বর্ষণমুখর সন্ধ্যায় আকাশের অন্ধকারের বুকে ধীরে ধীরে অপর্ণার স্বল্প-উন্মুক্ত বাতায়ন চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সে দ্বার আজ উন্মুক্ত হইবে না—সে অমল আর আসিবে না।

বিগত দিনের সেই নিরুদ্ধ অভিমান আজ যেন শতগুণ বেগে অমলকে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছে। নিজের অক্ষমতার ও দৈন্যের প্রতি একটা বিজাতীয় ঘৃণায় নিষ্ফল আক্রোশে সে আপনা-আপনি উত্তেজিত হইয়া উঠিল। ভাবিল—আজকার এ অপর্ণাকে সে ত চাহে নাই। আজকার এই পরিতাপ এবং অনুশোচনা একেবারে মূল্যহীন। কলেজের সেই স্বচ্ছতোয়া পার্ব্বত্য ঝর্ণার মত কুমারী অপর্ণাকে সে চাহিয়াছিল আপনার করিয়া, এ তাহার ভগ্নাবশেষ মাত্র। সে অপর্ণা আজ তাহার কল্পনা বিলাসের সামগ্রী—সে অপর্ণা আজ মৃত।

একটা গাঢ় দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া অমল উঠিয়া দাঁড়াইল। নিঃশব্দে ঘরে গিয়া শুইতে যাইতেছিল—গৌরী পুত্রকে কোলে করিয়া নিশ্চয়ই পরম নিশ্চিন্তে ঘুমাইয়া আছে. কিন্তু গৌরী অকস্মাৎ আলো জ্বালাইয়া উঠিয়া বসিল।

কিছু বলিবার মত মানসিক অবস্থা অমলের ছিল না, সে শুইয়া পড়িল। গৌরী প্রশ্ন করিল—তোমার মন আজ খুব খারাপ না?

—না। তুমি ঘুমোও নি যে!

—ঘুম পায় নি। মিথ্যে কথা ব'লো না—সেই পুরোণো দিনের মাঝে অপর্ণার কথা ভাবছিলে না?

অমল একটু হাসিয়া কহিল—কেন হিংসে হ'ল। আমি কি ভাবি তাও তুমি বলে দিতে পারো?

—পারি। সত্যি করে বল না—

—যদি বলি ওর কথাই ভাবছিলাম, তবে তুমি ত দুঃখ পাবে নিশ্চয়ই, আর কাল এলে অভদ্রতা ক'রবে কেমন?

গৌরী পরিহাস করিল—তোমার অপর্ণা তাকে অনাদর ক'রতে পারি?

—ছিঃ গৌরী, সে পরস্ত্রী, তার সম্বন্ধে এ কথা বললে পাপ হয়।

গৌরী কহিল—যাক্ পাপপুণ্য জ্ঞান যে তোমার খুব টনটনে তা বুঝেছি, তবে নিজের স্ত্রীর কাছে সব গোপন করাটাও পাপ ত? না সেটা যুধিষ্ঠিরের কাছে পাপ নয়?

অমল কোন কথা বলিল না, কিছুক্ষণ পরে শুধু কহিল—ও নিয়ে তর্ক ক'রে লাভ নেই। রাত্তির হ'য়েছে, চল এখন ঘুমুই!

—গৌরী কথাটার গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিল তাই কহিল—আচ্ছা, ওর সঙ্গে বিয়ে হ'লে তুমি খুব খুসী হ'তে না?

—না। তোমার সঙ্গে বিয়ে হ'য়ে যতখানি সুখী হ'য়েছি ততখানিই হতুম।

—আমার জন্যে তুমি ত অসুখী—

অমল দীর্ঘশ্বাস মুক্ত করিয়া দিয়া কহিল—তুমি হয়ত বুঝবে না গৌরী, মানুষের মনকে মানুষে তৃপ্তি দিতে পারে না, তোমাকে সুখী হ'তে

হ'লে আমাকে অসুখী করতে হবে—তোমার চাওয়ার বস্তু, চাওয়ার প্রণালী সবই অন্য, সকলের থেকে বিভিন্ন, কাজেই আমরা চলি একসংগে বটে কিন্তু মন আমাদের গগন সঞ্চারী ব্যভিচারী।

গৌরী বিশেষ কিছু বুঝিল না, কেবল প্রতিবাদ করিল—সকলের মনই ত আর তোমার মত নয়।

—তোমার মনে যদি এই ব্যভিচার বৃত্তি না থেকে থাকে তবে ব'লবো তুমি স্বাভাবিক নয়—তোমার মন মৃত—

গৌরী নারীসুলভ ভঙ্গিতে কহিল—মন মরেই যাক্, ওকে আর জ্যান্ত করে কাজ নেই। গৌরী অমলের বুকের মাঝে মুখ লুকাইয়া শুইয়া রহিল—এই বক্ষের তপ্ততার মাঝে সে যেন সমস্ত দুঃখ সুখ ভাবনাকে নিবেদন করিয়া দিয়া পরম নিশ্চিন্তে নির্ভর করিয়া আছে।

অমল অনুভব করিল, গৌরীর নিশ্বাস ধীরে ধীরে গাঢতর হইয়া আবার হাল্কা হইয়া আসিল। তাহার সুকোমল বাহুর স্পর্শ অমলের সর্ব্বাংগে গৌরীর অস্তিত্বের বার্ত্তা ঘোষিত করিতেছে - সে ভাবে—অপর্ণার দেহ যদি এমনি কোমলতায় তাহার দেহকে আচ্ছন্ন করিত তবুও কি এই মন পরম নিশ্চিন্তে নিষ্ক্রিয় হইয়া যাইতে পারিত—তাহার গগনসঞ্চারী মন কি স্তব্ধ হইয়া মুহূর্ত্তের জন্য আসিয়া দাঁড়াইত —কিন্তু আজিকার এই অপর্ণা, ইহাকে সে ত চাহে নাই। তেমনি করিয়া সে যদি আবার কলেজে যাইতে পারিত—বিগত যৌবনকে ফিরাইতে পারিত তবেই হয়ত সম্ভব হইত।

হয়ত গৌরী জানে না—তাহার দেহের মাঝে অমল কাহাকে পাইতে চাহিতেছে।

সেদিন রাত্রে অপর্ণা একাকী ঝুলবারান্দায় বসিয়া ভাবিতে ভাবিতে আবিষ্কার করিল—গৌরীর স্থানটি, তাহার ওই স্বামী ও পুত্র, অনাবিল

আনন্দময় সংসারযাত্রা তাহার অজ্ঞাতে যে তাহাকে এমনি প্রলুব্ধ করিয়াছে, এমনি আকর্ষণ করিয়াছে তাহা একান্তই ভাগ্যনিয়ন্ত্রিত। ওই স্বামীপুত্র ও গৃহ সে পাইতে পারিত, কিন্তু একটু সাহসের অভাবে তাহা হয় নাই। আজ অমল পুনরায় যেন তাহার কাছে বড় আপনার বলিয়া বোধ হইতেছে। অমলের বিদায় দিনের সেই নিরুদ্ধ অভিমান আজও তাহার অন্তরকে যেন বারম্বার কাঁটার ক্ষতে রক্তাক্ত করিয়া দেয়।

কিন্তু সে একবারও ভাবিয়া দেখিল না, তাহার অবস্থিতি অমলের গৃহকে একরূপই করিয়া তুলিতে পারিত কিনা। গৌরীর মত একান্ত নির্ভাবনায় সে অমলের বুকে মুখ লুকাইতে পারিত কিনা!

অজিত আসিয়া প্রশ্ন করিল—অপর্ণা আজ তোমাকে এত বিমনা বোধ হ'চ্ছে কেন?

—বিমনা?—না। এখন বিমনা ভাব দেখলে কোথায়?

—কি ভাবছিলে? ঘরে এসে দাঁড়িয়েছি তা জানতেই পারলে না।

—ও তাই!

—ও বাড়ীতে গেছলে নাকি?

—হ্যাঁ। ওটা কার বাড়ী জানো?

—জানা সম্ভব নয়।

—ওটা হ'চ্ছে সাহিত্যিক—মানে গল্প লিখিয়ে অমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ী। তার অনেক গল্পই ত তুমি পড়েছ?

—হ্যাঁ। জান্‌লে কি ক'রে?

—জান্‌লুম কি ক'রে? ওর স্ত্রীর কাছেই, তার পরে তার সঙ্গেও আলাপ হ'ল।

—কি আলাপ?

—সাহিত্য সম্বন্ধে। তার পর ওর স্ত্রীর অভিযোগ যে তাকেই

নাকি তিনি গল্পে গালাগালি করেন। অপর্ণা সমস্ত ঘটনাই বর্ণনা করিল, কিন্তু একটি কথা সে গোপন করিয়া গেল—অমল যে তাহার সহপাঠী এবং পূর্ব্বপরিচিত সে কথাটা প্রকাশ করিতে পারিল না। মনের কোন অজ্ঞাত কোণে যে তাহার এই দুর্ব্বলতাটুকু এতদিন ধরিয়া সঞ্চিত হইয়াছিল তাহা সে বুঝিল না।

অজিত কহিল—যা হোক, সাহিত্যিক সন্দর্শনে আজ বেশ ভাবাকুল হ'য়েছ, এটা ভাল কথা, কিন্তু কাল রবিবার—আমরা ত একটা অভিযানে যাচ্ছি, কাল শিবপুর, তুমি যাবে ত?

—শিবপুর? না ভালো লাগে না। তোমরাই যাও, আমি কাল একটু বালিগঞ্জে যাবো, মায়ের শরীর ভালো যাচ্ছে না।

—কখন যাবে?

—যখন যেতে দেবে।

—আমরা ত সকালেই যাচ্ছি, তুমিও তাই যেও—সন্ধ্যায় ফিরবে, কেমন?

অপর্ণা আঁখি-ভঙ্গি করিয়া কহিল—যেমন আদেশ!

অজিত অপর্ণাকে কি যেন বলিতে যাইয়া থামিয়া গেল। কিছুক্ষণ পরে বলিল—আমার আজ্ঞানুবর্ত্তিণী সহধর্ম্মিণী!

সকালে অজিত বাহির হইয়া গেলে অপর্ণাও বালিগঞ্জ যাইবার জন্যে প্রস্তুত হইয়া গাড়ী বাহির করিতে বলিল। চাকর ও সোফারকে উপযুক্ত উপদেশ দিয়া সে ওই বাড়ীটির পানে চাহিয়া ভাবিল—অমলের কাছে কয়েকটি কথা বলিবার ইচ্ছা তাহার মাঝে দুর্দ্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছিল, কাল তাহা বলা সম্ভব হয় নাই। অপর্ণা ভাবিল, আজ বালিগঞ্জে নিমন্ত্রণ করিলে, সেখানে অমলকে হয়ত সে প্রশ্ন করা যাইবে। অপর্ণা ঝিকে ডাক দিয়া অমলের বাড়ীতে উপস্থিত হইল—

অমল বাজার করিয়া আসিয়াছে—উঠানে কয়েকটি জীবন্ত কই মৎস্য কানে হাঁটিয়া এদিক ওদিক ছিটাকাইয়া গিয়াছে। অমল কি যেন গভীর অভিনিবেশ সহকারে পত্নীকে বুঝাইয়া দিতেছে। পুত্র খোকা ধাবমান একটি কই মৎস্যের ল্যাজ ধরিয়া অত্যন্ত সাবধানে মাতার কোঁচড়ের মধ্যে রক্ষা করিল। বলাবাহুল্য পুত্রের এই সঞ্চয় প্রবৃত্তিতে মাতা বিশেষ আনন্দিত হইলেন না। খোকা একটি চড় খাইয়া এক পাশে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পিতার নিকটে মাতার এই অন্যায় আচরণ সম্বন্ধে সম্ভতঃ অভিযোগ করিল।

উঠানে কই মৎস্য সম্বন্ধে গবেষণা চলিতেছিল। অপর্ণা ডাক দিল—অমল। মায়ের অসুখের সংবাদ পেয়ে বালিগঞ্জে যাচ্ছি। মা তোমার কথা অনেকদিন বলেছেন কিন্তু দেখা ত হয়নি। সম্ভবতঃ তিনি বেশীদিন আর বাঁচবেন না—তুমি যাবে দেখা করতে ?

অমল কহিল—নিশ্চয়ই যাবো। কি হয়েছে ?

অপর্ণা হঠাৎ কোন রোগের নাম খুঁজিয়া না পাইয়া কহিল—ব্লাডপ্রেসার।

—ওঃ, তুমি এখনই যাচ্ছো ?

—হ্যাঁ। ক'টায় যাবে ? আমি না থাকলে তোমার হয়ত অসুবিধে হবে এতদিন পরে।

—পাঁচটা, সাড়ে পাঁচটা কেমন।

—আচ্ছা, চললুম। তুমি যেও। গৌরীকে সম্বোধন করিয়া কহিল—আপনি বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছেন যে আমার মায়ের অসুখ তা ও যাবে কেন, তাই না ?

গৌরী জবাব দিল না, কেবল সবিস্ময়ে এই শিক্ষিত ধনীগৃহবধূর পানে চাহিয়া রহিল।

—আমরা যখন একসঙ্গে পড়তুম, তখন ও আমাদের ওখানে প্রায়ই

যেতো, মাও ওকে খুব স্নেহ করতেন ; মাঝে মাঝে অমলের কথা বলেন। কেমন আপনি ছুটি দেবেন ত ?

গৌরী হাসিয়া ফেলিল। ছুটি দেওয়ার ব্যাপারটা একেবারেই হাস্যকর, তাই বলিল—আপনি বুঝি ছুটি দেওয়ার মালিক ? আমার তেমন ভাগ্য হয় নি।

অমল পরিহাস করিল—এটা মিথ্য কথা গৌরী। আমি তোমার ছুটি না নিয়ে কোথাও গেছি ?

খোকা এতক্ষণ চোখ পাকাইয়া পাকাইয়া এ সমস্ত শুনিতেছিল - একটা কোথাও যাওয়া হইবে সেটা সে অনুধাবন করিয়াছিল এবং সেই সঙ্গে গাড়ী চড়াও অবশ্যই হইবে। তাই সে পিছন হইতে বলিয়া উঠিল—আমি যাবো বাবা !

অপর্ণা কহিল—এস খোকা এস, নিশ্চয়ই যাবে। ওকে নিয়ে যেও অমল।

অমল কহিল—ঐ গুরুতর দায়িত্ব আমি বহন ক'রতে নারাজ। শ্রীমান কখন কোন অনর্থ ক'রবেন তা জানা নেই। ও সামলাতে পারবো না।

—আমি সাম্‌লাবো। তুমি নিয়ে যেও। খোকা তুমি যেও তোমার বাবার সঙ্গে। চকোলেট দেব, আর এত বড় একটা ঘোড়া দেব। যাবে ত ?

খোকা স্মিতহাস্যে কহিল—যাবো।

অপর্ণা অপেক্ষা করিল না। অত্যন্ত ব্যস্ততার অভিনয় করিয়া তাড়াতাড়ি চলিয়া আসিল।

অমল একাকী সাড়ে পাঁচটায় উপস্থিত হইল।

অতি পরিচিত বাড়ী—ঠিক তেমনি রহিয়াছে, কোথাও বিশেষ কোন

পরিবর্ত্তন হয় নাই। অথচ অত্যন্ত সংক্ষেপে সাতটি সুদীর্ঘ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বাড়ীটার রং বোধ হয় শীতাতপে বৃষ্টিতে একটু ফিকে হইয়াছে, কাঁকর দেওয়া রাস্তাটার পাশে চারাগাছগুলি একটু বড় হইয়াছে, ফটকের উপরের লতাটা বহু শাখা-প্রশাখা মেলিয়া আপনাকে বিস্তার করিয়াছে—রেলিংএর রংটা একটু চটিয়া গিয়াছে।

দ্বিতলের সে জানালাগুলি বন্ধ। মনে হয় আজ দীর্ঘ সাত বৎসর তাহারা রুদ্ধ হইয়াই আছে। অমল অত্যন্ত ধীর ও দৃঢ় পদক্ষেপে বারান্দায় আসিয়া দাঁড়াইল, কেহ কোথাও নাই। সামনের ওই অলিন্দে অপর্ণা একদিন তাহার হাতখানা ধরিয়া কি বলিয়াছিল, ওই গৃহে বসিয়াই অপর্ণা সাশ্রুনেত্রে তাহাকে বিদায় দিয়াছে।

অপর্ণা ডাকিল—এস অমল।

সামনের কক্ষে অপর্ণা, তাহার মাতা ও করুণা বসিয়া আছে। বালিকা করুণা আজ শতদলের মত পাপড়ী মেলিয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। অমল তাহার মাতাকে নমস্কার করিয়া কহিল—করুণা যে এত বড়টি হ'য়েছে এ যেন ভাবা চলে না।

মাতা কহিলেন—এস বাবা অমল, ক'লকাতায়ই আছ, অথচ দেখা নেই কতকাল। একেবারেই ভুলে গেছ—

অমল একটু হাসিয়া কহিল—আসা হয়নি—ছাত্র জীবনে অবসর ছিল, বন্ধু ছিল, আত্মীয় ছিল, কিন্তু আজ আফিস আর সংসার ছাড়া কিছুই নেই জগতে—

—তোমার ছেলে-পুলে?

—একটি ছেলে।

—তাকে নিয়ে এলে না কেন? কত বড়?

অপর্ণা কহিল—সুন্দর ছেলেটি মা, বারবার আনতে বল্লুম তা আন্‌লে না। কি মিষ্টি তার কথা—বছর পাঁচেক বয়েস।

...করিয়া কহিলেন—অপর্ণার ছেলেটিও ত বেঁচে ...ক্‌লে অত বড়টি হ'ত।

অমল কহিল—করুণা কি পড়ছে আজকাল?

—ওর ত এবার থার্ড-ইয়ার।

অমল করুণার দিকে চাহিয়া কহিল—তুমি বলায় অসম্মান বোধ ক'রলে কিনা জানি না, তবে তোমায় খুব ছোটকালে তুমি ব'লতাম।

করুণা লজ্জিত অবনত চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—না, অসম্মান বোধ ক'রবো কেন?

অপর্ণা পরিচয় করাইয়া দিল—তোর হয়ত মনে আছে, আমার এম্-এর সহপাঠী উনি, বহুদিন তুই ওঁকে চা দিয়েছিস্—বর্ত্তমানে উনি প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক অমল বন্দ্যোপাধ্যায়—

করুণা স্মিতহাস্যে কহিল—ও আপনি লেখক অমলবাবু! আপনার 'একা' গল্প নিয়ে যে সেদিন কলেজে খুব তর্ক আমাদের মধ্যে—

অমল গম্ভীর ভাবে প্রশ্ন করিল—তর্কের ফলাফল?

—আপনার পক্ষে খুব প্রশংসা নয়—সকলেই আমরা একমত যে আপনি দাম্পত্য জীবনে সুখী নন।

অমল প্রশ্ন করিল—ও, তাহ'লে তর্কটা গল্প নিয়ে নয়, তর্কটা হ'য়েছে জীবনী নিয়ে?

—প্রায়, তবে আমাদের অভিমত—

—সত্য কিনা? তার উত্তরে বলতে পারি, যাঁরা আপনার অন্তরকে চেনে এবং সত্যিই ভালবাসে, তারা কখনও দাম্পত্য জীবনে সুখী নয়। মানুষের মন বাস্তব নিয়ে কখনই সুখী হ'তে পারে না!

অমল লক্ষ্য করিল, করুণার বলার ভঙ্গি, চোখের দৃষ্টি অপর্ণার বিগত দিনেরই কথা স্মরণ করাইয়া দেয়।

অপর্ণা যেন সহসা নবজীবন লাভ করিয়া করুণার মাঝে আত্মপ্রকাশ

করিয়াছে। অমল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সেই দেখিতেছিল—করুণা তাই নতদৃষ্টিতে কহিল—কথাটা সর্ব্বক্ষেত্রেই সত্য!

—না, যাদের মন সূক্ষ্ম অনুভূতিহীন, তারা সত্যিই খুসী।

আলোচনা চলিতেছিল, মাতা হঠাৎ উঠিয়া কহিলেন—করুণা তোমার ত খুব তর্ক আরম্ভ ক'রলে একটু চা'র বন্দোবস্ত করবে না?

করুণা বলিল—হ্যাঁ, এক্ষুণি নিয়ে আসছি—

উভয়ের প্রস্থানে ঘরে অকস্মাৎ একটা নির্জ্জনতা যেন মৃত্যু-শোকাকুল গৃহের মত অস্বস্তিকর হইয়া উঠিল। পুঞ্জীভূত কথার আবেগে উভয়েই চুপ করিয়া বসিয়া আছে। অপর্ণা কহিল—তোমাকে এখানে ডেকে এনেছি কেন, তা বোধ হয় জানো না। তোমার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে। বহুদিন ভেবেছি তোমার সঙ্গে যদি কখনও দেখা হয় তবে সে প্রশ্নের সমাধান ক'রবো।

অমল অত্যন্ত শান্তকণ্ঠে কহিল—সে সমস্যা সমাধান হয় না অপর্ণা। আমিও ভেবেছি তোমাকে জিজ্ঞাসা ক'রবো—কত কি; কিন্তু জানি সমস্যা বেড়ে যাবে, সমাধান হবে না।

অপর্ণা চিন্তা করিয়া জবাব দিল—না হোক, কথা কয়টা যদি বলা হয়, তবে সেই পরম লাভ। না-বলার দুঃসহ ব্যথা আজ সবচেয়ে বড় হ'য়ে উঠেছে।

অমল জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

অপর্ণা কহিল—যেদিন এই বাড়ী থেকে, অত্যন্ত আহত অবস্থায় তুমি চলে গিয়েছিলে সে দিন কিছুই তোমাকে ব'লতে পারিনি। যে দু'ফোঁটা চোখের জল তোমার জন্যে পড়েছিল তার কি অর্থ তুমি করেছ জানি না, কিন্তু সেদিন যা বলবার ছিল তার কিছুই বলা হয় নি।

অমল রুদ্ধ অভিমানে অত্যন্ত কাতর কণ্ঠে কহিল—আজ বলে লাভ?

—লাভ লোকসান বিচার ক'রতে চাই না, তবে যা বলবার তা ব'ল্তে চাই। উত্তর অপ্রয়োজনীয় মনে ক'রলে দিও না।

অমল একটু হাসিয়া কহিল—বল।

—তুমি মনে মনে আমাকে ক্ষমা ক'রেছ কিনা জানাবে?

অমল আবার হাসিয়া কহিল—আজ সে কথা অবান্তর। আজ তোমার সঙ্গে আমার তফাৎ কি তা বুঝিয়ে না ব'ললেও তুমি জানো। আজ আমার ক্ষমা করা না করায় তোমার জীবনের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি নেই—সে কথা শুনেও লাভ নেই—তা ছাড়া আজ তোমার পক্ষে তার প্রতিবিধান করাও সম্ভব নয়, সেকথা ভেবে দেখেছো?

অপর্ণা করুণকণ্ঠে কহিল—আমাকে আঘাত করার প্রলোভন আজও তোমার আছে; কিন্তু যে আত্মসমর্পণ করেছে তা'কে আঘাত ক'রে তোমার লাভ? আমাদের যে তফাৎ সেটা যদি আজ মনে ক'রতুম তবে সমস্ত উপেক্ষা ক'রে তোমাকে এমনি ভাবে ডাকা সম্ভব ছিল না। কিন্তু কথাই বেড়ে যাচ্ছে—আমার কথার উত্তর দাও নি—

অমল কহিল—তোমাকে সর্ব্বান্তঃকরণে ক্ষমা ক'রেছি ব'ললে মিথ্যা কথা বলা হবে, তবে আজ এটুকু বুঝেছি যে আজকার একাকীত্ব তোমাকে পেলেও এতটুকু ক'মতো না, কাজেই অভিযোগ ক'রে লাভ নেই—দুঃখটা ঠিক সেজন্যে নয়। আমার আশা, আমার আকাঙ্ক্ষা সম্ভবের সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল, সেকথা মনে ক'রে আজ অনুশোচনা ক'রেও লাভ নেই। তবে আমার মনে এই প্রশ্ন এখনও রয়ে গেছে—তুমি নিজে আমাকে বিদায় না দিয়ে অন্যের মারফৎ আমাকে বিদায় দিলে কেন? তুমি যদি ব'লতে যে অসম্ভব—তবেই আমি বোধ হয় হাসিমুখে বিদায় নিতে পারতুম।

অপর্ণা কহিল—তুমি ত জানো না, তখন চারিপাশের অবস্থা কেমন

করে আমার কণ্ঠরোধ ক'রেছিল। সংসারের বাধা-নিষেধের প্রাচীর ভেঙে আসবার সাহস ছিল না, আপনার অন্তরকে চিনতাম না, ভাসমান তৃণের মত দশজনে আমাকে নিয়ে চললো স্রোতের সঙ্গে। কিন্তু মানুষকে ত্যাগ করে ব্যাংক-ব্যালান্স গ্রহণ ক'রে ত সুখী হইনি—এ পরিতাপ জীবনে অক্ষয় হ'য়ে আছে। আজ ফিরবার পথ নেই, অথচ গৃহকে সুন্দর ক'রে তুলবারও শক্তি নেই—

—ফিরে এসে যা চেয়েছ তা পাবে না, সমস্ত শক্তি দিয়ে গৃহকে সুন্দর ক'রে তোলো।

—তুমি যেমন ক'রে তুলেছ? কিন্তু তা কি সম্ভব? তুমি অভিনয় করনি, আমাকে ক'রতে হবে। যাকে শ্রদ্ধা করতে পারিনি—

—পারো নি—

অপর্ণার নিরুদ্ধ অশ্রু অকস্মাৎ উৎসারিত হইয়া চোখ দুইটি ভরিয়া দিল। কম্পিত সিক্তকণ্ঠে বলিল—না। সেই হ'য়েছে আমার জীবনের চরম অভিশাপ। আমাকে ক্ষমা ক'রো, এ ভুল—

অপর্ণা আর বলিতে পারিল না, থামিয়া গেল। অমল মাথা নত করিয়া কেবল ভাবিল আপনার কথা—এত অর্থ-বিত্ত আড়ম্বরের মাঝেও সে কি কেবল তাহারই জন্যে একাকী? অমল কি যেন একটি প্রশ্ন করিতে যাইতেছিল, করুণা চা লইয়া ফিরিল এবং উভয়ের মুখের দিকে চাহিয়া যেন বিস্মিত হইয়া গেল।

অমল অভিনয় করিল—যা হোক, চা তোমার হাতে আর একবারও খেতে হ'ল? সৌভাগ্য ব'ল্‌তে হবে—

করুণা ব্যঙ্গ করিল—আপনার বিনয় প্রশংসাযোগ্য।

—সেই বোধ হয়, সাত বৎসর আগে চা খেয়ে গেছি, পুনরায় ফিরে আস্‌বো এ ভাবতে পারিনি তাই—

করুণাও বিনয় প্রকাশ করিল—আপনার মত খ্যাতনামা লোকের পরিচয় গৌরবের বিষয়।

—অবশ্যই, তবে খ্যাতনামা কিনা সেটা সন্দেহের বিষয়।

করুণা তাহার দিদির দিকে চাহিয়া আশ্চর্য্য হইল—এমন বিমর্ষ মলিনমুখে বসিয়া থাকিতে সে কখনও তাকে দেখে নাই, তাই কহিল—তোমার কি হ'য়েছে দিদি, তোমার বন্ধু এলেন আর তুমিই কথা ব'লছো না—

অপর্ণা হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—ও কর্ত্তব্যটা তোমারই।

অবান্তর আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে চা পান শেষ হইল। করুণা কহিল—এখনই যাবে দিদি?

—হ্যাঁ, গাড়ী এসেছে?

—অনেকক্ষণ।

—ও তবে—তুমিও যাবে ত অমল? চল ঐ মোটরেই যাই।

—ক্ষতি নেই, যেতে পারি। তবে গেলে তাড়াতাড়ি যেতে হবে।

—অনেকক্ষণ এসেছ না?

অমল বিস্মিত হইল, অপর্ণার মুখে এই নারীসুলভ ঈর্ষার কথাটি যেন একেবারেই বেমানান! সে কহিল—না, বাজার ক'রে ফিরতে হবে, তাই।

মোটর চলিয়াছিল সোজা শ্যামবাজারের দিকে—

অপর্ণা সোফারকে কহিল—মাঠ দিয়ে ঘুরে যাও।

অমল বারণ করিল না। অপর্ণার দেহের একটি অংশ তাহার দেহ ছুঁইয়া আছে—এই স্পর্শ আজও যেন মোহময়। অপর্ণা অমলের হাতখানি অত্যন্ত সন্তর্পনে উঠাইয়া লইয়া কহিল—আমার কথার জবাব দিলে না?

অমল কহিল—সেই ক্ষমার কথা ত ?

—হ্যাঁ।

—আমি ক্ষমা ক'রেছি ব'ল্‌লেও তুমি কিছুমাত্র নিশ্চিন্ত হবে না। কল্পনা-বিলাসী মানব মনের এই ব্যভিচারের শেষ নেই—কিন্তু আমাদের মাঝে ব্যবধানের যে প্রাচীর রয়েছে তা কোনোদিন যাবে না। গৌরীর স্থানে আজ তুমি যদি অধিষ্ঠিতা থাক্‌তে, তাহ'লেও না।

হয়ত তাই, কিন্তু তোমাকে বিমুখ ক'রার অনুশোচনা তার মাঝে থাক্‌তো না। আজ সবচেয়ে বড় দুঃখ এই যে হয়ত তুমি ভেবেছ কেবলমাত্র অর্থের মোহে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছি—

—না, অপর্ণা। আমি তোমাকে রেখে গিয়েছিলাম তোমারই জন্যে। আমি জানতুম আমি আকর্ষণ ক'রলে তুমি আমার হাত থেকে মুক্ত হ'তে পারতে না, কিন্তু আমার ওই অস্বচ্ছল গৃহে তোমার স্থান সত্যিই নেই। সেখানে তোমাকে পেয়ে আমি সুখী হ'তে পারতুম না।

অপর্ণার রুক্ষ চুলগুলি বাতাসে উড়িয়া উড়িয়া কপালের উপর পড়িতেছিল, সে আনমনা হইয়া কি যেন ভাবিয়া যাইতেছিল। মৃদুকণ্ঠে কহিল—নইলে তোমার খোকা আমাকে এমনিভাবে আকর্ষণ ক'রতে পারতো না। আমার অজ্ঞাতে ভাগ্য আমাকে আবার তোমারই কাছে টেনে এনেছে, তাই তোমার কাছে আজ মিনতি ক'রে আমি সন্তাপ-অনুশোচনা মুক্ত হ'তে চাই।

অমল অপর্ণার হাতখানা চাপিয়া ধরিয়া কহিল—মুক্তি নেই অপর্ণা, মুক্তি নেই। যে দেহাতীত রাজ্যে আজ তুমি একাকী, সেখানে আমিও একাকী। সেখানে আমরা ব্যভিচারী, সে ব্যভিচারই আমাদের পরিতৃপ্তি, তাই গৌরীকে বুকের মাঝে নিয়ে ভাবি সে হয়ত তুমি। তোমাকে সমগ্র বিশ্বে খুঁজি, কাব্যে, সাহিত্যে খুঁজি, কিন্তু তুমি নেই কোথায়ও, ছিলে না কোনদিনও—

অপর্ণা কহিল—হ্যাঁ, তাই এই ব্যভিচার জীবনের সংগী, কিন্তু আমার ত কাব্য সাহিত্য নেই আমি কেবল অতীতের দীর্ঘশ্বাস-বেদনাতুর শূন্য-গৃহে নিজেকে নিজে অপরাধী ক'রে বারবার অনুশোচনা করি। কোথা এর শেষ?

—এর শেষ নেই অপর্ণা। বৃথা চেষ্টা—আপনার গৃহকে আপনার ক'রে নিও—সেখানে পরিপূর্ণ গৃহে একাকী জীবন কাটাতে হবে—এই বিচিত্রমানব মনের প্রাপ্য।

বৈকালে কি যেন একটা ভীষণ কার্য্যে খোকা ব্যস্ত ছিল এবং সে অমূল্য কাজের সমাধানকল্পে টবের উপরে উঠিয়া দাঁড়ান অপরিহার্য্য হইয়া উঠে। কিছুক্ষণ কার্য্য চলিবার পরে খোকা অকস্মাৎ পদস্খলিত হইয়া পড়িয়া যায়, সংগে সংগে হাতের কব্জি ফুলিয়া উঠে এবং খোকা সেই যে কান্না আরম্ভ করিয়াছে তাহা আর থামে নাই। গৌরী অত্যন্ত উদ্বিগ্নচিত্তে মাকে বার বার জিজ্ঞাসা করিতেছে—খোকা ত এমনি কাঁদে না কখনও, ভিতরে কি হাড় ভেংগে গেল? বাড়ীতে ত কেউ নেই কি ক'রবো—

মা ব্যস্ত হইয়া শুধু বলিলেন—কেমন ক'রে ব'লবো? অমল এতক্ষণ আসে না কেন?

গৌরী শুধু জানিত যে জলপটি দিতে হয়, সে তাহাই দিয়া একান্ত অসহায়ের মত বার বার জানালা দিয়া দেখিতেছিল—অমল আসে কিনা? এমনি দুঃসময়ে কি করিতে হয়—সে তাহা জানে না, কেবল উৎকণ্ঠায়, নিজের অসহায় অবস্থায় অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে পারে—

সন্ধ্যা হইয়া গেল, অমল তবুও আসে না। অমলের অবিবেচনায়, উৎকণ্ঠায়, ক্রোধে, অভিমানে গৌরী কাঁদিয়া ফেলিল—বিছানায় শুইয়া

খোকা যাতনায় কাঁদিতেছে, সে দৃশ্য এবং সদাপ্রফুল্ল খোকার এই বেদনাতুর মুখখানি একেবারে অসহনীয়। গৌরী বার বার রাস্তার পানে চাহিতেছিল—

একখানা মোটর আসিয়া থামিল। গৌরী স্পষ্ট চিনিল—অপর্ণা অমলকে নামাইয়া দিয়া আবার গাড়ী ছাড়িয়া দিল। যাইবার সময় সিডানবডি কারের জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া কি যেন বলিয়া গেল।

একটা দুর্জ্জয় অভিমানে গৌরীর অন্তর ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিল —এমনি বিপন্ন, এমনি উদ্বিগ্ন সময়ে অমল নির্ভাবনায় অপর্ণার মোটরে চড়িয়া হাওয়া খাইতে গিয়াছে।

অমল আপনার কক্ষে প্রবেশ করিয়া প্রশ্ন করিল—খোকা কাঁদছে কেন?

গৌরী দপ্ করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়া কহিল—তা দিয়ে তোমার দরকার? যেখানে গিয়েছিলে সেখানেই থাকতে হ'ত। আমি আর খোকা দুজনে যে অসহ্য হ'য়ে উঠেছি তা জানি, দয়া করে বাবার কাছে পাঠিয়ে দাও—

অমল কোন কথা বলিল না, কেবলমাত্র গৌরীর মুখের পানে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। মাতা সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করিয়া মন্তব্য করিলেন— আমাদের সুকুমারকে একটু ডেকে আন, যদি হাড়ের কোন কিছু হ'য়ে থাকে!

অমল নিজে একটু পরীক্ষা করিয়া, কিছু বরফ আনিয়া মাকে সেটা লাগাইতে বলিয়া বাহির হইয়া গেল।

সুকুমার ডাক্তার যথাসময়ে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া অভয় দিয়া গেলেন —কোন ভয় নাই। খোকাও ঘুমাইয়া পড়িল।

গৌরী কোন কথা বলিল না, নিঃশব্দে ভাত দিয়া রান্নাঘরে অপেক্ষা

করিতেছিল। অমল মায়ের মারফতে কিছু খাইবে না জানাইয়া শুইয়া পড়িল, কিন্তু ঘুমাইল না।

অমল যে অপর্ণার মোটর হইতে নামিয়াছে তাহা সে গোপন করিতে চাহে নাই, গৌরী সমস্তই জানে এবং সাত বৎসর সে তাহার সহিত ঘরকন্না করিয়াছে তবুও সে আজ অকস্মাৎ এমনি ভুল বুঝিল কেমন করিয়া! গৌরী রান্নাঘরের কাজ সারিয়া আসিল নিশীথরাত্রে এবং নিঃশব্দেই শুইয়া পড়িল। অমল বিনা ভূমিকায় প্রশ্ন করিল—তোমরা আজ অকস্মাৎ অসহ্য হ'য়ে উঠ্‌লে কেন?

—খোকার এমনি হ'ল, অথচ তুমি ত তোমার অপর্ণাকে নিয়ে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছ!

—তোমার কাছে ত কিছুই গোপন নেই, তবুও এ বাক্যবাণটা ছাড়লে কেন?

গৌরী জবাব দিল না, অপর্ণার প্রতি সঙ্গে সঙ্গে অমলের প্রতিও একটা বিজাতীয় অভিমানে চুপ করিয়া রহিল। অমলও আর কিছু বলিল না। ক্ষণিক অপেক্ষা করিয়া গৌরী কহিল—যদি দু'জনে এত ভালবাসা তবে কেন বিয়ে ক'রলে না ওকে? আমাকে দয়া ক'রে বিয়ে ক'রে এ প্রবঞ্চনা কেন করেছ?

—প্রবঞ্চনা?

—হ্যাঁ।

—আজ এতদিন পরে একথা মুখে আনতে তোমার বাধ্‌লো না? বিয়ের পরে এই সাত বৎসরের মাঝে তুমি কোনদিন এমনি ক'রে ভাবনি। আজ অপর্ণা এসেছে কেবল তাই, না? তোমার মনের এ ক্ষুদ্রত্ব কেমন ক'রে আত্মগোপন ক'রেছিল জানি না, তবে আজ তার প্রকাশে আনন্দিত হ'লাম।

—আনন্দিত ত হবেই, আমি ত তোমায় বাধা দেই নি।

অমল আবার চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল—আফিস থেকে আমাকে চিটাগং আফিসে পাঠাতে চেয়েছে। যাবার ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু যেতে হবে তোমার জন্যে।

—কেন? অপর্ণা সেখানে যাবে বুঝি?

অমল অত্যন্ত ক্লান্তভাবে ফিরিয়া শুইল। ক্ষণিক বাদে দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া গায়ের চাদরটা টানিয়া দিল। মনে মনে সে কেবল ভাবিল—এই ভালবাসা! যা একটিমাত্র দুর্ঘটনায় ভাঙিয়া চুরমার হইয়া যায়! এই গৌরী একদা বাৎসরাধিক কেবল তাহারই জন্য দিন গণিয়া কাটাইয়াছে। কুমারী জীবনের সে বিশ্বাস সে প্রণয় আজ অন্তর্হিত।

বাইশ

খোকার আহত হওয়ার সংবাদ যেমন করিয়াই হোক অপর্ণার কাছে পেঁৗছিয়াছিল—দ্বিপ্রহরে অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া একটি স্প্রিং-এর 'দোল-খাওয়া খোকা' লইয়া সে উপস্থিত হইল।

গৌরী-সেলাই রাখিয়া দরজা খুলিয়া দিল। অপর্ণা একটু ব্যস্ততার সঙ্গে প্রশ্ন করিল—খোকা কেমন?

- ভালই।

খোকা আজ অপেক্ষাকৃত শান্ত। ভাংগা বাম হাতটা ব্যতিরেকে অন্য সমস্ত অংগপ্রত্যংগের সাহায্যে যাহা করা সম্ভব তাহা করিতেছিল। দেয়ালের গায়ে কোন সিনেমা অভিনেত্রীর ছবিওয়ালা একখানা ক্যালেণ্ডার ঝুলিতেছিল; খোকা মাতার প্রস্থানের পরে তাহার প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হইয়া পিতৃদেবের কলমের সাহায্যে অভিনেত্রীর মুখে একটি গোঁফ আঁকিতেছিল এবং আপনার শিল্প চাতুর্য্য বিশেষ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে

পর্য্যবেক্ষণ করিতেছিল। অপর্ণা পিছন হইতে দেখিয়া হাসিয়া উঠিল। খোকা ঈষৎ বেয়াকুব হইয়া কহিল—গোঁফ দিলাম—

অপর্ণা কহিল—বেশ ক'রেছ, কিন্তু কেন দিলে?

—বাবার গোঁফ আছে যে!

—সেটা একটা অমোঘ কারণ বৈ কি? এই দ্যাখো তোমার জন্যে কেমন খোকা এনেছি।

স্প্রিংএর খোকা দোল খাইতেছিল—খোকা এই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা দেখিয়া আনমনে কহিল—বাঃ বেশ ত!

—কাল তোমার হাতে খুব লেগেছিল?

—হুঁ।

—কেন ওখানে গেলে?

খোকা এ সকল অবান্তর প্রশ্নের জবাব দেওয়া অনাবশ্যক মনে করিয়া সংক্ষেপে কহিল—কাজ ছিল।

—আর যেও না, কেমন?

—হুঁ।

গৌরী এতক্ষণ কোনও কথা কহে নাই। এতক্ষণে কহিল—আপনি শুনলেন কি ক'রে?—তা এত দামী খেলনাই বা আনলেন কেন? এ ত এক্ষুণি ভেঙে ফেলবে—

—খেলনা চিরদিনই ত ভাঙবার জন্যে। আপনার খোকা আমাকে যেন বাঁধবার চেষ্টায় আছে।

গৌরী অর্থব্যঞ্জক ভাষায় কহিল—আমার খোকা বলে ত নয়, ওর বলে—

অপর্ণা আশ্চর্য্য হইল, তাহার এই আসা-যাওয়া হয়ত গৌরীর অভিপ্রেত নয়। সে কহিল—খোকা যে অমলের ছেলে তা জানাবার আগেই ত ও টেনে এনেছে।

—খোকার ভাগ্য। নইলে আপনি আমাদের মত লোকের বাড়ীতে আসবেন কেন?

—ও কথা রোজ রোজ বলে লাভ নেই ভাই।

গৌরী একটু অপ্রস্তুত হইয়াছিল। প্রসঙ্গান্তরে সে কহিল—কোথায় গিয়েছিলেন কাল?

—বালিগঞ্জে বাপের বাড়ী।

—তারপরে? একসঙ্গে এলেন কি ক'রে?

—ওঃ, আমি এলাম তাই আমার গাড়ীতেই নিয়ে এলাম।

—মাঠে যান নি হাওয়া খেতে?

—হ্যাঁ, গড়ের মাঠ ঘুরে এলাম।

—গৌরী মুখ টিপিয়া কহিল—ও তাই!

—তাই কি?

—আস্‌তে দেরী হ'ল। খোকাকে নিয়ে ভেবে মরি!

খোকা সাক্ষ্য দিল—মাও কাঁদলে, আমিও কাঁদলুম।

অপর্ণা হাসিয়া উঠিল—খোকার বলিবার ভঙ্গি দেখিয়া। কহিল—তুমি ভারি দুষ্টু।

খোকা মাকে দেখাইয়া কহিল—মা দুষ্টু।

—কে বলেছে?

—বাবা।

অপর্ণা কহিল—দুষ্টুই, যে অমল সকলকে কথায় জব্দ করে উনি তাকে জব্দ ক'রেছেন এমনি তার ক্ষমতা।

গৌরী প্রতিবাদ করিল—না না, আপনার কাছেই ও জব্দ।

অপর্ণা কিছুক্ষণ আলাপ আলোচনার পর খোকাকে নূতন খেলনার প্রতিশ্রুতি দিয়া বিদায় লইল, কিন্তু আজ সে সংশয় লইয়া ফিরিল। গৌরী হয়ত তাহার এই যাওয়া-আসা ও অমলের সহিত বন্ধুত্বের পরিচয়কে সহজ

ভাবে গ্রহণ করিতে পারে নাই। সে মনে মনে হাসিল—অমলের কতটুকু সে পাইয়াছে—তবুও তাহাই হারাইবার ভয়ে সে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি নিয়ে যক্ষের মত আগলাইয়া আছে! সে চাহিয়াছে সামান্য, তাই তাহার গৃহ আজ পরিপূর্ণ—কেবল আপন অতৃপ্তিকে অভিনয় দিয়া অমল ঢাকিয়া রাখিয়াছে।

খোকা দুর্নিবার আকর্ষণে অপর্ণাকে টানিলেও তাহার গমনাগমন কিছু সংযত হইয়া উঠিল। খোকাকে নিজের গাড়ীতে লইয়া মাঝে মাঝে বেড়াইতে যাইত, কখনও একান্ত একাকী—এমন কি একটিমাত্র চাকর না লইয়াও নিজে গাড়ী চালাইয়া ফিরিত।

কয়েকদিন হইল অজিত কার্য্যোপলক্ষে অন্যত্র চলিয়া গিয়াছিল—অপর্ণা অত্যন্ত উদাসীনভাবে বিকালে মোটর চালাইতে গিয়া কি একটা অস্বস্তি তাহাকে যেন অস্থির করিয়া তুলিয়াছিল—অমলের সহিত সামান্য আলোচনার পরে অপ্রকাশ্য কি যেন একটা বেদনা তাহার মাঝে বেগবান হইয়া উঠিয়াছে। বিদায় দিনের সেই বিষাদার্ত্ত মুখখানি তাহার স্মৃতির ভাণ্ডার হইতে কেমন করিয়া বিদায় দিবে—অমলের জীবনের এই দারিদ্র্য সে কেমন করিয়া দূর করিবে। আপনাকে লাঞ্ছনা করিবার প্রবৃত্তি তাহার মধ্যে অত্যন্ত আকস্মিকভাবে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। প্রাচুর্য্যের প্রলেপে যাহা চাপা পড়িয়াছিল আজ অমলের প্রত্যক্ষ জীবন তাহাকে উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছে—বিগতদিনে ফিরিয়া যাইবার দুর্দ্দমনীয় লোভ তাহাকে দুর্ব্বার আকর্ষণে টানিতেছে—

আনমনে গাড়ী চালাইতেছিল, শিয়ালদহের মোড়ে কে যেন একটা লোক চাপা পড়িতে পড়িতে বাঁচিয়া গেল, ব্রেক দুটি নেহাত খুব ভাল তাই। অপর্ণা চাহিয়া দেখে অমল। অমল তাহার দিকে চাহিয়া হাসিতেছে। অপর্ণা ডাকিল—অমল এসো—

—কোথায় ?

—বেড়িয়ে আসি, চল।

—নিরপরাধ পথিককুলকে চাপা দেওয়ার একটা প্রবল ইচ্ছে যেন তোমার মাঝে রয়ে গেছে—

—কিন্তু তোমার মত কবি সাহিত্যিকের পক্ষে এ রকম হেঁটে চলাটা ত খুব মঙ্গলকর নয়। যাক্—চল। অমল উঠিয়া অপর্ণার পাশে বসিল। অপর্ণা কহিল—কোনদিকে যাবো ?

—যেখানে খুসী—ইচ্ছে হয় জাহান্নামে—

—আজ যাওয়া চলে—না ? অপর্ণা মাঠের দিকে দ্রুত গাড়ী বাঁকাইয়া চলিল।

মোটর বেগে চলিতেছে। অপর্ণা হঠাৎ কহিল—এটা ঠুকে দিলে কেমন হয়, দুজনে শেষ একসঙ্গে।

—হয়, তবে বড়ই ইন্‌আর্টিষ্টিক ডেথ হবে। আর একটু ভদ্রভাবে মরার ইচ্ছে হয়—

—বালাই বালাই ষাট্, তোমার মরার ইচ্ছে হবে কেন ? স্ত্রী পুত্র নিয়ে সংসার ধর্ম্ম কর—

—ত্রুটি রাখিনি।

মাঠের মাঝে একটা নির্জ্জন রাস্তায় গাড়ী থামাইয়া অপর্ণা অমলের মুখের পানে চাহিয়া কহিল—তোমাকে কেন এনেছি জানো ?

অমল একটু চিন্তা করিয়া কহিল—জ্যোতিষ শাস্ত্র কিছু কিছু পড়েছি তবে এতদূর আয়ত্ত করতে পারি নি।

—সেদিন তোমার সঙ্গে ও-কটা কথা আলোচনা ক'রে কথারও শেষ হয়নি, বরং কথা যেন বেড়ে গেছে—

—জানি, সে সমস্যা আরও বেড়ে যাবে। সাত বৎসর দেখা না

হওয়ায় হয়ত সেই সমস্যা কিছু কমেছিল আজ তা আবার বেড়ে গেছে। আজ আশায়, সংশয়ে উত্তেজনায় তা যেন আবার জীবনে গুরুত্ব নিয়েছে।

অপর্ণা কহিল—হ্যাঁ, ঠিক তাই। তোমার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে যেন একটা ছন্নছাড়া ভাব আমাকে আমার বিরুদ্ধে চালিত ক'রছে। এত অর্থ, এত মোটর, ওই বাড়ী সব যেন আজ জীবনে একেবারেই অবান্তর বলে মনে হয়। এর সবকিছুই বাদ দিয়েও ত জীবন আজ চল্‌তে পারতো—

অমল একটু হাসিয়া কহিল—যেমন আমার চল্‌ছে, কোন জায়গায় কোন গোল নেই, বাইরে থেকে তোমার মত দর্শকরা দেখে হিংসা করে, যেমন আমি তোমার মটর ও বাড়ী দেখে ঈর্ষা করি।

অপর্ণা কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, যেন অকস্মাৎ তাহার বক্তব্য অত্যন্ত অস্থানে নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে। অতি ধীরে সন্তর্পণে অমলের হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে লইয়া সে কহিল—আমার বিরুদ্ধে কি তোমার কোন অভিযোগ নেই? তোমার একক জীবনের জন্যে কি আমাকে কোন সময় দোষারোপ করনি!

অমল হাসিয়া কহিল—না।

—অত সহজেই না ব'ললে তাই বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না।

—অনেকদিন অনেক ভেবেছি তাই উত্তরটার জন্য প্রস্তুত ছিলাম। যদি অভিযোগ থেকে থাকে তবে তার খানিক আছে নিজের বিরুদ্ধে, খানিক আছে ভাগ্যের বিরুদ্ধে। আজ মনে মনে বিশ্বাস করি ভাগ্য বলবান।

—তোমার নিজের বিরুদ্ধে কি অভিযোগ আছে?

—আমি ভুল ক'রেছিলাম, নিজের আশা, কল্পনা আকাঙ্ক্ষার কোন সংযম ছিল না, নইলে তোমাকে আমার জীবনে আশা করেছিলাম। অন্ততঃ আজ সেটা হাস্যকর বলেই মনে হয়।

অপর্ণা ঈষৎ হাসিয়া কহিল—তাই নাকি ?

—হ্যাঁ, অত্যন্ত সত্য কথা বলে মনে করি।

চৌরঙ্গীর বাড়ীগুলিতে দুই একটি করিয়া আলো জ্বলিয়া উঠিয়াছে। মাঠের বুকে অন্ধকার ধীরে নিঃশব্দে কালো কুয়াশার মত জমিয়া উঠিতেছে। দুই একখানি আরোহীপূর্ণ মোটর রক্তচক্ষুতে তাকাইয়া দ্রুত চলিয়া যাইতেছে। জগতের পথ পার্শ্বে অত্যন্ত একাকী এই দুইটি প্রাণী যেন তপ্তশ্বাসে সবুজ মাঠের বুক তিক্ত করিয়া তুলিয়াছে। পৃথিবীর এই উৎসব, এই কোলাহল যেন আজ অত্যন্ত অপ্রয়োজনীয়—আলোক যেন অসহ্য।

অপর্ণা ক্লান্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করিল—আমার কাছে চাইবার কি তোমার কিছুই নেই ?

অমল হাসিয়া উঠিল। অপর্ণা তাহার কাঁধের উপর বাম হাতখানি তুলিয়া দিয়া পুনরায় তাহার প্রশ্ন জানাইল। অমল মৃদু শান্ত কণ্ঠে কহিল —আমি যদিই চাই কিছু, তবে তা দেওয়ার কি ক্ষমতা তোমার আছে আজ ? বৃথা প্রবোধ দিয়ে লাভ কি বল—যা আজ গত তা গতই, তাকে ফিরিয়ে আনা যায় না অপর্ণা। তোমার এ অনুশোচনা নিষ্ফল।

অপর্ণা ক্লান্তভাবে তাহার মাথাটি অমলের শীর্ণ স্কন্ধে ন্যস্ত করিয়া কম্পিত অস্পষ্ট কণ্ঠে কহিল—অমল, তুমি জানো না, আজ তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। আমি সর্ব্বস্ব পণ করেছি—এ অভিনয় আমার আজ অসহ্য হ'য়ে উঠেছে—

অমল কি যেন ভাবিল, তার পরে কঠোর কণ্ঠে কহিল—তুমি যেতে পারো আমার সঙ্গে যেখানে আমি নিয়ে যাবো তোমাকে ? দূরে—সমস্ত আভিজাত্য সংস্কার নীতিকে পেছনে ফেলে ?

অপর্ণা মাথাটা তুলিয়া দৃঢ়স্বরে কহিল—পারি অমল, পারি। সে দিন হয়ত পারিনি—কিন্তু সে সাহস আজ আমার আছে।

—আছে ?

—হ্যাঁ।

—ভেবে দেখেছ ?

—কি ভাববো বল ? সংবাদপত্রে হয়ত বেরুবে, "অমুক ব্যারিস্টার-পত্নীর অমুক সাহিত্যিকের সহিত গৃহত্যাগ ?" দুদিন লোকে আমাকে হয়ত তিরস্কার ক'রবে, তার পর ভুলে যাবে—ও হয়ত দুঃখিত হবে তার পর আবার গৃহ রচনা ক'রবে—

অমল অপর্ণার কাঁধের উপর হাত তুলিয়া দিয়া মৃদু আকর্ষণে তাহাকে নিকটে আনিয়া কহিল—কিন্তু আমি আজ যা চাই—তুমি যার জন্যে আজ সমস্ত ত্যাগ ক'রতে প্রস্তুত তা আজ দেওয়া তোমার এবং আমার উভয়ের পক্ষেই একেবারে সাধ্যাতীত। যা পাওয়া যায় না কোনদিন, তার জন্যে কেন এ অনুশোচনা—

—কেন পাওয়া যায় না ?

অমল কহিল—ভেবে দেখেছি, তোমার এ দেহকে আজ ইচ্ছা ক'রলে আমি করায়ত্ব ক'রতে পারি। কিন্তু আমি ত তোমাকে চাইনি অপর্ণা—আজকার তোমাকে। আমি যাকে চেয়েছিলাম সে অপর্ণা আজ তোমায় মাঝে মৃত, তুমি যাকে চেয়েছ সেও আজ আমার মাঝে নেই—দীর্ঘ সাত বৎসরকে পিছনে ফেলে যদি আবার আমরা সেই উন্মুখ যৌবনে ফিরে যেতে পারতুম তবে হয়ত সম্ভব হত, কিন্তু আজ ? দেহাতীত কল্পনাচারী সেই উচ্ছল উজ্জ্বল অপর্ণাকে আমি চাই কিন্তু সে আজ পাব কোথা ? তোমার দেহ ত আজ সে কল্পনাকে শান্ত ক'রতে পারবে না—জানি না তখনও তোমাকে পেয়ে এ বিলাসবৃত্তি তৃপ্ত হ'ত কিনা ! তুমি আমার অপর্ণার অকিঞ্চিৎকর ভগ্নাংশ মাত্র—

অপর্ণা সংক্ষেপে কেবল বলিল—হয়ত তাই।

—আমরা যদি একত্র হ'তাম তবু মনে হয় দেহকে দিয়ে সে

দেহাতীতকে পেতাম না—দুঃখ ক'রো না অপর্ণা। ফিরে যাও—মানুষের যতদিন কল্পনা আছে ততদিন সে একক। তোমার মত আমার মত তারা অশ্রুর প্রলেপে মানুষকে একাকী রেখে দেয়—গৃহ তাই কেবল গৃহই তার বেশী কিছু নয়। সেখানে পরিতৃপ্তি নেই—

অপর্ণা কহিল—হ্যাঁ তাই।

—তোমাকে তোমার জন্যেই আজ আরো একবার ত্যাগ ক'রে যাবো। চিটাগাং ট্রান্সফার তাই আমি মেনে নিয়েছি। অপর্ণা কথা কহিল না। সেদিনের মত আজও অত্যন্ত নীরবে নিঃশব্দে অন্ধকারের মাঝে দুই বিন্দু অশ্রু ঝরিয়া পড়িল। অমল জানিল না—অপর্ণা আজ কেন এমন করিয়া কাঁদিয়া উঠিল।

দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া সে মোটরে ষ্টার্ট দিয়া কহিল—তবে তাই হোক্—অমল।

তৃতীয় অঙ্ক

তেইশ

প্রায় বাইশ বৎসর পরের কথা—

অমল আজ পক্ক কেশ বৃদ্ধ। বৃদ্ধমাতা বহুকাল পূর্ব্বে গত হইয়াছেন, গৌরীও আজ কয়েক বৎসর হইল অমলকে একাকী ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে। খোকা আজ শিক্ষিত আধুনিক যুবক—এম্-এ-তে ফার্ষ্ট ক্লাস পাইয়া বি-সি-এসএ ফার্ষ্ট হইয়া ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট হইয়াছে কিন্তু বিবাহ হয় নাই। আজীবন কুমার থাকিয়া লেখাপড়া করিবার একটি বাতিক তাহাকে পাইয়া বসিয়াছে—অন্ততঃ অমলের মত এইরূপ। অমল আজকাল শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের একজন, শীঘ্রই একটি জয়ন্তী উৎসব তাহার হইবে, সে জন্যে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে তোড়জোড় চলিতেছে।

দীর্ঘদিন বিদেশে থাকিয়া সম্প্রতি কলিকাতায় আসিয়াছে—পুত্রের চাকুরীস্থলে যাইবার ইচ্ছা বিশেষ নাই। মনোমত একটি পুত্রবধূ খুঁজিবার জন্যে সে ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে। খোকা বার বার অমলকে তাহার চাকুরীস্থলে লইয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া পত্র দিয়াছিল কিন্তু এখন অভিমান করিয়া আর লেখে না। অমল একাকী মাঝারী রকমের একটি হোটেলে থাকে আর কলিকাতা আসিবার পর হইতে প্রায়ই ট্রামে ঘুরিয়া বেড়ায়। বয়েস গুণে একটি দুরারোগ্য ব্যাধিকেও

সংগ্রহ করিয়াছে—সেটি বাত। মাঝে মাঝে ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া সে একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে।

দৈনন্দিন জীবন তাহার অতি সাধারণ। সকালে ও সন্ধ্যায় কতকগুলি তরুণ সাহিত্যিক ও সাংবাদিক আসিয়া ভীড় করে, গভীর রাত্রের সংগী কয়েকখানা দার্শনিক তত্ত্বের পুস্তক এবং বিনিদ্র দ্বিপ্রহরে আছে ভ্রমণ। সারাজীবনের সঞ্চয় দিয়া সে দেশে একটি বাড়ী করিয়াছে এবং দেওঘরে আর একটি। রোহিণী রাস্তার ধারে নির্জ্জন পথ-পার্শ্বে ছোট্ট একটি বাড়ী—তাহা সমাপ্ত হইয়াছে কিন্তু গৃহ প্রবেশ হয় নাই। অমলের ইচ্ছা নব পুত্রবধূ লইয়া একবার দেশে যাইবে তাহার পর বাকী দিন দেওঘরেই কাটাইয়া দিবে।

খোকাকে সে বার বার পত্র দিয়া বিবাহে মত করাইতে চাহিয়াছে, কিন্তু খোকা সংক্ষেপে জানাইয়াছে বিবাহ আপাততঃ সে করিবে না। কাজেই স্বচ্ছন্দ মনে সে কাগজে বিজ্ঞাপনও দিতে পারে নাই—খোকা এমন অবাধ্য নয় যে জোর করিলে পিতার কথা সে অবহেলা করিবে; কিন্তু বিবাহের ব্যাপারে সে কোনরূপ হস্তক্ষেপ করিতে চাহে না। বর্ত্তমানে অন্ততঃ তাহার মত এইরূপই।

সেদিন শীতের দ্বিপ্রহরে মোটা বেতের লাঠিটা হাতে করিয়া অমল ট্রামের মাসিক টিকিটটি লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। ট্রাম চলিয়াছিল কলেজ ষ্ট্রীট দিয়া—কলেজ স্কোয়ারে গিয়া সে নামিয়া পড়িল। অতি পুরাতন স্থান অতি পরিচিত এই ইউনিভার্সিটিতে সে পড়িয়াছে কত যুগ আগে, এইখানে অপর্ণার সহিত কতদিন সে—

অমল ধীরে ধীরে ইউনিভার্সিটি প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিল—সবই ঠিক তেমনটি রহিয়াছে। তেমনি যুবক ছাত্রগণ যাইতেছে আসিতেছে—ছাত্রীরা তেমনি গর্ব্বিত পদক্ষেপে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। লিফ্‌টটা ঠিক তেমনি করিয়া ওঠা-নামা করিতেছে। জীবনের দীর্ঘ তিরিশটি

বৎসর যেন অতি সংক্ষেপে, অতি অল্পপরিসর, দুইটি সরল রেখার মত ব্যবধান সামান্য, কিন্তু সমান্তরাল রেখা দুইটি কখনও মিশিবে না। অমল আপন মনে হাসিল—কেবল তাহার চুলগুলি আজ শুভ্রতা লাভ করিয়াছে। আজ বিগত সেই যৌবন যেন নূতন করিয়া আবার আসিয়াছে—আপন মনে সে কহিল—চমৎকার! এই জীবনে আর সে আসিবে না, আর সে এমনি করিয়া উচ্ছলতা লাভ করিবে না, অশক্ত পা দুটি ধীরে ধীরে অকর্মণ্য হইয়া নীরব হইবে।

অমল দ্বিতলে উঠিল—এখানে প্রতি ঘরে, প্রতি ধূলিকণায় অতীতের স্মৃতি যেন শিশিরের মত টলমল করিতেছে, যৌবনকে মুহূর্ত্তে সে যেন ফিরিয়া পাইয়াছে। এই সিঁড়ির মাঝে অপর্ণার সহিত তাহার প্রথম পরিচয়—কত লোকের কত জীবনের কাহিনী এই ইটকাঠময় নীরব বাড়ীটির অংগে সঞ্চিত হইয়া আছে—লাইব্রেরীতে সঞ্চিত নীরব কাব্য পুস্তকের মত, কত বেদনাই হৃদয়ের কারুণ্যে প্রস্তরীভূত হইয়া রহিয়াছে। যে জানে, যে পড়িতে পারে হৃদয় তাহার মথিত সমুদ্রের আকুলতায় উদ্বেলিত হইয়া উঠে—

একটি কোণে একটি ছাত্র একটি ছাত্রীর সহিত আলাপ করিতেছে—যৌবনের সেই উন্মত্ত দিনের অর্থহীন বাক্যাবলী। এমনি করিয়া অপর্ণার সহিত সে লোকচক্ষুর অন্তরালে কত কি কহিত। অমল হাসিল এবং সংগে সংগে একটা দীর্ঘশ্বাস বাহির হইয়া আর্ত্তকণ্ঠে যেন কহিল—নাই নাই, সে আর নাই—আর আসিবে না।

অমল লাঠি ভর দিয়া আর একতলার উপরে উঠিল—সেই কক্ষ—যেখানে বসিয়া সে পড়িয়াছে, নীলাম্বরী পরিয়া অপর্ণা প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত ঘুরিয়া বেড়াইত। আজকার এই ছাত্রীগণের মাঝে সেই অপর্ণাই যেন ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—বিদ্যুল্লতার মত, নানাভাবে নানা আকারের। দুষ্প্রাপ্য দুর্লভ অপর্ণা যেন শতধা বিচ্ছিন্ন হইয়া আপনাকে যৌবন উচ্ছ্বসিত

বিশ্বের মাঝে ছড়াইয়া দিয়াছে। তাহার সেই মন আজও তাহাকে খ‍ুঁজিয়া বেড়ায়—যেমন করিয়া আজ এঁরা খ‍ুঁজিয়া ফিরিতেছে ; কিন্তু তাহারা পাইবে না, তাহারই মত ব্যর্থ হইয়া আর্ত্তকণ্ঠে কহিবে—নির্জ্জন এই ধরিত্রী, এখানে কেবল প্রস্তর, প্রাণ নাই। পাইবে না, তাহাকে পাইবে না—

কে একজন তাহাকে নমস্কার করিয়া কহিল—আপনি এখানে ?

—হ্যাঁ, দেখছি এখন কেমন চ'ল্ছে। একদিন আমিও পড়েছি ত !

—আসুন, কোথায় যাবেন ?

—অনির্দ্দিষ্ট।

ঘুরিতে ঘুরিতে লাইব্রেরী কক্ষের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সে দেখিল—ঠিক তেমনি পাঠ-নিরত পাঠক-কুল। দেখিতে দেখিতে পাঠকক্ষে একটা সোরগোল পড়িয়া গেল, লাইব্রেরীয়ান নিজে অমলকে অভ্যর্থনা করিলেন। অমল প্রতিনমস্কারে কহিল—তিরিশ বৎসর আগে আমি ছাত্র ছিলাম এখানে, সেদিন আর আজএর মাঝে যেন কোন তফাৎ নেই—তেমনি সব ছাত্র। বিশ্বাস ক'রতে ইচ্ছে হয় না—আমি বুড়ো হ'য়েছি—

ছাত্রছাত্রীগণের চকিত চাহনির মাঝে অমল অগ্রসর হইল। তেমনি সমস্ত ছাত্রী পড়িতেছে—সে যেখানে বসিত সেখানে তাহারই মত একটি অমনোযোগী ছাত্র চোখের কোণে যেন কোন সমপাঠিনীকে লক্ষ্য করিতেছে। অপর্ণা যেখানে বসিত, সেখানে তেমনি একটি মনোযোগী ছাত্রী—তাহারই মত তন্বীতনু, কপালের উপরে চূর্ণ কুন্তল পাখার বাতাসে আন্দোলিত হইতেছে। অপর্ণার মতই প্রশান্ত শান্ত দুইটি চোখ তাহার পানে পরম বিস্ময়ে চাহিয়া আছে।

অমলের হৃদয় যেন সহসা আলোড়িত হইয়া উঠিল। মনে হয় হারানো অপর্ণা যেন অকস্মাৎ তাহার সামনে আসিয়া সমস্ত অন্তর মথিত করিয়া

দিতেছে। জরাক্লিষ্ট দেহে যেন যৌবনরস সঞ্চারিত হইয়া সহসা তাহাকে অতীতে ফিরাইয়া লইয়া গিয়াছে—অপর্ণা যেন তেমনি দুর্ব্বার আকর্ষণে তাহাকে টানিতেছে।

অমল ছাত্রীটির নিকটবর্ত্তী হইয়া মুখের পানে ক্ষণিক চাহিয়া থাকিয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল কিন্তু বলিতে হইল না। মেয়েটি তাহাকে প্রণাম করিয়া তাহার সামনে একটা অটোগ্রাফের খাতা খুলিয়া ধরিল—সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকখানি জড়ো হইয়া গেল।

অমল প্রশ্ন করিল—তোমার নাম ?

মেয়েটি মাথা নীচু করিয়া কহিল—নন্দিতা চট্টোপাধ্যায়।

—কিসে পড়ছো ? ইংরিজিতে ?

—হ্যাঁ।

অমল হাসিয়া লাইব্রেরীয়ানকে কহিল—দেখেছেন, রেসপেক্টেবেল লেডিজ, অভ্যাসদোষে তাদের তুমি ব'লে ফেলেছি। বুড়ো হ'লে কাণ্ডজ্ঞান যেন ক'মে আসে। তুমি নিশ্চয়ই মনে করেছ—

নন্দিতা বাধা দিয়া কহিল—না না, আপনি ব'ললে তাতেই দুঃখিত হ'তাম। আমার পরম সৌভাগ্য—কত গর্ব্ব।

—বেশ, আমি একটা গর্ব্বের বস্তু হ'য়েছি তাহ'লে! যাক কর্ম্মজীবনের অবসানে একটা সান্ত্বনা। তোমার বাবার নাম ? কি করেন ?

—রবীন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এ্যাটর্ণী।

—ও—দেশপ্রিয় পার্ক রোডে বাড়ী ? সে ত আমার ক্লাসফ্রেণ্ড। কি চমৎকার কোয়েনসিডেন্স ! তোমরা ক' ভাই ক' বোন ?

—তিন ভাই, চার বোন।

—তুমি ?

—সেজো।

—ও, তোমার বাবাকে ব'লো আমার কথা। তোমাদের ওখানে যাবো একদিন, এই ধর পরশু—

নন্দিতা স্মিতহাস্যে কহিল—সত্যি যাবেন?

—নিশ্চিত যাবো, রবির সঙ্গে আজ প্রায় দশ বছর দেখা হয় না। ক্লাস-পালানো শিক্ষার গুরু সে আমার, তার দেখা-পাওয়া একটা ভাগ্য।

সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। অমল কহিল—মিথ্যা নয়, এ ত সেদিনের কথা। রবির কি চুল পেকেছে আমার মত? বাত কি অমনি একটা কিছু হ'য়েছে—

নন্দিতা কহিল—আপনার মত অত চুল পাকে নি। আপনি যাবেন? ব'লবো বাবাকে যে পরশু যাবেন—

—হ্যাঁ ব'লো, আমার ত কর্ম্ম কিছু নেই। একটা আশ্চর্য্য কথা ভাবছি, অজ্ঞাত একটা আকর্ষণ তোমার কাছে কেন আন্‌লো আমাকে? নিশ্চয়ই একটা যোগসূত্র আছে। তোমরা মান্‌তে পারবে না কিন্তু আমরা মানি—রবির মেয়ে বলেই হয়ত সম্ভব হ'য়েছে—শুধু তাই নয়, মনে হচ্ছে তুমি বি-এতে ফার্ষ্ট'ক্লাস অনার্স পেয়েছিলে।

নন্দিতা একটু হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ পেয়েছিলুম।

—দ্যাখো, আমাদের মনের মাঝে ওগুলো আপনা আপনি ভেসে ওঠে —যে অজ্ঞাত আকর্ষণ আমাকে তোমার কাছে টেনে নিয়েছে, সেটা তোমরা বিশ্বাস করো না কিন্তু একদিন ক'রবে—

অটোগ্রাফের খাতাগুলি সই করিতে করিতে অমল আনমনে লাইব্রেরীয়ানকে কহিল—অপরিচিত থাকার একটা মোহ আছে। আপনারা যতক্ষণ চিন্‌তে পারেন নি, ততক্ষণ একটা অজ্ঞাতপূর্ব্ব আনন্দ ভোগ ক'রছিলাম; এখন এই কৌতূহলী বৃষ্টির মাঝে যেন সংযত হ'য়ে পড়েছি।

লাইব্রেরীয়ান কহিলেন—যদি অনুগ্রহ করে এসেছেন তবে চলুন আমাদের ঘরে একটু—চলুন—

চব্বিশ

অমল বাসায় ফিরিয়া একটু অনুশোচনা করিল—পরশু না বলিয়া কাল বলিলেও কোন ক্ষতি ছিল না। নন্দিতাকে আর একবার দেখিবার জন্য যেন হঠাৎ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। যে অপর্ণাকে সে পায় নাই সেই যেন পুনরায় তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছে—নন্দিতার যেন কোন অস্তিত্ব নাই।

একটা দিন অত্যন্ত অস্বস্তির মাঝে কাটাইয়া যথাবিহিত 'পরশু' দিনে সে এ্যাটর্ণী রবিবাবুর বাড়ীতে উপস্থিত হইল। রবিবাবু তাহার বৈঠকখানায় বসিয়াছিলেন—অমলের জুতা ও লাঠির সমবেত শব্দ শুনিয়া মুখ তুলিয়া কহিলেন—এস, এস ভাই অমল। কন্যার মারফতে তোমার আগমন বার্ত্তা শুনেছি।

অমল একখানা সোফায় জড়সড় হইয়া বসিয়া, রেপারটাকে ঝুলাইয়া দিয়া কম্ফোটারটাকে ভাল করিয়া বাঁধিয়া কহিল—হ্যাঁ, তোমার মেয়ের সঙ্গে অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে পরিচয়! তা কেমন আছ, বল দেখি ভাই, আর একটু গরম চা'র বন্দোবস্ত কর।

—রবীন্দ্রবাবু ব্রীফ্‌ফাইলকে দেরাজে পুরিয়া কহিলেন—আরে তুমি যে একেবারে জবুথবু বুড়ো হ'য়েছ দেখছি—চুল পাকতে বাকী নেই—

—হ্যাঁ, নইলে ত বিয়ের বয়স ছিল, গিন্নী অকালে চলে গেলেন একা ফেলে, এটা কি ভদ্রতা হ'ল!

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—সখ যায় নি দেখছি। তুমি কি সব বই-টই লিখ্‌ছ শুন্‌ছি—ছেলেমেয়েরা ত মাঝে মাঝে ওই নিয়ে ভয়ঙ্কর তর্ক করে,

তা এমন কিছু লিখতে পারো না যে, যা নিয়ে তর্ক চলে না—ওরা কি শেষে খুনোখুনি ক'রে ম'রবে—

—বড়ই অন্যায় ক'রে ফেলেছি ভাই—বাড়াবাড়ী যেয়ে ব্যাখ্যা করার মত শক্তি নেই, নইলে—যাক্ এখন খবর সব বল দেখি। পারিবারিক, আর্থিক, মানসিক।

রবীন্দ্রবাবু একটা সিগারেট দিয়া কহিলেন—আর বল কেন ভাই বিড়ম্বনা—মেয়ের বিয়ে নিয়েই পড়েছি ফ্যাঁসাদে। বলে, বিয়ে ক'রবে না। আর কত পড়বি বাবা, এম্-এ ত হ'ল প্রায়—

অমল সমর্থন করিল—ওই ত রোগ আজকাল। ছেলেটারও অমনি মতিচ্ছন্ন হ'য়েছে। বলে, বিয়ে ক'রবে না। ওই এক ফ্যাসান উঠেছে। আমাদের সময় ত বিয়ে করতে তর সয়নি।

—কি যে ওদের পছন্দ।

—পছন্দের কথাটা একটা সমস্যা। মেয়েরা বড় হয়েছে, একটা প্রিন্সিপল্ গড়ে উঠেছে, এখন তোমার পছন্দে ত চলবে না। তাদের পছন্দটা বিচার ক'রতে হবে—যাকে বিয়ে করবে তার পরিচয় চাই, মনের খবর চাই—

—তোমার ছেলে ত ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হ'য়েছে শুনেছি। কোথায় এখন?

—মুন্সীগঞ্জে আছে এখন—তারও ওই বাতিক—

—বটে! এরা সব ক্ষেপে গেল নাকি?

—তাই বই কি? তবে তোমার এখানে আসার একটা পরোক্ষ কারণও র'য়ে গেছে। তোমার নন্দিতাকে আমার দরকার হ'য়ে পড়েছে—জবুথবু বুড়ো মাংসপিণ্ডটাকে ওর হাতে দেওয়ার আশায় ছুটেছি—

—বটে বটে! চমৎকার হয় কিন্তু—

—কিন্তুর কি আছে ভাই? বিয়ের মত নেই? ওটা হ'য়ে

যাবে ভরসা করি—আদত কথা কি জানো, ওরা বিয়ে ক'রতে ভয় পায়।

রবীন্দ্রবাবু উৎসাহিত হইয়া কহিলেন—বটে! বটে! দ্যাখো ভাই তোমরা কবি লোক, তোমাদের কথা ওরা বিশ্বাস করে। যদি পারো তবে তোমাকে বখশিশ দেব – পাকা চুল কাঁচা ক'রে দেব—

—হ্যাঁ, ওদের মনের কথা আমরা বুঝি। তোমরা বুঝবে না, এটা ত আর ফাঁকি দিয়ে মক্কেলের পকেট মারা নয়, যে লোকে প্রত্যয় ক'রবে না। এ অন্তরের ভাষা—

– রক্ষে করো ভাই, আমাকে কাব্য শুনাতে আরম্ভ করো না—পাগল হ'য়ে যাবে। তোমাদের যত অর্থহীন সব বাক্য—হাস্য পরিহাসের মাঝে নন্দিতা চা ও কিছু খাবার লইয়া উপস্থিত হইল। অমল সোৎসাহে কহিল—এস, এস মা লক্ষ্মী, একটু চা'য়ের জন্যে প্রাণটা ছট্‌ফট্‌ কচ্ছিল। আর তোমার বাবার অভিযোগ ত অত্যন্ত গুরুতর—

নন্দিতা হাসিয়া কহিল—কি? আমার নামে –

– হ্যাঁ, কিন্তু আমাকে জড়িয়ে। আমার কোন লেখা পড়ে নাকি তোমরা খুনোখুনি করার জোগাড় ক'রেছ। তোমার বাবা বল্‌ছেন—ওটা নাকি লেখকের দোষ –

নন্দিতা চা'র কাপটা তুলিয়া দিয়া কহিল—একটু তর্ক-বিতর্ক ও সর্ব্বত্রই হয়। আর কি?

– আরও আছে, বসো বলছি। এখানে বসো—অমল পা-দুটিকে একদিকে রাখিয়া বসিবার স্থান করিয়া দিল। নন্দিতার হাতখানি স্পর্শ করিবার একটা দুরন্ত আগ্রহ তাহার মাঝে দেখা দিল, যেমন করিয়া অপর্ণার হাতখানি সে চাহিয়াছিল। নন্দিতা ইতস্ততঃ করিতেছিল, অমল হাত ধরিয়া তাহাকে তাহার পাশে বসাইয়া দিয়া চা'র বাটিতে চুমুক দিল। নন্দিতা প্রশ্ন করিল—আর কি?

—গুরুতর অভিযোগ মা লক্ষ্মী, ধীরে-সুস্থে বলি। তুমি নাকি বিয়ে ক'রবে না এমনি একটা বাতিকগ্রস্ত হ'য়েছ। মদীয় পুত্রের ঐ রকম একটা খেয়ালের কথা শুনছি। আমরা দুটি বুড়ো বাবা তাই বড়ই দুশ্চিন্তায় পড়ে গেছি—

নন্দিতা হাসিয়া কহিল—এটা আর দুশ্চিন্তা কি?

নন্দিতার এই মৃদু হাসিটি বড় মধুর। অমল তাহার মুখের পানে চাহিয়া থাকিয়া কহিল—দুশ্চিন্তা নয়, বল কি মা? এই বুড়ো বয়সে খোকা তার চাকুরীস্থলে নেওয়ার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা ক'রেছে, কিন্তু যাই নি। কে আমাকে দেখবে? ঠাকুর চাকর? তাদের কাজে মন ওঠে না—আর তোমার বাবার ভাবনা, হয়ত তুমি তাঁর অন্তে কি ক'রবে? চাকুরী ক'রবে? তা আমাদের পছন্দ না। আমরা ভাবি, বিয়ে ক'রে গেরস্থালী না ক'রলে জীবনটাই বৃথা হ'য়ে গেল—

নন্দিতা আবার হাসিল। অমল মুগ্ধদৃষ্টিতে তাহার পানে চাহিয়াছিল —আর একটু চা খাইয়া কহিল—হাসছো মা, কিন্তু এটা ঠেকে শেখা।

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—ওই ত ভাই আজকালকার দোষ। আমাদের অভিজ্ঞতার যেন কোন মূল্য নেই—

নন্দিতা কহিল—আপনিই ত লিখেছেন যে মানুষের বিবাহিত জীবনে সত্যিকার ভালবাসা নেই—তারা অতৃপ্ত—

—হ্যাঁ, তাই। যা পাওয়া যায় না, তা বিয়ে ক'রলেও পাবে না। এসব কথা তুলো না, তোমার কথার ধৈর্য্যচ্যুতি ঘট্তে পারে—তবে জ্ঞাত জগতের পিছনেও একটা অজ্ঞাত জগৎ আছে, সেটা তোমরা জানো না! নইলে এত ছেলেমেয়ে থাক্তে সেদিন তোমার সঙ্গেই আলাপ ক'রতে গেলাম কেন? আর আজ তোমার হাতে আমার স্থবির জীর্ণ দেহটাকে তুলে দেওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা নিয়েই বা তোমার বাবার কটূক্তি শুনতে আসবো কেন?

রবীন্দ্রবাবু প্রতিবাদ করিলেন—কটূক্তি আবার করলুম কই অমল—

—বেশ। আমার লেখাকে যে বিশেষণ দিয়েছ সেটার মাঝে কটূক্তি নেই—একথা তোমাদের মত উকিল এ্যাটর্ণী'রাই ব'লতে পারে। নন্দিতা কথাটার ইঙ্গিত বুঝিয়াছিল, তাই মাথা নীচু করিয়া বসিয়াছিল। অমল তাহার মাথায় হাতটি রাখিয়া কহিল—মা লক্ষ্মী, তোমারা আমাদের এ ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের অনুশোচনা, দুঃখ, পরিতাপ এ সমস্ত বুঝবে না; কিন্তু এই ধর আর চার পাঁচ বছর হয়ত বাঁচবো, কিন্তু সারাজীবনের কর্ম্মক্লান্তি ফেলে তোমাদের মত কারো কোলে মাথা রেখে পরম শান্তিতে শেষ নিশ্বাস ফেলবো আশা নিয়ে ঘুরছি। জানি, আমাদের এ চার বছরের জন্য তোমাদের জীবন নষ্ট করা অন্যায়, তবুও মনে হয় একটা বৎসর বড় মহার্ঘ, বড় মূল্যবান। পৃথিবীর অতিক্রান্ত বিশুষ্ক পথের দিকে আর চাইতে ইচ্ছা হয় না—

নন্দিতা মাথা নীচু করিয়াই জবাব দিল—কেন? আমরা কি বাপ-মায়ের সুখের জন্যে আপনার সুখ বিসর্জ্জন দিতে পারি না!

—না, পারো কই মা? এই আমার খোকা—সে যখন সবে উপুড় হতে শিখেছে তখন আমি আর তার মা দু'জনে কত গল্প ক'রতুম—খোকা ম্যাজিষ্ট্রেট হবে, আমরা দুই বুড়োবুড়ী তার বাংলোয় পরম নিশ্চিন্তে শেষ জীবন কাটাবো, বৌমাটি হবে সেবাপরায়ণ, ইত্যাদি, কিন্তু কই—খোকা বিয়ে ক'রতেই নারাজ, আর খোকার মা আমাকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে গেলেন। খোকা ভাবে—তার জীবনের কথা আমাদের নয়, যেমন তুমি ভাবো তোমার কথা তোমার বাবার নয়—

নন্দিতা হঠাৎ কোন জবাব দিতে পারিল না, চুপ করিয়া রহিল। রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—যা বলেছ ভাই, তোমার মত গুছিয়ে কথা ব'লতে কোনদিনই পারি না, নইলে হয়ত ওদের বুঝোতে পারতাম—

অমল উৎসাহিত হইয়া কহিল—নন্দিতা মা, আমার কি কি বই পড়েছ ?

—সবই।

—বেশ ! কিন্তু জীবনের চরম সত্য যেটা বুঝেছি সেটা তোমাকে বলি, দেহাতীত যে আকাঙ্ক্ষা মানুষের মনের, তার পরিতৃপ্তি নেই। তুমি যা পাবার আশায় আজ বিয়ে ক'রতে নারাজ, কিন্তু সারা জীবন প্রতীক্ষা কর'লেও তা'ত পাবে না। আমরা জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বেশ বুঝ্ছি ও পাওয়ার নয়—যার মন পাবে তার মন জীবন্ত বলে বিশ্বাস ক'রবো না—আমি চাই তোমাকে আমার গৃহে পুত্রবধূরূপে, কিন্তু তুমি চাও স্বাধীন জীবন—এই বৈষম্যপূর্ণ জগতে পরিতৃপ্তি কই ?

নন্দিতা আনন্দিত বিস্মিত চোখে চাহিয়া কহিল—আমাকে ?

—হ্যাঁ, তাই ছুটে এসেছি। তুমি ফিরিয়ে দেবে, আবার খুঁজবো, আবার আর কেউ ফিরিয়ে দেবে, আবার খুঁজবো—রবীন্দ্রনাথের পরশপাথরের সন্ন্যাসীর মত কেবল খুঁজবো—যদি পাই তাও বুঝবো না, কোন ফাঁকে সে হারিয়ে যাবে।

নন্দিতা কহিল—ফিরিয়ে দেবেই এমন অনুমান করেন কেন ?

—মানুষের ধর্ম্মই ওই, যেমন তোমার সঙ্গে আজ আমাদের মত মিল্ছে না ?

নন্দিতা কহিল—চলুন একটু ভিতরে, আমরা সকলে আপনার সঙ্গে আলাপ ক'রবো।

—আমরা মানে—

—ভাই বোন সব, আর বৌদি।

অমল একটু আশান্বিত হইয়া কহিল—চল মা। কিন্তু বড় শীত, নড়তে ইচ্ছে করে না। রক্ত যেন ঠাণ্ডা হ'য়ে গেছে—

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—হ্যাঁ, ভিতরেই যাও, তোমাদের কাব্য আমার সইবে না। অর্থহীন সব—

—মোকদ্দমার নথিপত্রে অন্তরটা ঘুণে খেয়েছে, নইলে বুঝতে—

—রক্ষে করো ভাই। বুড়ো বয়সে কাব্যচর্চ্চা ক'রলে লোকে রাঁচি পাঠাবে।

—বেশী বাকি নেই বলে মনে হয়। নরকে যেয়েও আইনের ধারা ঝাড়বে বোধ হয়—যাক্ চল মা।

ভিতরে যাইয়া কাব্য সাহিত্য প্রসঙ্গে নানা আলোচনা চলিল—অমল বসিয়া বসিয়া নানা কথা কহিল। আসিবার সময় অমল নন্দিতার মাথায় হাত রাখিয়া কহিল—তোমায় বড় ভাল লাগে মা, তাই ছুটে আসি। যেন মনে হয় বহু পুরাতন পরিচিত তুমি—কর্ম্মক্লান্ত জীর্ণ মনটা, তার সঙ্গে অশক্ত দেহটা একমাত্র তোমারই আশ্রয়ে যেন নিশ্চিন্ত হ'তে পারে। বার্দ্ধক্যের স্বজনহীন অত্যন্ত একক জীবনের দুঃখ কি, তা তোমাদের যৌবনের মন নিয়ে বোঝা সম্ভব নয়—

নন্দিতা অমলের বুকের অতি সন্নিকটে দাঁড়াইয়া কহিল—আবার কবে আস্বেন ?

—আবার আস্বো ?

—নিশ্চয়ই আস্বেন। কেন আস্তে ইচ্ছে ক'রবে না, আমরা কি এতই দুর্জ্জন ?

—না, নৈকট্যই বড় বেদনাদায়ক। যখন তুমি বিদায় ক'রে দেবে, তখন যাওয়াটা বড়ই দুঃখের হবে, সেই ভয়ে—

নন্দিতা অমলের হাতখানা অত্যন্ত স্নেহের সঙ্গে ধরিয়া কহিল—বিদায় যে দেবই, এমন অনুমান ক'রছেন কেন ?

—তোমার বাবার কাছে যা শুনলাম, তাতে ত সাহস পাই না।

নন্দিতা নত দৃষ্টিতে ক্ষণিক দাঁড়াইয়া রহিল। প্রশান্ত চোখ দুইটি তুলিয়া ধরিয়া কহিল—কবে আস্‌বেন ?

—যেদিন তুমি ডাক্‌বে—

—রোজই আস্‌বেন।

—নিমন্ত্রণ গ্রহণ ক'রলাম, তবে বেতো শরীর নিয়ে কলকাত বালিগঞ্জ ছুটাছুটি ক'রতে পারবো কি ? অমল বন্ধুবরকে ডাক দিয়া কহিল—ভাই রবি তোমার মেয়ে ত রোজ আসবার নেমন্তন্ন ক'রলে, তারপর তুমি আবার চা বিস্কুটের অপব্যয়ের জন্য অনুশোচনা ক'রো না।

—না, চা বিস্কুট ত ভাল—কত টাকাই অপব্যয় ক'রলুম ওদের খেয়ালে—

অমল চলিয়া আসিল।

পরের দিন অমল ভাবিয়া দেখিল—এক নন্দিতার কাছে যাওয়া ছাড়া যেন দ্বিতীয় কোন কাজ আর তাহার জীবনে অবশিষ্ট নাই। একদিন অপর্ণা যেমন দুর্ব্বার আকর্ষণে তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিয়াছিল, আজ নব-অপর্ণা এই নন্দিতাও যেন তেমনি করিয়া তাহার সমস্ত অন্তর জুড়িয়া বসিয়া গেছে। তাহাকে আপনার করিয়া পাইবার একটা দুরাকাঙ্ক্ষা তাহার অন্তরকে সহসা বেগবান করিয়া তুলিয়াছে—

সন্ধ্যায় রবীন্দ্রবাবুর সঙ্গে দেখা হইতেই রবীন্দ্রবাবু সহাস্যে অমলকে অভ্যর্থনা করিয়া কহিলেন—হ্যাঁ অমল, তোমার কাব্য সাহিত্যের কিছু জোর আছে দেখ্‌ছি। তুমি কি মন্তর-টন্তর কিছু জানো ?

—কেন বল ত ভাই ? কি অপরাধটা করলুম—মামলার রায় রাতারাতি উল্টে গেল দেখ্‌ছি—

—হ্যাঁ। যে মেয়ে বিয়ে ক'রবে না, সে মেয়ে দেখি কালই

নিমরাজি। পাঠ্যাবস্থায় যে অপর্ণার কাছে আমরা ঘেঁষতে সাহস পাই নি তুমি তাকে একেবারে হাতের মুঠোয় করলে। ব্যাপার কি?

অমল সগর্ব্বে কহিল—ও বুঝবে না। কাব্য সাহিত্য পড়লে তবে বুঝতে পারবে।

—হ্যাঁ, বুড়োকালে একটু পড়তেই হ'চ্ছে দেখছি—গিন্নীর মত হ'লেই হয়—

—সে মত হ'য়েই আছে।

নন্দিতা আসিয়া কহিল—কতক্ষণ এসেছেন? আমাকে ত ডাকেন নি—

—তোমার পিতৃদেবের সঙ্গে আলাপ আলোচনা ক'রছিলাম—

—বেশ, বাবা ত নেমন্তন্ন করেন নি, আমি করেছি; আর আমাকে ডাকলেন না। আজ কিন্তু খেয়ে যেতে হবে—

অমল সহাস্যে কহিল—কি যে বল মা। চালচুলোহীন ব্যক্তিকে এসব প্রশ্রয় দেওয়া উদারতা হ'লেও যথেষ্ট বুদ্ধির পরিচয় নয়—এ ভূত যে ঘাড় থেকে সহসা নামবে না।

—তা হোক্, খেয়ে যেতে হবে।

—রাত্রে আমি ত বিশেষ কিছু খাই না মা।

—কি খান বলুন। তাই ঠিক ক'রে রাখ্ছি—

অমল একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলিয়া কহিল—ওঃ, দীর্ঘদিন পরে খাওয়া নিয়ে পীড়াপীড়ি ক'রবে এমন লোকের সন্ধান পেলুম। আনন্দের কথা আজ থাক্ মা নন্দিতা, দিন আস্‌লে নিত্য খাওয়াতে পারবে—

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—ভাগ্য একে বলে, আমার মেয়ে আমাকে খাওয়াবার জন্যে পাগল হয় না, আর তুমি কোত্থেকে কে এলে, তার যত্নের সীমা নেই।

নন্দিতা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—আহা হা, বাবাকে যেন কোনদিন সেবাযত্ন কিচ্ছু করিনি।

রবীন্দ্রবাবু পুনরায় কহিলেন—ভাল, তাই বলে অমলকে হিংসে ক'রবো না। তোমার ছেলেকে আস্‌তে লিখেছ? মেয়ের বিয়েটা না দিতে পারলে মরেও নিশ্চিন্ত হতে পারবো না।

অমল মৃদু হাসিয়া কহিল—কি বল মা, খোকাকে আস্‌তে লিখবো? তোমাদের একটু জানাশুনো হওয়া ত দরকার—

নন্দিতা নতদৃষ্টিতে জবাব দিল—আপনার খোকাকে আপনি আস্‌তে লিখবেন, তাতে আমার আবার মতামত কি? এতদিন ত নিতে হয় নি—

অমল টিপ্পনি করিল—সবে আরম্ভ হ'ল। তা একটু জল গরম করো—উষ্ণ হোক্, কবোষ্ণ হোক্—

নন্দিতা তাড়াতাড়ি প্রস্থান করিয়া কহিল—এক্ষুণি আন্‌ছি।

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—বিয়েটা যদি ভালোয় ভালোয় হ'য়ে যায়, তবে তোমাকে একটা বখ্‌শিস দেব—একটা ঘটক বিদায়—কি চাও বল?

—যা চাইব তাত আর দেবে না। আমি ত বেয়ান ঠাক্‌রুণকেও চেয়ে বস্‌তে পারি—

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—পরম আনন্দে দেব ভাই, একটা লোক যে এত ভারী, তা'ত আগে জানি নি।

ভারমুক্ত হ'য়ে যে পেট গুলোবে ভাই—আমার মত।

রবীন্দ্রবাবু হাসিয়া কহিলেন—যা বলেছ। ছেলের মোটর চাই নাকি? আর কি?

—ছেলেই জানে। আমার দরকার বৌমাটি—আর যদি সম্ভব হয়—

নন্দিতা আসিয়া পড়িল, কাজেই পরিহাসটার আর পুনরুক্তি হইল না।

খোকা ছুটি লইয়া আসিল। নন্দিতার সহিত দেখাও হইল। অমল বাসায় ফিরিয়া প্রশ্ন করিল—বিবাহ সম্বন্ধে তোর কি মত সেটা খোলা-খুলিভাবে বলে যা। বেশী দিন আমার আর নেই—তবে শেষ ইচ্ছা তোর একটা বিয়ে দিয়ে যাই। তোর মা আজ বেঁচে থাক্‌লে—

অমল চুপ করিল—অনেকগুলি কথা যেন একসঙ্গে কণ্ঠের মাঝে কোলাহল করিয়া কণ্ঠ রুদ্ধ করিয়া দিয়াছে।

খোকা প্রত্যক্ষ কোন জবাব না দিয়া কহিল—তুমি আমার সঙ্গে চলো।

—কোথায় যাবো বাবা? তুমি থাক্‌বে কাজ নিয়ে—আমি এই একাকী জীবন নিয়ে কি ক'রে কাটাবো। ঠাকুর আর চাকরের দয়ায় বেঁচে থাকতে? সে ত এখানেই আছি—এখানে তবুও দু'একজন পরিচিত লোক অবশিষ্ট আছে—

খোকা কিছু কহিল না।

—তুমি অভিমান ক'রেছ জানি, তোমার বাসায় গেলাম না, কিন্তু বুড়ো বয়সে একাকী নিঃসঙ্গ জীবন কাটানো কি তা'ত জানো না, তোমার মা বেঁচে থাক্‌লে একথা আজ উঠ্‌তো না।

—তোমার কি এই মেয়েই পছন্দ।

অমল ভাবিয়া উত্তর দিল—সহসা উত্তর দেব না। তোমরা বড় হ'য়েছ, নিজস্ব মত এক একটা আর সকলের মতই আছে। আমার জীবনের শেষ কয়েক বছরের একটু তৃপ্তি কি সুখ, এর জন্যে তোমার জীবনকে ভারাক্রান্ত ক'রতে আমি চাই না। আমাকে সুখী ক'রবার জন্যেই তোমাকে বিয়ে ক'রতে বলা যায় না। তাও জানি। শুধু তাই নয়, মেয়ে পছন্দের কথাটা হাস্যকর—সেটা মনোহারী দোকানের সামগ্রী নয় যে বেছে আনা যায়, অথচ সমাজ নিয়মে তাকে জানবার সুযোগ

নেই। তবে আমার একটি মাত্র কথা হ'চ্ছে এই যে, নন্দিতা মা'র সঙ্গে আমিই পরিচয় ক'রে তার বাড়ীতে গেছি—অজ্ঞাত আকর্ষণ আমাকে সেখানে টেনে নিয়ে গেছে—তাই মনে হয় ওকে ঘরে আন্‌তে পারলে আমি যেন বড় তৃপ্তি পেতাম এবং বিশ্বাস তুমিও সুখী হ'তে পারতে। ওর মাঝে সত্যিকার হৃদয় আছে। তোমার নিজস্ব বিচার বুদ্ধি দিয়ে বিচার ক'রে উত্তর দিও।

খোকা তবুও কোন জবাব দিল না।

—তোমার জবাবের উপরেই আমার এখানে থাকা নির্ভর ক'রছে, নইলে দেওঘরের বাড়ীতেই বাকী ক'টা দিন কাটিয়ে দেব স্থির করেছি।

খোকা অনেক সাহস সঞ্চয় করিয়া কহিল—বিয়ে করার দরকার ত কিছু হয় নি—

—তোমার বয়সে সাধারণতঃই দরকার থাকে না, আমার বয়সে এসে দরকার হয়।

কয়েক দিন ধরিয়া নানা আলোচনার পর খোকা পত্রে তাহার মতামত জানাইবে বলিয়া চলিয়া গেল।

পঁচিশ

যথাসময়ে উত্তর আসিল—নিজের জন্যে না হইলেও পিতার জন্যে এ বিবাহে সে প্রস্তুত আছে। অমল হাসিয়া রবীন্দ্রবাবুর নিকটে কহিল—বাঙালী ছেলেমেয়েরা সাধারণতঃই নিজের জন্যে বিয়ে করে না। আমিও একদিন মায়ের আগ্রহে বিয়ে করেছিলাম।

রবীন্দ্রবাবু কহিলেন—আমিও তাই—বাবার অনুরোধে একান্ত অনিচ্ছায় কিন্তু ভিতরে ভিতরে ইচ্ছেটা প্রবলই ছিল। দুইজনই

হাসিলেন—অতিক্রান্ত-যৌবনের ভাবপ্রবণতা যেন ঠিক এমনই হাস্যকর।

যাহা হউক এক শুভদিনে নন্দিতার সহিত খোকার বিবাহ হইয়া গেল। নন্দিতা অমলকে একাকী কলিকাতায় রাখিয়া যাইতে স্বীকার করিল না, অতএব অমলও খোকার কর্ম্মস্থলে গিয়া বাসা বাঁধিল।

বৎসরাধিক পরের কথা—

অমলের বাতটা বেশ বাড়িয়া উঠিয়াছিল তাই ডাক্তার তাহাকে দেওঘরে যাইয়া থাকিতে উপদেশ দিলেন। নন্দিতা ও অসুস্থ অমল দেওঘরে আসিয়া উপস্থিত হইল। খোকা ছুটি পাইলে সেখানে আসিয়া সমবেত হইবে।

রোহিনী রোডের ধারে ছোট্ট বাড়ীখানি—পিছনে একটা পাহাড় দেখা যায়। সামনে একটু ফুলবাগান—অমলের আদেশে এবং পরিকল্পনায় রচিত। শীতের প্রারম্ভে নানা ফুল ফুটিয়াছে।

সকালে বারান্দায় রোদ আসিয়া পড়িয়াছে। নন্দিতা চা খাইবার জন্যে সেখানেই চেয়ার টেবিল ঠিক করিয়া দিয়াছে। অমল রোদে বসিয়া চা'র অপেক্ষা করিতেছিল, নন্দিতা সমস্ত গুছাইয়া লইয়া উপস্থিত হইল। কহিল—দেরী হ'য়ে গেছে বাবা?

—না, রোদে বসে একটু চাঙ্গা হ'য়ে নেওয়া গেল।

চা খাইতে খাইতে অমল কহিল—বৌমা, তুমি আমার বৌমা না হ'য়ে অন্য কেউ হ'লেও কি এমনি যত্ন ক'রতো?

নন্দিতা হাসিয়া কহিল—ক'রতো বই কি? আমি আর কি ক'রছি—

—তোমার শাশুড়ী আজ বেঁচে থাকলে নিশ্চয়ই আমার মানুষ চিনবার ক্ষমতাকে তারিফ ক'রতো—

—তিনি কেমন ছিলেন ?

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—কেমন ? বড় শক্ত প্রশ্ন—

গেটের কাছে কয়েকটি মহিলাকে দেখা গেল—তাঁহারা এদিকেই আসিতেছেন। দেখিতে দেখিতে তাঁহারা আসিয়া পড়িলেন। নন্দিতা চাকরকে চেয়ার আনিতে বলিয়া তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করিল।

অমল চশমাটা আঁটিয়া তারস্বরে কহিল—অপর্ণা যে, এসো এসো কি সৌভাগ্য, কি ক'রে এলে ?

অপর্ণা হাসিয়া কহিল—তোমার মত বিখ্যাত লোকের ঠিকানা অবস্থিতি জানাটা ত বিস্ময়কর নয়। সেদিন কাগজে পড়লুম তাই আজ এসে উপস্থিত—

—বেশ করেছ। এঁরা ?

—এটি আমার বৌমা অর্থাৎ দেবর-পুত্রবধূ, আর এটি—পরিচয় দিতে হইল না বেশেই বুঝা গেল ঝি। তাহারা চেয়ার গ্রহণ করিলে নন্দিতা কহিল—একটু চা'র বন্দোবস্ত করি ?

অপর্ণা তাহার মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—এটি তোমার—জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সে অমলের পানে চাহিল। অমল কহিল—আমার খোকাকে মনে আছে ?—এতদিনে রাজকন্যা খুঁজে পাওয়া গেছে—

—যাক্, তোমার বৌমাটি সত্যিই রাজকন্যার মত।

অমল রহস্যাবৃত ভাষায় কহিল—রাজকন্যা সে খোঁজে নি, আমি খুঁজে পেয়েছি। পেয়েছি কিনা জানি না, তবে খুঁজে খুঁজে মনে হল এই বুঝি সেই ঘুমন্ত পুরীর রাজকন্যা।

—খোকা যেমন রিক্তহস্তে আমার কাছ থেকে ফিরেছিল তেমনি ভাবে ফিরে আসতে হবে না ত ?

অমল ঈষৎ হাসিয়া কহিল—ফিরে আস্‌তে হবেই! ঘুমন্তপুরীর রাজকন্যা ত বাস্তব সামগ্রী নয় যে পাওয়া যায়। যাক্, তোমাদের বাড়ী কোনটা—

—অপর্ণা আঙুল দিয়া পাশের বাড়ীটা দেখাইয়া দিল ওইটা। ভাগ্য-চক্রে আবার পাশের বাড়ী।

অমল সহাস্যে কহিল—ভালই, নইলে এই একাকী কাটাতুম কি ক'রে। সামনের এ ক'টা বৎসর যেন বুকে বেধে গেছে, আর কাটে না। তোমার সাথে দেখা হ'য়ে যেন স্বস্তিবোধ ক'রছি—তবুও কাট্‌বে।

অপর্ণা তাহার রেখাকুঞ্চিত মুখখানিকে যথাসাধ্য প্রসন্ন করিয়া কহিল—হ্যাঁ, বসে বসে দীর্ঘদিনের হিসাব নিকাশ করা যাবে।

অমল কহিল—কৃপণের কাজ টাকা বার বার গোণা, আমাদের জীবনের নিষ্ফল সঞ্চয় হয়েছে কৃপণের ধন।

নন্দিতা চা লইয়া আসিল। অমল ঈষৎ হাসিয়া কহিল—বৌমারা বোধ হয় আশ্চর্য্য হচ্ছ, আমাদের এত ঘনিষ্ঠ পরিচয় দেখে, না? আমরা একসঙ্গে এম্-এ পড়েছি, তাই শুধু পরিচয় নয়, খোকার অর্দ্ধেক মা ইনি; কারণ ছোটকালের আব্দার আদরের ঝামেলা অনেকখানি পোহাতে হ'য়েছে—তুমি প্রণাম কর বৌমা।

নন্দিতা প্রণাম করিল। অপর্ণা আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল—তোমাকে আর খোকাকে একসঙ্গে একবারটি দেখ্‌তে বড় ইচ্ছে হয়।—অমল, খোকা আস্‌বে না?

—আস্‌বে ছুটির অপেক্ষায় আছে। ছুটি পেলেই আস্‌বে—

নন্দিতা অপর্ণাকে কহিল—আমি ওঁকে নিয়ে গেলাম, আপনারা কথাবার্ত্তা বলুন। যখনই দরকার হয় ডাকবেন বাবা—

—অবশ্যই, আর কা'কে ডাকবো?

—রৌদ্রতপ্ত বারান্দায় অপর্ণা ও অমল পরস্পরের পানে একটু চাহিয়া থাকিয়া আপন মনেই হাসিয়া উঠিল। অমল কহিল—তোমারও চুল পেকেছে অপর্ণা।

—আমি অনন্তযৌবনা উর্ব্বশী এমন ধারণা হ'ল কেন? দাঁতও দু'চারটে পড়েছে—

—হ'লে ভাল হ'ত।

—ছেলের বিয়েতে নেমতন্নও ক'রলে না? আমিও ত কোলে পিঠে ক'রে খোকাকে খানিক মানুষ ক'রেছি—

অমল ব্যঙ্গ করিল—নতুন অপর্ণাকে খুঁজতে খুঁজতে পুরাতন অপর্ণাকে ভুলে গেছি।

—অর্থাৎ?

—আশুতোষ বিল্ডিং-এ বেড়াতে গেলাম—ঠিক তেমনটি রয়েছে যেমন আমাদের সময় ছিল। অপর্ণা ও অমলের দল বার্দ্ধক্যকে ভুলে সেখানে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তুমি যেখানটিতে বসে প'ড়তে লাইব্রেরীতে ঠিক সেইখানে বসে একটি মেয়ে তোমারই মত—লোভ হল। নিজে পাইনি, তাই পুত্রকে দিয়ে নিজে পেতে চাইলাম—বৌমা ক'রে ঘরে এনেছি।

অপর্ণা কহিল—হুঁ। কিন্তু এ বুড়োকালেও তুমি ভুলতে পারো নি সে সব কথা—

—না, হাস্যকর মনে হয় তবুও ভুলতে পারি না। আর একটু সাহস থাকলেও হয়ত পরিতাপ ক'রতে হ'ত না!

অপর্ণা স্মিতহাস্যে বিগত যৌবনকে স্মরণ করাইয়া দিয়া কহিল—আমার পক্ষেও তাই—মাকে জোর করে কথাটা ব'লতে পারলুম না কোনদিন—তোমার বৌমাটি কিন্তু বেশ হয়েছে, না?

—মনে হয়। কিন্তু ও খোকার রাজকন্যা খোঁজার মতই অর্থহীন,

তবুও খোঁজার বিরাম নেই আমাদের—ভাল কথা, অজিতবাবু কোথায়? কেমন আছেন?

—কল'কাতা, ভালই আছেন। অকস্মাৎ এ প্রশ্ন করলে কেন?

—কেন? আনুষঙ্গিক বলেই অবান্তর নয়—তাই। আসবেন না এখানে?

—আস্তে পারেন বড়দিনে। তোমার রোগটা কি?

অমল কহিল—বার্দ্ধক্য—তথা বাত। সকাল-বিকেল লাঠি ভর দিয়ে একটু বেড়াই। তুমি বেড়াও না?

—হ্যাঁ, একসঙ্গে বেড়ানো যাবে, আর কেউ ত নেই পরিচিত।

—বেশ, বেশ প্রস্তাব। কথায় কথায় সময়টা চলে যাবে। আজ-একটা প্রশ্ন মনে পড়ে—তুমি ইউনিভারসিটীতে আমার সঙ্গে অমন আলাপ ক'রলে কেন?

অপর্ণা কহিল—আজ স্বীকার ক'রতে বাধা নেই—নিজের সম্মান আভিজাত্য রক্ষার জন্যে অকারণ সাবধানতা আজ আর নেই, তাই ব'ল্তে পারি। তোমাকে প্রথম থেকেই আমার বড় ভাল লাগ্তো। ব'ল্লে হয়ত আশ্চর্য্য হবে, পড়বার ফাঁকে ফাঁকে লক্ষ্য ক'রতুম—

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—এ কথাটা যদি সেদিন জান্তুম! তোমার সঙ্গে আলাপ ক'রতে কি দুর্দ্দমনীয় আকাঙ্ক্ষাই ছিল, কিন্তু তোমার কাছে যেতেই সাহস হ'ত না।

—তুমিও কম ভীতু ছিলে না, আমি আলাপ না ক'রলে হয়ত তুমিও ক'রতে না—

অমল প্রতিবাদ করিল—ক'রতুম বই কি, তবে তোমাকে লক্ষ্য করছিলুম, কিছুদিন পরে হয়ত সাহস হ'ত—

অপর্ণা কপালের উপর হইতে একগোছা কাঁচাপাকা চুল সরাইয়া দিয়া কহিল—ছাই হত—প্রথম দিনে বিড়িটা নিয়ে যে বিভ্রাটে পড়েছিলে!

—হ্যাঁ হ্যাঁ, তোমার ত ঠিক মনে আছে। মিথ্যা কথাও বলেছিলাম কতকগুলো—সিগার খাই বলেছিলাম না?

—হ্যাঁ, তুমি যে রকম ভাবে স্পষ্ট কথা ব'লতে, তাতে কথা ব'লতেই ভয় হ'ত—

—ভয় হ'ত—বল কি! তোমাকেও ত আমার বড্ড ভয় হ'ত।

দুইজনেই অত্যন্ত প্রগল্‌ভের মত হাসিয়া উঠিল—যেন সেদিনের সেই ক্ষুদ্র দুঃখ আনন্দ আজ একেবারেই হাস্যকর।

অমল কিছুক্ষণ অপর্ণার মুখের পানে চাহিয়া কহিল—উঃ আজ তোমার দিকে তাকানো যায় না। কলেজের যে ছবিখানা মনের কোণে অঙ্কিত হ'য়ে রয়েছে তার এতটুকুও নেই আজ তোমার মাঝে—

অপর্ণা কহিল—তোমার মাঝেই আছে বুঝি? তুমিও ত বুড়ো—একেবারেই বুড়ো। তোমার লেখাগুলো না থাক্‌লে বিশ্বাস করা যেত না যে তুমি সেই অমল।

—বটে!

—হ্যাঁ—ঠিক তাই।

নন্দিতা ও অপর্ণার বৌমা আসিয়া উপস্থিত হইল। অপর্ণা কহিল—বেলা হ'য়েছে, আজ উঠি, কেমন?

—বেলা হ'ল? তাহ'ল বই কি! এখন আর বেলা অবেলা কি?

—সত্যিই, তবুও একটা অভ্যাস আছে ত।

—সকাল বিকেল এসো, বুড়োর কাছে বসে কেউ ত তৃপ্তি পায় না। তুমি এলে সময় কাটবে—সময় বুঝে নিদ্রাও আমাকে পরিত্যাগ ক'রেছে।

অপর্ণা সান্ত্বনার সুরে কহিল—আস্‌বো নিশ্চয়ই। বেড়াতে যাবার সময় ডেকে নিয়ে যাবো, কেমন?

—হ্যাঁ। আমি অপেক্ষা ক'রবো তোমার জন্যে।

অপর্ণা উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—হ্যাঁ, অপেক্ষা ক'রো।

দ্বিপ্রহরে লেপটায় আপাদমস্তক ঢাকিয়া অমল একখানা দার্শনিক পুস্তক পড়িতেছিল কিন্তু ভাবনাটা নানা দিক দিয়া তাহাকে অপর্ণার প্রসঙ্গে লইয়া আসিল। জীবনের সন্ধ্যায় অপর্ণা আর একবার আসিয়াছে তাহার হৃদয়ের করুণা ও সহানুভূতি লইয়া। নিরবিচ্ছিন্ন একাকীর মাঝে ও যেন নূতন আলোক—হয়ত সন্ধ্যার আঁধারকে তারার আলোয় আলোকিত করিয়া দিবে—

নন্দিতা আসিয়া কহিল—বাবা, আপনার সেই "মরণাতীত" বইখানার এ মাসের কিস্তি পাঠাবেন না। তাঁরা ত আবার তাগিদ দিয়েছেন—

—বড় শীত মা, লিখ্‌তে ইচ্ছে করে না। পরে হবে—

—না বাবা, আপনি বলুন, আমি লিখছি।

অমল আর একটু জড়সড় হইয়া কহিল—কাগজ কলম নিয়ে এসো, দেখি পারি নাকি। ওসব আর ইচ্ছে করে না যেন—কি হ'বে, দুদিন বাদে সবই ত থাক্‌বে পিছনে পড়ে—

নন্দিতা কাগজ কলম আনিয়া লিখিতে বসিল। অমল বলিয়া যাইতেছিল—

চাকর আসিয়া সংবাদ দিল, কে একজন দেখা করিতে আসিয়াছেন। জেরায় জানা গেল, জনৈক মহিলা ও তৎসঙ্গে একটি পরিচারিকা আসিয়াছে। অমল তাহাকে লইয়া আসিতে বলিল।

মহিলাগণ আসিলেন। অমল সহাস্যে অভ্যর্থনা করিয়া কহিল—রমলা দেবী। আশ্চর্য্য, আরও কয়েক বছর বাঁচতে ইচ্ছে করে যেন।

রমলা নমস্কার জানাইয়া কহিল—কাপালিক-কবি-দর্শনে এলাম। ভাগ্যচক্রে আমিও এখানে এসেছি।

—তাইত বলি—সকালে অপর্ণা এসে গেছে, আপনিও এসেছেন। হারান্‌লো যৌবনের দিনগুলি যেন ফিরে পেয়েছি। কাপালিকের কথা ভুলতে পারেন নি তাহ'লে!

রমলা বার্দ্ধক্যজীর্ণ মুখখানিতে অক্ষম হাসি ফুটাইয়া কহিল—ভুল্‌তে দিলেন না যে! আপনার লেখা পড়তে পড়তে আর ভুল্‌তে পারলাম না। কিন্তু এত বুড়ো হয়েছেন ভাবি নি—সে দিনের লোকটিকে চেনাই যায় না যেন!

অমল নন্দিতার মাথায় হাত তুলিয়া দিয়া কহিল—এই মা লক্ষীটি আমার একমাত্র পুত্রবধূ। বুড়ো জীর্ণ স্থবির দেহটাকে ওর হাতেই ছেড়ে দিয়েছি—উপযুক্ত পাত্রী।

রমলা ব্যঙ্গের সুরে কহিল—সন্দেহ নেই। বেছে বেছে বেশ সুন্দরী বৌমা এনেছেন—অপর্ণার দ্বিতীয় সংস্করণ—

অমল উঠিয়া কহিল—ঠিক, ঠিক বলেছেন—অপর্ণাকে খুঁজতে খুঁজতে যেন হঠাৎ ওকে পেয়ে গেলাম। কথাটা বলিয়া ফেলিয়া সে একটু অপ্রতিভ হইয়াছিল, তাই কহিল—মানে, অপর্ণার মত পোষ্টগ্রাজুয়েটের ছাত্রী—অকস্মাৎ আলাপ নাটকীয়ভাবে—আপনার?

—দু'টি মেয়ের বিয়ে হয়ে গেছে—একজন শীগ্‌গিরই এখানে আসবে হয়ত।

—বেশ শীগ্‌গিরই আস্‌তে লিখে দিন। বৌমা বোধ হয় কাপালিক-কবি শুনে হাস্‌ছো—

নন্দিতা হাসিয়া কহিল—হ্যাঁ। অমন কথা শুনে কার না হাসি পায়।

—ওঁর ভাইকে পড়াতুম এম্‌-এ পড়বার সময়। একদিন কাব্য প্রসঙ্গে ওঁর কাছে বলেছিলুম, আমি অংকশাস্ত্রে এম্‌-এ পড়ি। উনি মন্তব্য ক'রেছিলেন—আপনি একেবারেই কাপালিক। অমল উচ্চকণ্ঠে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল।

রমলাও হাসিতে হাসিতে কহিল—এখনও এ একটা মিষ্টি হ'য়ে রয়েছে, আপনি মিথ্যা কথা ব'ললেন কেন ?

অমল কহিল—মাঝে মাঝে মিথ্যা বলে কিন্তু বেশ আনন্দ পাওয়া যায়। যাক্ সে সব কথা দীর্ঘদিন পরে আলোচনা ক'রে কি হবে ? দীর্ঘ জীবনের ইতিহাসটা সংক্ষেপে বলুন—

রমলা একটু হাসিয়া ব্যঙ্গের সুরে কহিল—মেয়েদের আবার জীবনেতিহাস আছে নাকি ? সংক্ষেপে ব'ল্‌তে গেলে বলা যায়—আপনার বিদায়ের কিছুকাল পরে অকস্মাৎ পিতৃদেব এক সৎপাত্রের হস্তে আমায় সমর্পণ ক'রলেন, তার পরে গৃহস্থালি করা, সন্তান প্রতিপালন প্রভৃতি দৈনন্দিন কর্ত্তব্য, যার একদিনের ইতিহাস অন্য সবদিনের সঙ্গে সম্পূর্ণ এক। কিন্তু আপনার বৌমার শাশুড়ী—

অমল কহিল—বুড়োকালে একলা ফেলে গত হ'য়েছেন আজ ক' বৎসর। আপনাদের সঙ্গে পরিচিত ক'রে দেবার সৌভাগ্য থেকে বঞ্চিত হ'লাম সঙ্গে সঙ্গে। তবে অপর্ণার সঙ্গে কিছুকালের পরিচয় হ'য়েছিল—

নানা প্রসঙ্গে আলাপ করিতে করিতে বেলা পড়িয়া আসিয়াছিল। অমল নন্দিতার দিকে চাহিয়া কহিল—একটু চা'র বন্দোবস্ত কর, এঁদের, আবার বেরুতে হবে ত ?

নন্দিতা চলিয়া গেল। রমলা একাকী অমলের কক্ষের মাঝে নীরবেই বসিয়াছিল, যেন আজ বলিবার, অভিযোগ করিবার মত কিছুই নাই। অমল হাসিয়া কহিল—আমার বিদায়ের দিনের কথা মনে ক'রে আজও আপনার হাসি পায়, না ? কি ছেলেমানুষী করেছি আমরা—

রমলা ম্লান একটু হাসিয়া কহিল—সত্যি হাসি পায়, কিন্তু সেদিন কত দুঃখে কত অভিমানে কত চোখের জলই না ফেলেছি—মনে মনে

আপনাকে কত তিরস্কার ক'রেছি। কিন্তু আজ তা স্মরণ ক'রলে যেন লজ্জায় মাথা কাটা যায়!

অমল সগর্ব্বে কহিল—কিন্তু দেখুন, কি সুবুদ্ধির পরিচয় সেদিন দিয়েছি, নইলে জীবনে আপনার দুঃখের পরিসীমা থাকতো না। আপনার হঠকারিতাকে এবং আমার নির্ব্বুদ্ধিতাকে বারবার ধিক্কার দিতেন।

রমলা সহজ কণ্ঠেই কহিল—কি ক'রতাম ভেবে লাভ নেই, তবে যা ঘটেছে তার জন্যেও অনুশোচনা করিনি, যা ঘটেনি তার জন্যেও করিনি। আর ও প্রসংগটাই যেন আজ অত্যন্ত অবান্তর—ছেলেবেলার খেলনা হারালে কেঁদেছি, তার পরে—

—তার পরে যৌবনেও খেলনা ভেঙেগছে ব'লে আর একবার কেঁদেছেন, কিন্তু, কে জানে এই বার্দ্ধক্যেও আর একবার কাঁদতে হবে কিনা?

রমলা দৃঢ়কণ্ঠে কহিল—সে দুর্ব্বলতা আর নেই যে তা নিয়ে এখন যা খুসী তাই করা চলে—

—যাক্, একদিক থেকে আপনি নিশ্চিন্ত। জীবনে আমার কথা পুনরায় মনে পড়েনি জেনে সুখী হ'লাম।

—মনে না পড়েছে তা নয়। কিন্তু সে প্রসংগ তেমন শক্তিশালী আর নেই—শুনে দুঃখ পাবেন হয়ত—রমলা ইচ্ছা করিয়াই যৌবনের লীলাচঞ্চল দৃষ্টিভংগির একটু অক্ষম অনুকরণ করিল।

অমল আবার হো হো করিয়া হাসিয়া কহিল—শক্তিশালী থাক্‌লে আজ একটা বিড়ম্বনাই হ'য়ে দাঁড়াতো। বৌমাকে ফাঁকি দিয়ে পুনরায় আপনার সংগ চাইতুম।

রমলা হাসিতে হাসিতে অভিযোগ করিল—সংগটা তখনই যখন চাননি, এখন সেটার কথা উল্লেখ করা পরিহাস মাত্র।

—পরিহাস! না, ভুল বুঝবেন না। আমার অক্ষমতাকে আমি মার্জ্জনা করিনি তাই—

নন্দিতা চা লইয়া আসিল। অমল প্রসঙ্গান্তরে প্রশ্ন করিল—চলুন না, আমাদের সঙ্গে বেড়িয়ে আসবেন।

রমলা হাসিয়া কহিল—বেশ! ঘর গেরস্থালী নেই, সেই দুপুরে বেরিয়েছি, একবার দেখ্‌তে ত হবে!

অমল হাসিয়া উঠিল। রমলার জীর্ণ শ্রীহীন বৃদ্ধ মুখখানির দিকে তীব্র দৃষ্টি হানিয়া অমল কহিল—আপনারা সুখী, আমার কিছু দেখবার নেই ব'লেই বোধ হয় এত একা বলে মনে হয়—

—একা? এখনও একা?

—হ্যাঁ। সেই কলেজে পড়বার সময় যেমনটি ছিল—সে সমস্যা আজও পূরণ হয় নি। এই বিচিত্র আমার জীবন।

অপর্ণা তাহার বৌমাকে লইয়া দ্রুতপদে ঘরের মাঝে ঢুকিয়া পড়িয়া কহিল—বেশ! এখনও তৈরী হও নি, বেড়াতে যাবে কখন?

অমল কহিল—আরে! অতিথিটিকে চিনতে পারো?

—ও রমলা! তুমিও এসে জুটেছ - বেশ বেশ—বুড়ো বয়সে আবার ক্লাব ক'রবো নাকি?

—হ্যাঁ নামটা গঙ্গাযাত্রী ক্লাব হ'লে বেশ মুখরোচক হবে।

সকলে হাসিয়া উঠিল। অমল কহিল—দাঁড়াও, তৈরী হয়ে নি।

ছাব্বিশ

আরক্তিম সূর্য্য অদূরের পাহাড়ের পারে ধীরে ধীরে নামিয়া যাইতেছে। শীতপাণ্ডুর ধূসর বিবর্ণ ঘাসের মাঝে মাঝে পৃথিবীর অস্থি কংকালের মত মাঝে মাঝে পাথর বাহির হইয়া রহিয়াছে। সূর্য্যের ম্লান আলোয় শীতার্ত্ত পৃথিবী যেন জড়সড় হইয়া গায় ধূলার প্রলেপে অংগাবরণ দিয়াছে। বন্ধুর পথটির পাশে উচ্চাবচ ঢালু ভূমি—জীর্ণ বার্দ্ধক্যের বলি-অঙ্কিত শিথিল চর্ম্মের মত অমসৃণ। সন্ধ্যার আলোয় একটা ক্লান্তির ছায়া তাহাকে অস্বচ্ছ করিয়া তুলিয়াছে—

অমল লাঠি ভর দিয়া চলিতে চলিতে গুরুপরিশ্রমে অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া কহিল—না, আর চলে না বৌমা। পা' দুটো আর চলতে পারে না। এস এখানে এই পাথরটায় বসা যাক্—

অপর্ণা অনুমোদন করিল—হ্যাঁ। আর হাঁটা যায় না।

নন্দিতা প্রতিবাদ করিল—আপনারা বসুন, আমরা আর একটু ঘুরে আসি। চাকরকে দেখাইয়া পুনরায় কহিল—ও ত সঙ্গেই থাক্‌বে—

অমল কহিল—আচ্ছা যাও—

অপর্ণা মনে করিয়া দিল—বেশী দেরী ক'রো না বৌমা, ঠাণ্ডা লাগ্‌লে তোমার শ্বশুরের বাতটা আবার বাড়বে শেষে—বধূদ্বয় চলিয়া গেল। অমল পাথরটার উপর বসিয়া, অপর্ণাকে ইঙ্গিতে পাশে বসাইয়া দূরের পানে শূন্য দৃষ্টিতে অনেকক্ষণ চাহিয়া রহিল। একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়িয়া পরিশেষে কহিল—আজ হাসি পায়, না ?

প্রসঙ্গটা বুঝিতে না পারিয়া অপর্ণা কহিল—কিসে ?

—পুরাতন দিনের কথা মনে ক'রে। তুমি আমার অনুরোধে নীল শাড়ী প'রে এসেছিলে। আমাকে ডেকে নিয়ে পার্কে গিয়ে একদিন কত কথা ব'লেছিলে—

অপর্ণা কথাটায় কিছুমাত্র গুরুত্ব আরোপ না করিয়া কহিল—এ বয়সে সে সব ছেলেমানুষীর পুনরুল্লেখ ক'রে আর কি হবে—কি হাস্যকর সব ঘটনা ঘটেছে—

—যথা ?

—তোমার সঙ্গে আমার বেশী ঘনিষ্ঠতা আছে দেখাবার জন্যে ইচ্ছে ক'রে সমিতির মাঝে তোমার উপর হুকুম ক'রতাম। তোমাকে নিয়ে বেড়াতে যেতাম।

অমল হাসিয়া কহিল—হায় হায়! এ কথাটা যদি তখন বুঝতাম। আমি ত তোমার জন্যে সর্ব্বদাই শঙ্কিত, কখন অভদ্রোচিত কি ক'রে ফেলি—ধর সেই গড়ের মাঠে বসে শুকনো পাতা নিয়ে সে কি ভাবোচ্ছ্বাস!

অমল নিজে নিজেই হাসিয়া উঠিল।

অপর্ণা চুপ করিয়া রহিল। অমল কহিল—তুমি কিন্তু ঠিক তেমনি বুড়ো হওনি। চুল অবশ্য পেকেছে কিন্তু মুখ চোখ আমার মত চুপসে যায় নি—

—যা হোক্, সুন্দরী দেখে একটা স্তবস্তুতি রচনা ক'রো না যেন ?

অমল হাসিল, অপর্ণাও হাসিয়া উঠিল। অপর্ণাই কহিল—এ সব কথা এখন লোকে শুনলে পাগল ব'লবে—তাহ'লে তোমার খোকার জন্যে যে সব কাণ্ড ক'রেছি তা' ত আরও হাস্যকর—

অমল প্রতিবাদ করিল—আমার জন্যেও কম কর নি। তোমার মোটরে তুলে নিয়ে যেদিন নাটকীয় ভাষায় বললে—তোমার জন্যে সবই আমি দিতে পারি, সেদিন ?

অপর্ণা অত্যন্ত লজ্জিত হইয়া কহিল—ছিঃ ছিঃ ওসব কথা ব'ল্‌তে নেই, আবার কেন ? বুড়োকালে তোমার ভীমরতি হ'ল নাকি ? তুমি খোকাকে আস্‌তে লিখে দাও, বড্ড দেখ্‌তে ইচ্ছে করে তাকে।

অমল কহিল—ভীমরতি নয়, এখনও তোমার জন্যে মাঝে মাঝে যেন কেমন মনে হয়। জীবনটা কি হ'তে পারতো, আর কি হ'ল—

—সে সাহস ত তোমার ছিল না—এখন সে হিসেব ক'রে আর কি হবে ?

—না না, সাহস আমার ছিল যথেষ্টই, তোমার ছিল না। মা বারণ ক'রলেন, ব্যস, সব বুদ্ধি সাহস অতলতলে ডুবে গেল! মেয়েমানুষ কি আর সাধে বলে! খোকার মা যেমন, এত প্রেম এত ভালবাসা সব নিমেষে উবে গেল—যেদিন তুমি আমার সঙ্গে পরিচয় ক'রলে—

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—থাক্‌, বীরত্ব দরকার নেই তোমার আর। তুমিও ত বাড়ী গিয়েই বিয়ে ক'রলে!

কিছুক্ষণ নীরবতার পরে অমল প্রশ্ন করিল—আচ্ছা, যেদিন পরীক্ষার পরে ঝড়ো কাকের মত তোমাদের ওখানে উপস্থিত হ'লাম সেদিন কি ভেবেছিলে ?

অপর্ণা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিল—কি আবার ভাববো, বিরহ-টিরহ একটা কিছু হবে, কিন্তু বৌমারা ত ফিরলো না।

—ফিরবে এখন। কিন্তু তুমি কাঁদলে কেন সেদিন।

—আমি? একটা কিছু ভেবে নিশ্চয়ই খুব দুঃখিত হ'য়েছিলাম—হয়ত ভেবেছিলুম তোমার মত পুরুষরত্ন হারিয়ে জীবনটা ব্যর্থ হ'য়ে গেল।

অমল একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া কহিল—যাক্‌ আজ আর সে অনুশোচনা নেই ত?

অপর্ণা কৃত্রিম ক্রোধে কহিল—থাক্‌ না থাক্‌, এ বয়সে আবার তোমার সঙ্গে প্রেম করতে বল নাকি ?

অমল হাসিয়া কহিল—ব'ললেই কি ক'রবে ? আর অপ্রণয়ই বা

কি আছে ? কিন্তু ওরা ত ফিরলো না—রাস্তার উপর হইতে নন্দিতা ডাক দিল। অমল কহিল—এই যে এসেছ মা! এত দেরী ক'রতে হয়!

সেদিনের মত সান্ধ্য ভ্রমণ শেষ হইয়া গেল।

খোকা আসিবে সংবাদ পাওয়া গেল।

আজকাল নিত্যই প্রাতঃকালীন এবং সান্ধ্য আড্ডা জমিয়া উঠে অপর্ণা রমলা অমল কখনও কখনও নন্দিতা ও অপর্ণার দেবর পুত্রবধূ। সকালে অমলের বাড়ীর রৌদ্রতপ্ত বারান্দায় চা সহযোগে আড্ডা জমে, বৈকালে বেড়াইতে বেড়াইতে বা কোনও বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপরে বসিয়া।

রমলা সেদিন সকালে আসে নাই। অপর্ণা ও অমলই কথা বলিতেছিল। অমল সহসা কহিল—আজ জীবনের শেষ প্রান্তে দাঁড়িয়ে বারবার একটা কথা মনে হয়—

অপর্ণা আগ্রহে প্রশ্ন করিল—কি ?

—হিসাব ক'রে দেখলে দেখা যায় জীবনটা যেন একটা বিস্তৃত নীলাকাশ—অনন্ত শূন্যতায় ভরা, মাঝে নানা রঙের স্মৃতির টুক্‌রো মেঘে যেন ভেসে চলেছে। কখনও কালো মেঘে অন্তরাকাশ বিষাদ-করুণ হ'য়ে ওঠে, কখনও রক্তে রঙীন মেঘের রঙে রঙীণ হয়—

অপর্ণা টিপ্পনি করিল—তোমার মিষ্টিক কাব্য ব্যাখা না ক'রলে আমাদের মত অরসিকের পক্ষে বোঝা সম্ভবপর নয়।

অমল একটু উদাস কণ্ঠে কহিল—জীবনের দীর্ঘ এই ৫৪ বৎসর একঘেয়ে দুঃখ দারিদ্র্য অভাব অনটনের শূন্যতায় ভরা, তার সবকিছু মিশে একপ্রকার হ'য়ে রয়েছে, পৃথক ক'রে দেখা যায় না। তার মাঝে তুমি, রমলা। খোকা গৌরী এরা—এদের স্মৃতি যেন টুকরো মেঘ। আকাশের শূন্যতাকে ভরে দিতে পারে নি। সবচেয়ে আজ রয়েছে

কি ? কর্ম্মক্লান্ত জীবনে স্মরণ ক'রবার মত পাশে শুধু কয়েকটি স্মৃতি—না ?

অপর্ণা প্রশ্ন করিল—জীবনের সমস্ত প্রত্যক্ষ ঘটনা মুছে গিয়ে রয়েছে শুধু স্মৃতি ?

—তাই বল কি ? তোমার পরিচয় আজ স্মৃতি মাত্র, তোমার যৌবনে আমার যৌবনের অনুভূতি আজ ইতিহাস মাত্র ; এই যে এখন গল্প করছি দশ মিনিট বাদে এ প্রত্যক্ষই হবে স্মৃতি এবং আমাদের জীবনের সঙ্গে সঙ্গে তাও চিরতরে মুছে যাবে।

—সম্ভব।

যেদিন তোমার মোটরে বসে তোমাকে ফিরিয়ে দিয়েছিলাম সেদিন হয়ত বুঝ্‌তে পার নি যে আমি তোমাকে ফিরিয়ে দেই নি—তোমার কাছে যা চাই তা পাওয়া যায় না জেনে তোমার ভগ্নাবশেষকে অপ্রয়োজন বোধে ত্যাগ করেছিলাম—যৌবনের প্রত্যক্ষ তখন হয়েছিল স্মৃতি মাত্র, কিন্তু স্মৃতিকে ত প্রত্যক্ষভাবে ভোগ করা যায় না—

—কিন্তু আজ ?

—হ্যাঁ, আজ তাই সে পাওয়া চাওয়ার কাহিনী আমাদের কাছে হাস্যকর, লজ্জাকর মাত্র। কিন্তু ভেবে দ্যাখো সেদিন কি দুর্দ্দমনীয় ছিল আমাদের আকাঙ্ক্ষা। আজ তুমিও যেমন এই পাকাচুল অমলকে চাওনা, আমিও বুড়ী অপর্ণাকে চাই না। আজ তোমাকে নতুন করে পেতে চাই অবসরের সাথীরূপে—

—কিন্তু এ ভেবে কি হবে !

—হবে না কিছুই, মানুষের স্বভাবই কৃপণের মত জীবনের নিষ্ফল সঞ্চয়কে বারবার গণে দেখা—তাই দু'জনে একবার গণে দেখছি মাত্র।

অপর্ণা কিছু কহিল না উদাস দৃষ্টিতে মাত্র দূরের ধূসর রৌদ্রদীপ্ত

পাহাড়টির পানে চাহিয়া রহিল। অমল গড়গড়াটায় আর কয়েকটা টান দিয়া কহিল—ভাবছো আমরা যদি মিলিত হ'তাম তবে ত এই শূন্যতা থাকতো না, কেমন? কিন্তু তা থাকতো—তোমার এই জীর্ণ দেহে খুঁজতাম যৌবন, তার অসংলগ্ন প্রলাপ ও প্রগলভতা—তুমি খুঁজতে আমার যৌবনের কাব্যকে, কিন্তু না পেয়ে শেষে সমস্ত অন্তর এখনকার মত অমোঘ শূন্যতায়ই ভরে উঠতো। রমলা যেমন আমাকে ভালবাসতো—অথচ আজ আমাকে সে চায় না একান্ত অপ্রয়োজনীয় মনে ক'রে।

—গেট দরজার সম্মুখে একখানা গাড়ী আসিয়া দাঁড়াইল এবং অমল সাগ্রহে উঠিয়া বসিয়া কহিল—বোধ হয়—খোকা এসেছে—

অপর্ণা কহিল—খোকা?

অমল চাকরকে হাঁক ডাক দিয়া পাঠাইয়া দিল। খোকা বারান্দায় প্রতীক্ষারত পিতাকে প্রণাম করিয়া জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে অপর্ণার পানে চাহিল।

অমল হাসিয়া কহিল—এই জগৎ, তুমি সাগ্রহে খোকাকে দেখতে চেয়েছ, অথচ ও তোমাকে চিনতে পারে নি। এই ব্যর্থতার হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই। এঁকে চিনলিনে খোকা? ক'লকাতা থাকতে কার মোটরে রোজ বেড়াতে যেতিস্ মনে পড়ে?

খোকা স্মরণ করিতে পারিল কিনা বলা যায় না, তবে আনত শিরে অপর্ণাকে প্রণাম করিল। অপর্ণা তাহার মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিল—পথে কষ্ট হয়নি ত বাবা!

খোকা কহিল—না।

অপর্ণা পরিচয় দিল—তোমার রাজকন্যা পিসীমার কথা মনে আছে।

খোকা লজ্জিতকণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, মনে আছে। আপনাকে এখানে দেখতে পাবো এ'ত আশা করতে পারি নি।

যাহা হউক কিছুক্ষণ পরে খোকা চা খাইতে খাইতে প্রশ্ন করিল—বাবা, আপনার শরীর কেমন ? একটু ভাল বোধ হয় ?

অমল হাসিয়া কহিল—ভাল আর এ জীবনে বোধ হয় হবে না বাবা, তবে আপাততঃ খারাপ কিছু হয় নি।

অপর্ণার কুশল প্রশ্ন করিলে খোকার দিকে সস্নেহদৃষ্টিতে চাহিয়া অপর্ণা কহিল—হ্যাঁ, তোমার বাবার মত জবুস্থবু হই নি। কিন্তু দেখেছ অমল, খোকার চোখ দুটো ঠিক তেমনি চঞ্চল রয়েছে আজও। যেদিন ও প্রথম রাজকন্যা খুঁজতে আমার ঘরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল, সেদিনও ঠিক সকৌতুক দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়েছিল।

খোকা লজ্জায় মাথা নীচু করিল। অপর্ণা কহিল—শৈশবের সে সব কাহিনী শুনলে আজ বড্ডো লজ্জা হয়, না খোকা ?

অমল কহিল—যেমন যৌবনের, প্রৌঢ়াবস্থার কথা স্মরণ ক'রে আমাদের হয়। কিন্তু সেটা যেন কত আদরের—সেই ভুল, সেই ছেলে-মানুষীই যেন বার্দ্ধক্যের প্রজ্ঞা অপেক্ষা বেশী সত্য !

অপর্ণা অমলের কথায় কর্ণপাত না করিয়া কহিল—দেখেছ, খোকা ঠিক তোমার মতই দেখ্‌তে হ'য়েছে—কলেজে পড়ার সময় যেমনটি ছিলে—শুধু বর্ণটি হ'য়েছে ওর মা'র মত।

অমল ব্যঙ্গ করিল—ওর মাঝেই আমাকে পাবে, কিন্তু সাহিত্য-টাহিত্য লেখা না সুরু করে।

অপর্ণা তিরস্কারের সুরে কহিল—ও তোমার চেয়ে ভাল লিখ্‌তে পারবে জেনো।

অমল হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া কহিল—পৃথিবীতে আমার চেয়ে বহু লোকে ভাল লেখে, তাতে আমার পরিতাপের কিছু নেই ; আর আমার ছেলে যদি ভাল লেখে তবে সেটা ত আমারই আনন্দের কথা।

অমল অকারণেই বৌমাকে উচ্চকণ্ঠে ডাকিল। নন্দিতা ঈষৎ অবগুণ্ঠিত মুখে আসিয়া কহিল—আমাকে ডাকলেন বাবা ?

—হ্যাঁ, খোকার একটু খাওয়ার বন্দোবস্ত কর, সারা রাত্রি ট্রেণে জেগেছে। খোকা সকাল সকালই চান ক'রে ফেল্—আর আমাদের একটু চা'এর বন্দোবস্ত কর।

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—চা দিয়ে আবার কি হবে। আমি খেতে পারবো না এখন—

—না খেলে, আমিই খাবো বৌমা। তবে বৌমার হাতের চা না খেলে শেষে অনুশোচনা ক'রতে হবে। এমন চা আর কোথায়ও পাবে না।

খোকা কিছুক্ষণ উস্‌খুস্ করিয়া উঠিয়া গেল। অমল হাসিয়া কহিল—খোকার পেটে সাবানমাখা আর টবের জলে জলকেলি করা একটা রোগ ছিল। সেই খোকা এত বড় হ'য়েছে এ যেন প্রত্যয় হয় না।

অপর্ণা কহিল—আর তুমি এত বুড়ো হ'য়েছ এই কি প্রত্যয় করা যায় ?

সান্ধ্য ভ্রমণটা আজকাল হয় বটে, কিন্তু দলটি দ্বিধা বিভক্ত হইয়া যায়। অপর্ণা প্রায়ই খোকা ও বৌমাকে লইয়া চলিয়া যায়, রমলা ও তাহার মেয়ে হয়ত অমলের সহিত থাকিয়া যায়—কখনও বা অপর্ণা খোকা নন্দিতা সকলেই থাকে, রমলা চলিয়া যায়। আবার কখনও অমল তাহার বাত-পঙ্গু দেহটাকে বেশীক্ষণ বহন করিতে না পারিয়া একাকী চাকর সাথে ফিরিয়া আসে—

সেদিন কেমন করিয়া রমলা একাই যেন অমলের সহিত রহিয়া গেল। অমল ধীরপদক্ষেপ অকস্মাৎ সংযত করিয়া কহিল— আসুন এই পাথরটায় বসি। কেমন ?

—বসুন।

—আপনার কন্যাটি বুঝি আজ ওই দলে গেল না?

—হ্যাঁ।

—অপর্ণা ত খোকা আর নন্দিতাকে নিয়ে মসগুল, খোকার মা বেঁচে থাক্‌লেও হয়ত এমনি আমাকে ফেলে পালিয়ে যেত না?

—তা যাবে কেন?

—যেত। অমল হাসিয়া কহিল—অপর্ণা কি বলে জানেন? খোকা নাকি ঠিক আমারই মত, কলেজে আমি ঠিক যেমন ছিলাম—শুধু রংটা তার মা'র মত। অপর্ণার মেয়ে থাকলে আমি হয়ত ঐ কথাই বল্‌তুম—

রমলা কহিল—নেই, বেঁচে গেছেন। তার সঙ্গে হাঁট্‌তে হাঁট্‌তে প্রাণ ওষ্ঠাগত হ'ত।

অমল রক্তিম দিগন্তের পানে চাহিয়া অকস্মাৎ অত্যন্ত আর্ত্তকণ্ঠে কহিল—আমাদেরও ত সন্ধ্যা হ'য়ে এল।

—হ্যাঁ, তা বৈ কি?

অমল থামিয়া থামিয়া কহিল—এই পৃথিবীতে কতকগুলি লোক আছে যাদের কাছে সোজাসুজি সমস্ত কথা বলা চলে; আবার অনেকে এমন আছে যাদের কাছে ঘুরিয়ে ছাড়া কথা বলা যায় না—প্রথম পরিচয় থেকেই আমার কিন্তু মনে হয় আপনার কাছে খুলে সব বলা যায়—

—যায়, কেন কি ব'লতে চান?

—আমার উপর আপনার খুব রাগ হয় না?

—কেন?

—যেদিন আপনাদের ওখান থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম সেদিন হয়ত মনে মনে ভেবেছিলেন কি নিষ্ঠুর আমি—আপনার কোন মূল্য দিলাম না—

রমলা হাসিতে চেষ্টা করিয়া কহিল—সেই কথা! এত দিন পরে তার হিসাব ক'রে আর কি হবে!

—হবে না কিছু, কিন্তু হিসাব করাটাই বয়সের ধর্ম্ম। সেদিন হয়ত আপনি জান্‌তেন না নিজের অক্ষমতা ও দৈন্যের প্রতি কি বিজাতীয় ঘৃণা ও অভিমানে আমি জ্ঞানশূন্য হ'য়ে পড়েছিলাম। তা জান্‌লে আপনি হয়ত আমাকে ক্ষমা ক'রতেন—

রমলা শান্তকণ্ঠে কহিল—ক্ষমা ক'রবার কথা উঠে না, আর রাগও সেদিন হয়নি আমার। নিজের প্রতি ধিক্কারেই যেন ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়লাম। কি দুঃসহ নির্লজ্জতায় আমি আপনার কাছে আমাকে ব্যক্ত ক'রেছিলাম। মনে ক'রলে আজও লজ্জিত হই—

অমল কহিল—তাই। আজ জীবনটা কেবল লজ্জা, দুঃখ ও পরিতাপেই যেন পূর্ণ। দুষ্কর্ম্মের অনুশোচনাকেই বসে বসে আমরা সঞ্চয় ক'রেছি। এই নির্জ্জন সন্ধ্যায় আপনাকে পাশে পেয়ে যেন বারবার মনে হয়—সেই উন্মুখ যৌবন যদি ক্ষণিকের তরে ফিরে পেতাম তবে অনুশোচনাকে নিঃশেষে মুছে ফেলতাম।

গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া রমলা কহিল—কেমন ক'রে? জগতে যা চেয়েছিলাম তা আজ নেই, যা পরিত্যক্ত আবর্জ্জনার মত পড়ে আছে তা'কে ত চাই নি।

অমল সস্নেহে রমলার হাতখানি তুলিয়া লইয়া কহিল—আজ আমাকে ক্ষমা ক'রেছেন নিশ্চয়ই।

রমলা হাতটাকে ছাড়াইতে চেষ্টা না করিয়াই কহিল—ক্ষমা না করা আর করার মাঝে আজ তফাৎ কতটুকু!

হ্যাঁ, সত্যিই তাই। কোন তফাৎ নেই। আজকার এই পাকাচুল নিয়ে ক্ষমা চাওয়ার কোন মূল্য নেই।

—কথাটা বলিতে বলিতে সহসা দুইজনেই থামিয়া গেল। নির্জ্জন

সন্ধ্যার প্রতি রোমকূপে যেন শীতল ঘর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া মৃত্যুর বার্ত্তা প্রচার করিয়া দিতেছে। চারিপাশে বার্দ্ধক্যের একটা শিথিল স্থবিরতা পাণ্ডুর ধূসর মাঠের উপর যেন দাঁড়াইয়া পড়িয়াছে—দূরে গ্রামান্তরে সন্ধ্যার কুয়াশা ধীরে ধীরে অস্বচ্ছ মেঘাকারে জমিয়া উঠিয়াছে।

রমলা অমলের হাতখানি আকর্ষণ করিয়া কহিল—চলুন সন্ধ্যা হ'ল। ঠাণ্ডা লাগবে আবার—

অমল কহিল—চলুন—

সাতাশ

কয়েকদিন পরে সকালের দিকে একদিন সকলেই অমলের ওখানে সমবেত হইল—চা পান করিতে করিতে রমলা কহিল—অমলবাবু পরোয়ানা এসে গেছে, আজই যেতে হবে।

পরোয়ানা কোথা হইতে আসিয়াছে এবং তাহার মালিক কে তাহা উহ্য থাকিলেও বুঝিতে কোন অসুবিধা হইল না। অমল কহিল—আজই? এমন জমাট বার্দ্ধক্যের ক্লাব ছেড়ে চলে যাবেন?

রমলা কহিল—উপায় কি? আর এখানে বসে থাক্‌লেই ত চলে না—

অপর্ণা প্রতিবাদ করিল—এখন ত আর নবোঢ়া বধূটি নও, লিখে দাও না যে কিছুদিন পরে যাবে—

—তাঁরই শরীর খারাপ, নইলে গরজ ছিল না। না গেলে মনে ক'রবে বুড়োকালে ত্যাগ ক'রলাম।

অপর্ণা পুনরায় কহিল—ত্যাগ করা আর থাকা ত প্রায় সমানই

এখন—মেয়েকে পাঠিয়ে দাও সেবা-যত্ন ক'রবে। তোমার চেয়ে ভাল পারবে সে—

—তারও ত যেতে হবে, জামাই লিখেছেন—

অমল ও অপর্ণা হাসিয়া উঠিল। অমল প্রসঙ্গটাকে চাপা দিবার জন্য উচ্চকণ্ঠে কহিল—বৌমা, আর একটু চা দাও রমলা দেবী ত চলেই যাবেন—

চা সহযোগে নানা আলোচনা চলিয়া রমলার বিদায়ের সময় উপস্থিত হইল। সে উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিল—আসি তাহ'লে অমলবাবু, অপর্ণাদি—

অমলের অন্তরের মাঝে হঠাৎ যেন কেমন করিয়া উঠিল—রমলা চলিয়া যাইতেছে, হয়ত আর কোনদিন দেখা হইবে না। সে যদি ইতিমধ্যে এখানেই দেহরক্ষা করে তবে এই শেষ বিদায়। অমল আর্তকণ্ঠে কহিল—হ্যাঁ, জীবনের এই বোধ হয় শেষ বিদায়—আর একবার দেখা হওয়ার মত আয়ু বোধ হয় আর অবশিষ্ট নেই।

রমলা সাশ্রুনেত্রে অমলের শীর্ণ লোল মুখের দিকে চাহিয়া কহিল—সম্ভবতঃ তাই। এখানে আবার কতকাল পরে আসবো কে জানে? এই কটা দিন জীবনে স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে—

অমল কহিল—হ্যাঁ, স্মরণীয় হ'য়ে রইল। কে আশা করেছিল রুগ্ন বার্দ্ধক্যে আপনাদের দেখা পাবো। নিষ্ফল যৌবনকে বার্দ্ধক্যে যেন হাতের মুঠোয় পেয়েছিলাম—কিন্তু বার্দ্ধক্য তাকে ক্ষমা ক'রলে না।

রমলা নমস্কার করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া আসিল। সামনের উঠানটা পার হইয়া ভাবিল—এইখানেই শেষ—পূর্ণচ্ছেদ। আর হয়ত কোনদিন অমলের সঙ্গে দেখা হইবে না—একদিন তার মৃত্যু-সংবাদ সংবাদ-পত্র মারফতে জানিবে! অমল রহিবে না, রহিবে তাহার স্মৃতি। যৌবনের

সেই বিদায়ের দিনে যেমন করিয়া সারাজীবন একটা স্মরণীয় স্মৃতি হইয়া রহিয়াছে। সেই আশা, আকাঙ্ক্ষা, অভিমান পরিতাপ চিরতরে নীরব হইয়া যাইবে। এই অমল পৃথিবীর উপরে বাস্তব থাকিয়াও যেমন মরীচিকার মত অবাস্তব ছিল. তাহাকে একাকী রাখিয়া গিয়াছিল মৃত্যুর পরেও তেমনিই রহিয়া যাইবে—সেই বিদায়, সেই অনুশোচনা আজ তাহার জীবনে চিরন্তন হইয়া রহিয়াছে, মৃত্যুর পরেও থাকিবে। মানব-জীবন এমনি একক, এমনি দুঃখবিলাসী—

গেট দরজাটা ঠেলিয়া রাস্তায় পা দিয়া রমলা পিছন ফিরিয়া চাহিল। অপর্ণা ও অমল রৌদ্রতপ্ত বারান্দায় তেমনি করিয়াই বসিয়া আছে—মুখোমুখি। টেবিলের ব্যবধানে ব্যাহত—অমলের শুভ্র কেশ রৌদ্রে চিকমিক্ করিতেছে।

রমলার অন্তরে কি যেন একটা অজ্ঞাত বেদনা অকস্মাৎ সুপ্তোত্থিত অজগরের মত মোড়ামুড়ি ছাড়িয়া জাগিয়া উঠিল। চোখ দুইটি জ্বালা করিয়া জলে ভরিয়া গেল—তাহার ভিতর দিয়া স্পষ্ট কিছুই দেখা যায় না —পৃথিবীটা অকস্মাৎ যেন ঝাপ্সা হইয়া কুয়াসাবৃত হইয়া গিয়াছে। রমলা মনে মনে কহিল—এই শেষ বিদায়—অন্ততঃ এ-জীবনের মত। একদিন এমনি করিয়াই সে অপর্ণা ও অমলের নিকট হইতে একাকী বিদায় লইয়াছিল—সেদিন এমনি দুঃখে পরিতাপে একাকীত্বে তাহার চোখ দুইটি অশ্রুপ্লুত হইয়া গিয়াছিল আজও ঠিক তেমনি, একাকী একান্ত একাকী বিদায় লইয়া যাইতেছে—কেহ জানিল না, কি বেদনায় কি দুঃখে সে চলিয়া গেল – কোন অনুযোগ করিল না, অভিযোগ করিল না—

ঝাপ্সা চোখের দৃষ্টিকে আর একবার সে পিছন পানে ন্যস্ত করিল —এখনও দেখা যায় অস্পষ্ট অমল ও অপর্ণা নিশ্চেষ্ট নিশ্চিন্তে বসিয়া আছে। রমলা মনে মনে আর একবার বিদায় নমস্কার জানাইয়া কহিল —বিদায়, এই পৃথিবীর ধূলায় এই শেষ বিদায়—আর দেখা

হইবে না—জীর্ণ নেত্র অশ্রুপ্লুত হইবে না—অমল আর আসিবে না—

অমলের বাত-ব্যাধিটা আজ কয়েকদিন বেশ বাড়িয়াছে—দুইটা হাঁটু ফুলিয়া বেদনা হইয়া উঠিয়াছে—উঠিতে কষ্ট হয়, সঙ্গে সঙ্গে একটু জ্বরও হইতেছে। সে লাঠি ভর দিয়া কোনমতে এঘর ওঘর করে। নন্দিতার সেবা যত্নের ত্রুটি নাই, খোকা চিকিৎসার ত্রুটি রাখে নাই—কিন্তু অমলের বিকল দেহযন্ত্র কিছুতেই যেন আর সচল হইতে চাহিতেছে না।

অপর্ণা তাহার নিরুদ্ধ জীবনের একাকীত্ব দূর করিতে সকাল বিকাল আসে, কোন কোনদিন নন্দিতার হেফাজতে তাহাকে রাখিয়া বেড়াইতে যায়। অমল কোন কোনদিন একান্ত একাকী সন্ধ্যাটা অতিক্রম করে। বার বার রাস্তার দিকে চাহিয়া দেখে অপর্ণা সদলে ফিরিল কিনা। অত্যন্ত আগ্রহে অপর্ণার ফিরিবার আশা করে—শরীরটা তাহার যতই অকর্ম্মণ্য হইয়া যাইতেছে, মনটা যেন ততই অপর্ণার সঙ্গকে চাহিতেছে। তাহার মনে হয় অপর্ণাকে কিছুই বলা হইল না, কিন্তু সামনে আসিলে কি বলিবে তাহা সবই ভুলিয়া যায়। অপর্ণা কোন কোনদিন আসে না, অমল একাকী বাহিরের দিকে চাহিয়া বসিয়া থাকে। খোকা আর তার রাজকন্যা পিসিমা বেড়াইতে যাইয়া অত্যন্ত বিলম্বে ফেরে। অমলের নিঃসঙ্গ জীবনে একটা নিরাশা ও অভিমান তাহাকে পীড়িত করে—

সেদিন একটা আরাম কেদারায় বসিয়া বাহিরের পানে চাহিয়া ছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে বাড়ীখানি জনহীন, কলরবহীন নিঝুম। দূর দিগন্তে সামনের বাড়ীতে ছাতে রংএর মেলা বসিয়াছে—ক্রমে ক্রমে নিষ্প্রভ হইয়া আসিতেছে। ধীরে, অতি ধীরে, সন্তর্পণে, হালকা অন্ধকার অস্বচ্ছ কালো ডানা মেলিয়া পৃথিবীকে দীর্ঘশ্বাসের বেদনায় ঘিরিয়া ফেলিতেছে।

পরিদৃশ্যমান জগতের রঙীন ছবি ধীরে ধীরে মৃত্যুর গাঢ় কালো অন্ধকারে অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। চারিপাশে বিরহীর অশ্রুকণা যেন কালো কুয়াশার মত পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। নিশীথ রজনীর বুক চিরিয়া কে যেন বুকফাটা আর্ত্তনাদে চারিদিক ভরিয়া দিয়াছে—দূরাগত কলরবে যেন তাহারই করুণ সুর।

নন্দিতা কি কারণে তাহার কক্ষে আসিয়াছিল, অমল প্রশ্ন করিল—বৌমা, অপর্ণা আর খোকা কি এল ?

—না, তাঁরা ত ফেরেন নি।

—একটা খবর দাও না।

ভৃত্য ক্ষণকাল পরে সংবাদ দিল, তাহাদের সন্ধান মিলিল না। অমল অকারণে কয়েকবার অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে সদর দরজার দিকে চাহিল কিন্তু অপর্ণা আসিল না। নিশ্চিন্ত আলস্যে কেদারা ঠেস্ দিয়া বসিয়া অমল গড়গড়া টানিতে লাগিল।

ভাবিল—এই হয়ত তাহার জীবনের শেষ রোগশয্যা। এই জগত তাহার সমস্ত রূপ রস গন্ধ লইয়া চিরতরে চোখের উপর হইতে মুছিয়া যাইবে—সেই সঙ্গে সঙ্গে অপর্ণাও হয়ত ভারাক্রান্ত মনের কোণ হইতে বিদায় লইয়া চির বিস্মৃতির মাঝে আত্মগোপন করিবে—খোকা যাইবে, নন্দিতা যাইবে—অনন্ত শূন্যে অনন্ত বিস্মিৃতির মাঝে, অনন্ত অন্ধকারে সে চলিবে একান্ত একাকী—সেখানে পথের দিক নাই, পথ নাই—চলার বিরাম নাই। পথহীন, আলোকহীন অনন্ত অসামঞ্জস্যময় এই পৃথিবীর উপরেও ঠিক এমনি অনির্দ্দিষ্ট পদক্ষেপে সে দীর্ঘ ৫৫ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে—জীবনের কোন সঞ্চয় নাই। নিষ্ফল সাধনার হতাশায় একটা গভীর একাকীত্ব তাহার জীবনকে অশ্রুর প্রণালী দ্বারা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে—

অনাগত মৃত্যুর ছায়ায় অনন্ত শূন্যতাকে প্রত্যক্ষ করিয়া অমলের অন্তর

হাহা করিয়া কাঁদিয়া উঠিল—হায় হায়, সকলই রহিবে সে শুধু চলিবে একাকী দীর্ঘ পথ—যেমন একাকী সে জীবনের দীর্ঘ অর্দ্ধশতক চলিয়াছে—

আজ মনে হয় উন্মুখ যৌবনের প্রারম্ভে ওই অপর্ণাকে ঘিরিয়া তাহার তন্দ্রাচ্ছন্ন বিবশ কল্পনা স্বপ্নের তুলি দিয়া জীবনপট রাঙাইয়া তুলিয়াছিল—রঙীন আশার উন্মাদনায় সে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। উন্মত্ত কোলাহলের মাঝে জীবনের সাফল্য আত্মবিসর্জ্জন দিয়াছে। তারপর একদিন বর্ষণ-মুখর সন্ধ্যায়, বিদায়কালে তাহার একক জীবনের গাঢ় দীর্ঘশ্বাসে চির-বিদায়-ক্ষণ ঘোষণা করিয়া দিল—ব্যথিত বেদনার্ত্ত করুণ দৃষ্টি নিস্তব্ধ বাড়ীটার সর্ব্বাঙ্গে অশ্রুর প্রলেপ মাখাইয়া তাহাকে সুগন্ধী করিয়া রাখিয়া গিয়াছে। অন্ধকার আকাশের পটে বাড়ীর উন্মুক্ত গবাক্ষ চিরতরে রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাহার শোকার্ত্ত অন্তর অপর্ণার দুই বিন্দু অশ্রুসম্পাতে বিদ্যুৎ-বিদীর্ণ আকাশের ঘন অন্ধকারে চির অবলুপ্ত হইয়া গেল—তাহার পর অবিরল বারিসিঞ্চনে সে কেবল এই পৃথিবীর তৃণশষ্পকে আপনার রক্তাক্ত হৃদয়ের অর্ঘ্য দিয়া সবুজ করিয়া রাখিয়াছে। সেদিন ওই নিষ্ঠুর বধির নারীর অন্তর একবিন্দু সহানুভূতিতে আর্দ্র হইয়া উঠে নাই—

যখন সে আসিয়াছে তাহার অক্ষম দেহের অর্ঘ্য লইয়া, তখন দেবতা বিদায় লইয়াছেন। ছিন্নবৃন্ত ফুলের মত সে রাজপুত্রের রথচক্রে নিষ্পিষ্ট হইয়া গিয়াছে—রাজপুত্র চলিয়াছে উদ্দাম রথে তাহারই যৌবন-কুসুম চয়নে। মানুষের চাহিবার যাহা ছিল তাহা ত সেদিন তাহার সাধ্যাতীত—

বিবাহিত জীবনের মাঝে এমনি রোগশয্যায় শুইয়াই যেন একান্ত একাকী সে বার বার দরজার পানে চাহিয়াছে—প্রতিটি মুহূর্ত্ত ব্যাকুল আগ্রহে কাটিয়াছে কিন্তু গৌরী আসে নাই, অপর্ণাও আসে নাই।

খোকার চারিপাশ শীতল অঞ্চলে ঘিরিয়া যাইয়া তাহারা তাহাকে উন্মুক্ত করিয়া হিমশীতল প্রকৃতির মাঝে ঠেলিয়া দিয়াছে। স্বপ্নের মাঝে তাহাদের পাওয়া যায় নাই—কখনও যাইবে না, অনাকাঙ্ক্ষিত বাস্তবের মাঝে অযাচিত ব্যবহারিক জীবনের সামগ্রীর মত তাহারা যেন একান্তই অবান্তর ও অপ্রাসঙ্গিক।

অন্তর তাহার চলিয়াছিল দূর সুদুর্গম পথে আপনার স্বপ্নের বোঝায় নিপীড়িত ভারবাহী পশুর মত—সমগ্র জীবন নির্ব্বাসিত যক্ষের মত সে কেবল অলকা উজ্জয়িনীর ধূপগন্ধামোদিত কেশস্তবকস্নাত, লোধ্ররেণুপরিপ্লুত মানসী মূর্ত্তির স্বপ্নেই দীর্ঘ বৎসর কাটাইয়া দিয়াছে, কুবেরের অভিশাপ তাহার পুরুষ অন্তরে চিরন্তন হইয়া রহিয়া গিয়াছে। সুদূর শতাব্দীর কুঙ্কুম-পত্রলেখাবৃত বক্ষের নীবিবন্ধ স্বপ্নের মাঝে একটিবারও শিথিল হইয়া তাহাকে আহ্বান করে নাই—কেবলমাত্র বারবার বিদায় ঘোষণা করিয়া তাহাকে শোকার্ত্ত করিয়া তুলিয়াছে। সে নিষ্ঠুরা বধিরা উর্ব্বশী চির অস্তমিত—পরশপাথরহারা ধূলামলিন সন্ন্যাসী পুরাতন দীর্ঘ পথে নিস্ফল অনুসন্ধানে চলিয়াছে মাত্র, আর তাহার অন্তরের দিকবলয় আর্ত্তনাদে বিদীর্ণ করিয়া আজ দিকে দিকে ক্রন্দসী রহিয়া রহিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে। সমস্ত আকাশ ভরিয়া সে কাঁদিয়া উঠিতেছে—মিথ্যা—মিথ্যা স্বপ্ন, নিষ্ফল তাহার জীবন-সাধনা।

যৌবনের স্বপ্ন—জীবনের প্রান্তসীমায় আসিয়া আর একবার প্রতারণা করিয়া গিয়াছে। সারাজীবনের কর্ম্মাবসানে, দীর্ঘ যুদ্ধে বার বার আহত ক্লান্ত সৈনিকের মত শিথিল স্থবির দেহের মাঝে শরবিদ্ধ রক্তাক্ত অন্তর আজ বেদনার্ত্তকণ্ঠে বার বার ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিতেছে—আসিল না, আর আসিবে না। জড় সুপ্ত বধির বাস্তবের দ্বারে অন্তরের শোকার্ত্ত করাঘাত নিষ্ফল—একান্তই নিষ্ফল।

অমলের জ্যোতিহীন নিষ্প্রভ চোখ দুইটি আর একবার জলে ভরিয়া

উঠিল। নন্দিতা কখন যেন আলো লইয়া পাশে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। অমলের আর্দ্র চোখের পানে চাহিয়া কহিল—বেদনা কি খুব বেড়েছে বাবা? কি ক'রবো—

অমল সস্নেহে তাহাকে চেয়ারের হাতলটার উপর বসাইয়া কহিল—না মা, এ বেদনা ত যাবার নয়—

—মালিশটা দিলে ক'মবে, তাই দেব।

—থাক্। সস্নেহে নন্দিতার মাথাটাকে আপনার বুকের মধ্যে আকর্ষণ করিয়া লইয়া অমল রুদ্ধকণ্ঠে কহিল—এ বেদনা দূর করা তোমার মালিশের সাধ্যাতীত মা। যা পাওয়া যায় না তার জন্যে যারা কাঁদে তাদের কান্নার ত শেষ নেই। তুমি কেমন ক'রে তা দেবে—তা আসবে না,·· এ জীবনে আর আস্‌বে না—

অমলের আর্দ্র চোখ দুইটি হইতে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরঝর করিয়া বিধাতার আশীর্ব্বাদের মত নন্দিতার কুঞ্চিত কেশাকুল মাথাটির উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। অমল থামিয়া থামিয়া কহিল—তোমরা সুখী হ'য়ো—খোকা আর তুমি—

নন্দিতা শুনিল, অমলের শুষ্ক বক্ষের মাঝে দীর্ঘদিনের শ্রমক্লান্ত হৃদপিণ্ডটা তখনও চলিতেছে—ধুক্ ধুক্—

সমাপ্ত

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রকাশিত ও শৈলেন প্রেস, ৪, সিমলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।
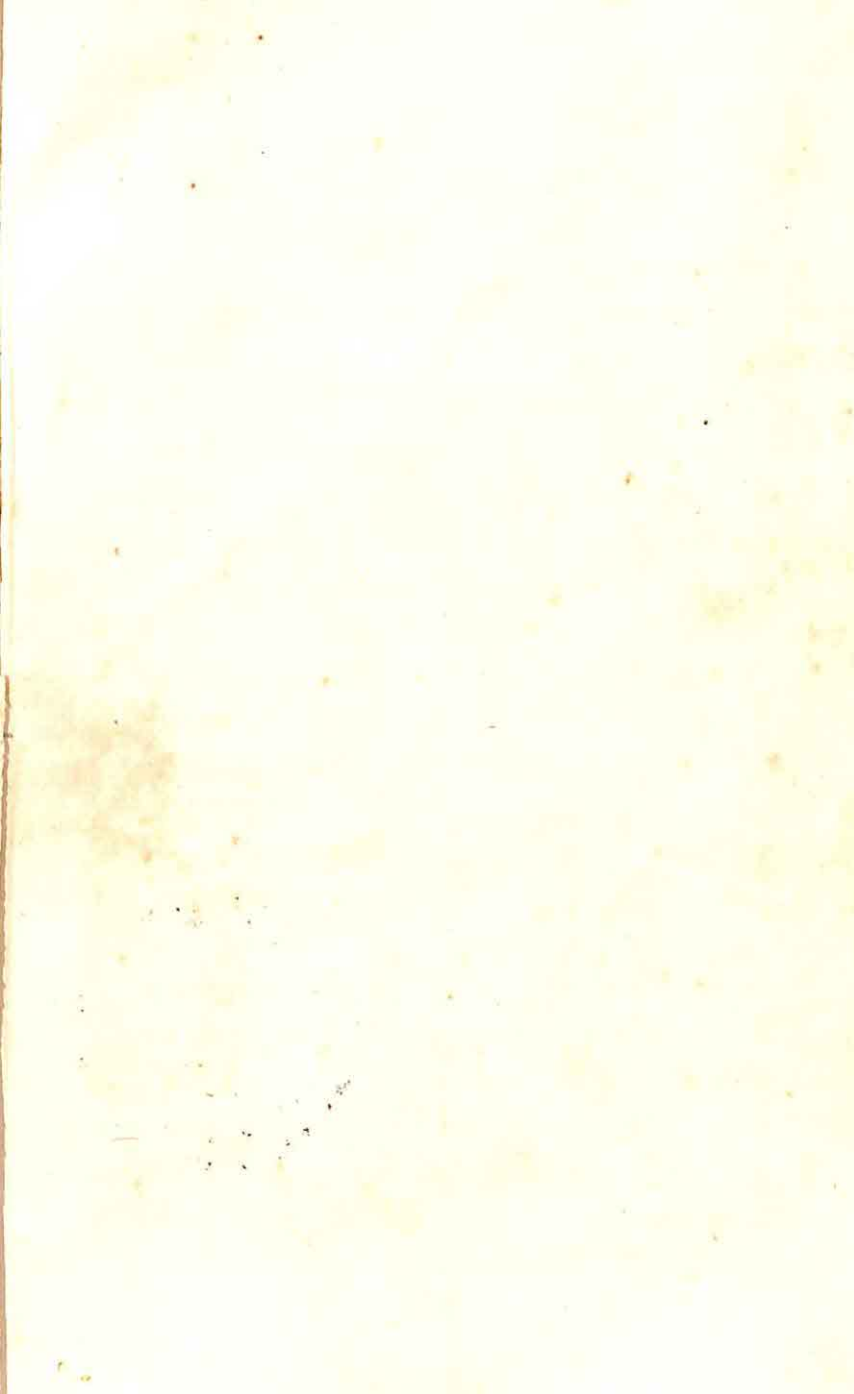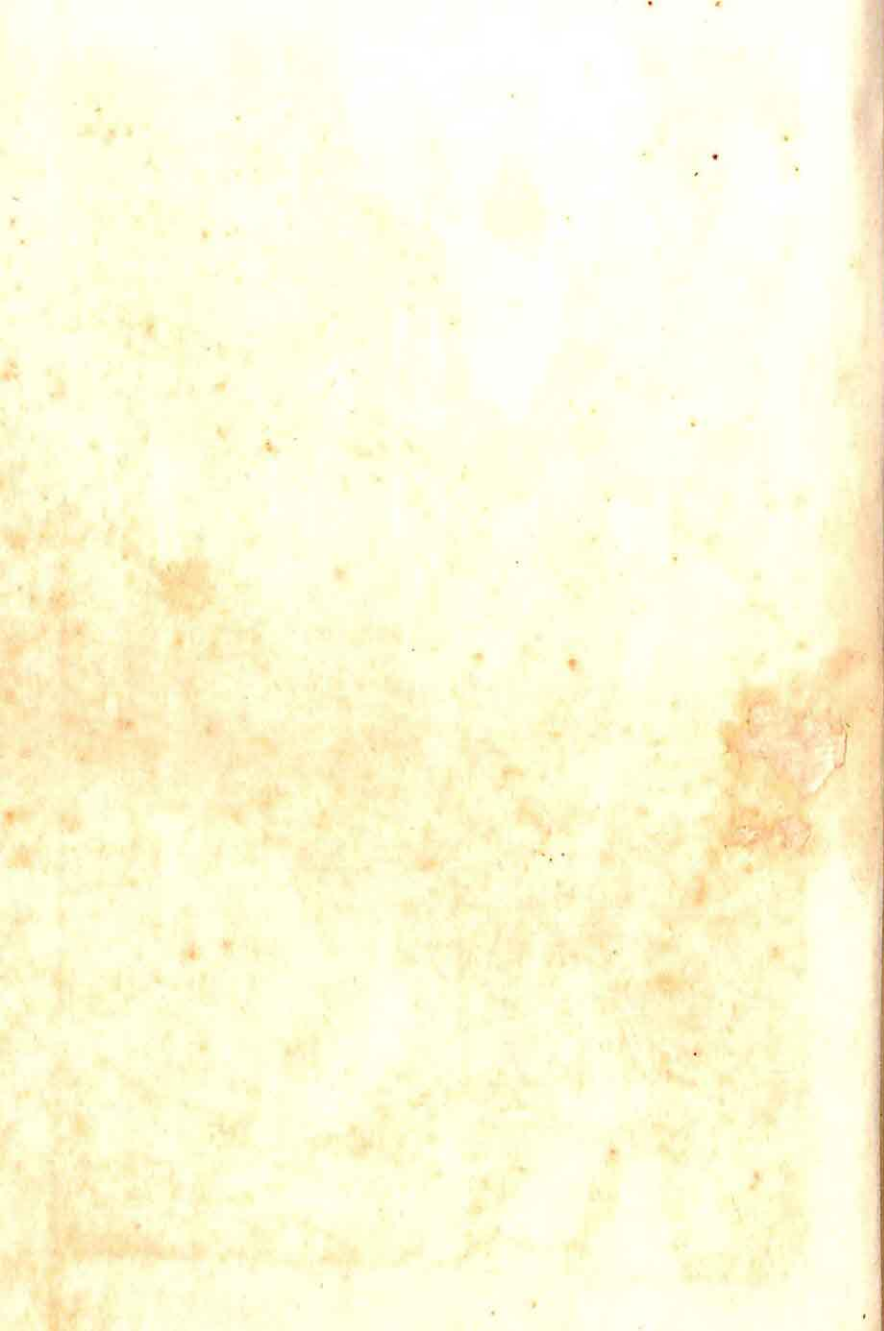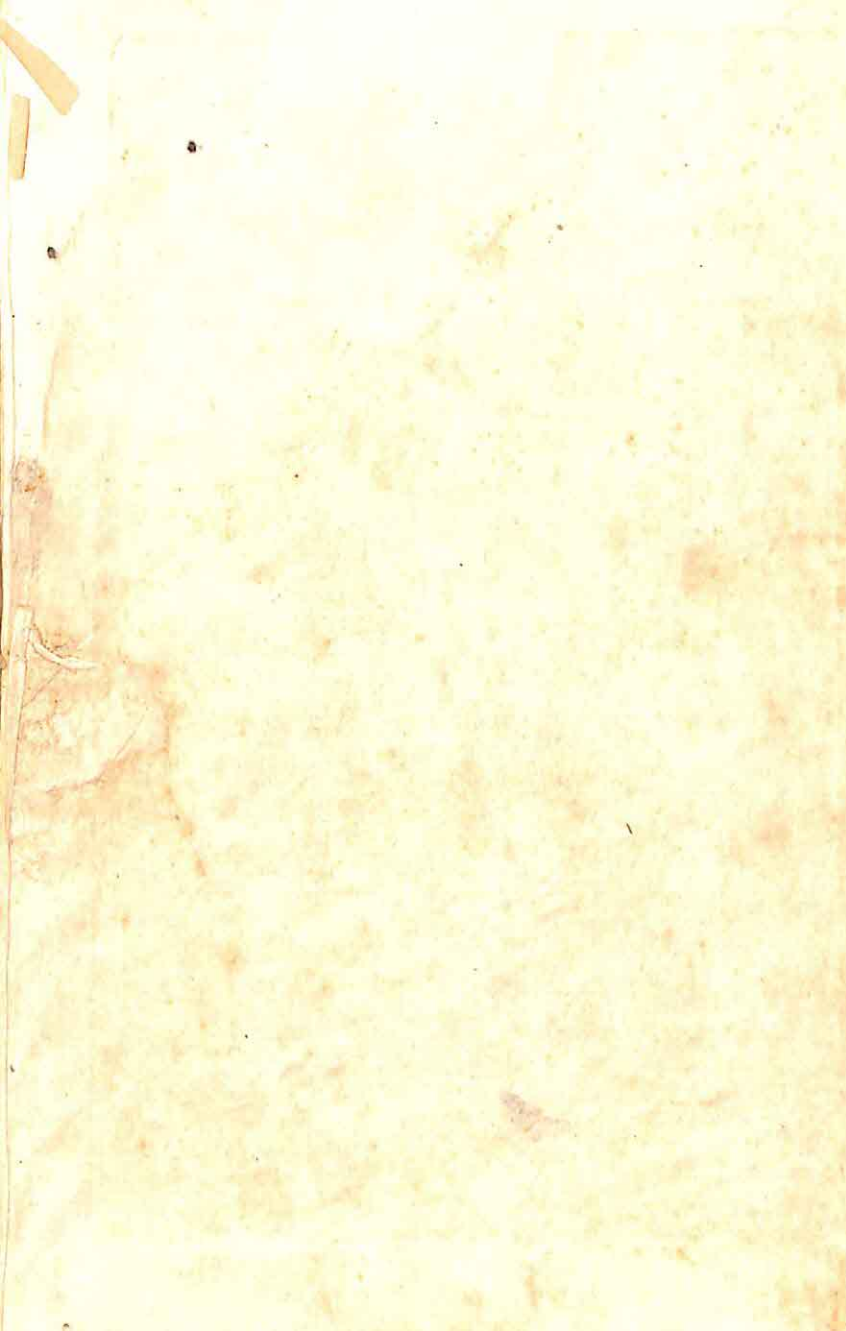
শ্রীপৃথ্বীশচন্দ্র ভট্টাচার্য প্রণীত

—অন্যান্য গ্রন্থ—

শ্রেষ্ঠ গল্প (স্ব-নির্বাচিত)	৪৲
বিবস্ত্র মানব	৪৲
মরা নদী	৩॥০
কারটুন	২৲
পতঙ্গ ১ম ২॥০, ২য়	২॥০
নিরুদ্দেশ	৪৲
পতিতা ধরিত্রী	২॥০

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬